

কবীশ্বরী নক্ষত্রপ্রভা

অভীক মোহন দত্ত



কবীশ্বরী নক্ষত্রপ্রভা

অভীক মোহন দত্ত



অন্তরীপ পাবলিকেশন

সূচিপত্র

কবীশ্বরী

বাইরের দালানে সন্ধি পুজো শেষ করেছেন পুরোহিত। ঘণ্টা-কাঁসরের প্রবল আওয়াজ আপাতত নেই। মেয়েমহল বার-দালান থেকে একটু ভেতরে, উঠোনে লোকসমাগমের মৃদু গুঞ্জন পৌঁছোয় না। কিন্তু বউ-ঝিদের চাপা উত্তেজনা আর বারান্দায় চাকরবাকরদের পায়ের বেসামাল ধুপধাপে বোঝা যায় তামাক আর বরফ দেওয়া শরবত খুব উড়ছে। সে ঘরের মাঝখানে একটা বড়ো কাঠের কেদারায় বসে আছে মাথা নিচু করে। শাড়ির ফাঁক দিয়ে অনাবৃত শ্যামবর্ণ কাঁধে ঝাড়ের আলো পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে। বুক দু'টি ওঠানামা করছে দ্রুত। দু'পাল্লার ভারী কাঠের দরজা দড়াম করে খুলে দৌড়োতে দৌড়োতে ঘরে ঢুকল নিস্তারিণী। চৌকাঠে পা বেধে পড়ছিল প্রায় হুমড়ি খেয়ে— খুব জোর সামলে নিয়েছে। হাঁ-হাঁ করে ওঠার আগেই লাফ মেরে নিস্তারিণী গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল— মুখচোখ উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে প্রায়, "উনি এয়েছেন দিদি। সায়েব আর রাজামশায়ের পাশে বসেছেন যেয়ে।"

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। নিস্তারিণীর উত্তেজনা মুহূর্তে তার মধ্যেও সংক্রামিত, "ঠিক দেখেছিস তুই? সত্যি করে বল, এক্কেবারে সামনে থেকে দেখে এলি?"

নিস্তারিণী হাসছে, "নিস্তারিণী দাসীর চোখ ভুল করে না গো বিন্দুদিদি। তোমায় কি নতুন করে কইবার আছে বলো সে-কথা?"





কথা সত্যি। নিস্তারিণী নাপিতানির চোখ-কান বড়ো সাংঘাতিক। সে-সব এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই কারও। মোকাম কলকাতার বিবিমহলে* কথা চালুই আছে— 'নিস্তারিণীর বস্তা/ কেচ্ছা ভারী সস্তা।'

সে, অর্থাৎ বিন্দুবাসিনী সোজা হয়ে দাঁড়ায় চোখ বুজে। তার শরীরের কাঠামো সবল। উজ্জ্বল শ্যামলবর্ণ মুখশ্রীতে সৌন্দর্যের অভাবটুকু বিধাতা পূরণ করেছেন ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়ে। খুব ফিসফিসিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করে, "আর কত্তামশায়? তিনি আসেননি এখনও?"

পাশে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী এতক্ষণ চুপচাপ সব দেখছিল। এবার খিলখিলিয়ে উঠে গড়িয়েই পড়ল প্রায় হাসির দমকে। কৃশাঙ্গী সৌদামিনীর কথোপকথনের স্বর ভাঙা কাঁসরের শব্দের চেয়ে সামান্যই মিঠে, কিন্তু গানটা সে খারাপ গায় না। বিন্দুবাসিনীর থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে নিধুবাবুর টপ্পার নকল করে গেয়ে উঠল—

"অপার মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব
বিশ্বরূপা বিন্দুবাসিনী
রামারি মোহনরাম, এ কী দ্বিধা বিধি বাম,
প্রেমগতি জানে (প্রেম) পসারিনি।"[১]

পৃথুলা ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণা নিস্তারিণী একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল মুহূর্তের জন্য। টানাপাখার হাওয়া ঘর্মাক্ত মুখ-মাথা ভরে নিতে নিতেই সে দাবড়ে দিল সৌদামিনীকে, "তোর রঙ্গ রাখ দেখি সদু, একেই সব্বার মাথা খারাপ হতেছে আজ। শোভাবাজার রাজবাড়িতে মেয়েছেলে কবি গাইবে পেত্থমবার। বাইরে মেয়েমদ্দ জুটেছে গুড়ভনভনে মাছির মতো। দেউড়ির বাইরে দ্যাখসে, যদ্দুর চোখ যায় তদ্দুর জুড়িগাড়ি। হাবিলদার আর পেয়াদায় থিকথিক করছে রাস্তাখান। নেড়িগান নয় বাবা, কবির লড়াই। রাজামশায় বসে আছেন দরবার আলো করে। তারপর বেন্টিং সায়েব। আমাদের রায়রায়ান রামমোহন কর্তা। তাঁদের সামনে বিন্দুদিদি লড়বে আমাদের কত্তামশায়ের সঙ্গে।"

আরও কত কী বলত নিস্তারিণী আবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে, চট করে তার হাত ধরে ফেলল বিন্দুবাসিনী। চোখেমুখে তার আর্তি, "বল না, উনি এসেছেন?"

তার অবস্থা দেখে নিস্তারিণীর মায়া হল যেন একটু। হেসে সে বললে, "এসেছেন গো এসেছেন। তিনি বার-বাড়িতে জিরোচ্ছেন। তেনার সাঙ্গোপাঙ্গরা উঠোনের

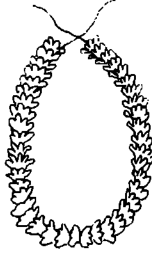
ফরাসের উপর জেঁকে বসেছে। তবে কিনা মান্যগণ্য মানুষ, ধারে-ভারে কত্ত বড়ো, তুমি আসর বন্দনা করে শুরু না করলে তো আর তিনি যেতে পারেননিকো।”

বিন্দুবাসিনীর চোখমুখ প্রথমে সহজ হয়ে এল, তারপর কঠিন। সৌদামিনীর দিকে ফিরে বললে, “সদু, আমায় সাজিয়ে দে। বিন্দুবাসিনী নয়, আজ রাজার যজ্ঞে গান করবে যজ্ঞেশ্বরী। তেমন করে সাজা আমায়।”

কেদারায় বসে চোখ বুজল যজ্ঞেশ্বরী। সৌদামিনীর অভ্যস্ত হাত তার কেশবিন্যাসে ব্যস্ত। রামমোহনকে ‘রামারি’ বলে মশকরা করলেও সৌদামিনীর কথায় কিছু সত্যি আছে। যজ্ঞেশ্বরীর মাথার মধ্যে ভেসে উঠছে তার সমস্ত জীবনটা। মুখুজ্যেদের বিন্দু থেকে কবিয়াল যজ্ঞেশ্বরীর হয়ে ওঠার যাত্রাপথ আজ দ্বিধাবিভক্ত এক বাঁকে এসে পৌঁছেছে। তার একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন রামমোহন রায়, আর অন্যদিকে কবিয়ালচূড়ামণি রাম বসু, বিন্দুবাসিনীর ‘কত্তামশায়’। আজ দুই রামের সামনে যজ্ঞেশ্বরীর অগ্নিপরীক্ষা।

---

১. রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১—১৮৩৯) যিনি সাধারণ্যে নিধুবাবু নামে পরিচিত ছিলেন, বাংলা টপ্পাসংগীতের পথিকৃৎ। বাংলায় টপ্পাগান তাঁর হাত ধরেই প্রথম সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। এখানে সৌদামিনী নিধুবাবুর সুবিখ্যাত ‘অপার মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব/ নিরুপমা ত্রিকালবর্তিনী।/ যক্ষরক্ষ সুরাসুর, গন্ধর্ব নর কিন্নর/ চরাচর সর্ব সচেতনী।’ গানটির নকল করে গাইছে।



এক

অষ্টপুর গাঁয়ে গঙ্গার ঘাট দু'টিই মাত্র। একটি শ্মশান ঘাট, অপরটি গয়নার নৌকোর। গয়নার ঘাটে অবিশ্যি ব্যাপার-সওদার মহাজনি নৌকো এসেও দাঁড়ায় কখনও-সখনও। মোকাম কলকেতায় ব্যাপার নিয়ে যাওয়ার পথে ক্লান্ত হয়ে পড়লে জিরোয় দাঁড়িরা, জলপান খায়। এখন এই গ্রীষ্মের বিকেলে ঘাট থেকে কিছু দূরে একদঙ্গল ছেলে জলে দাপাচ্ছে। ভরা জ্যৈষ্ঠের তাতে নদীর জল বেশ কম। কমেছে দূরপাল্লার নৌকোর আনাগোনাও।

ঘাটের পাশে সুঁড়িপথ দিয়ে আটবছুরে নাতনি উমাশশীর হাত ধরে ত্বরিতপদে হাঁটছিলেন ঘোষালবাড়ির মোক্ষদা। পথের ধারে নদীর পাড় ঘেঁষে একখানি নুয়ে পড়া বট গাছ আজ মান্ধাতার আমল থেকে আছে এই গাঁয়ে। বর্গীরা এককালে অনেক লোক ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল এই বৃদ্ধ বিশাল গাছের ডালে, গাছটার নামই তারপর থেকে হয়ে গেল ফাঁসুড়ে বট। রোদ পড়ে আসলেও চারদিকে ভরা আলো, তবু গাছটার কাছে এলেই কেমন গা ছমছম করে। গাছটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আপনিই মোক্ষদার চোখ বন্ধ হয়ে আসে— অস্ফুটে 'হরেকৃষ্ণ' নাম করতে করতে নাতনির হাতটা আরও শক্ত করে ধরে পা চালান দ্রুততর।

ঠিক এমন সময়েই অলুক্ষুনে গাছটার উপর থেকে খিলখিল করে একটা তীক্ষ্ণ

হাসির আওয়াজ। শিউরে উঠে মোক্ষদা একটা চিৎকারই ছাড়তে যাচ্ছিলেন, হাসির পিছনের গলার আওয়াজটা চেনা মনে হওয়ায় চোখ খুলে তাকালেন গাছের দিকে। গাছের যে বড়ো ডালটা নুয়ে পড়ে প্রায় নদীর জল ছুঁয়েছে, তার উপর থেকে উঁকি মারছে বছর-বারোর একটা দস্যি মুখ আর ফিচেল হাসি। উমাশশীর মুখও তখন হাসিতে ভরে উঠেছে। সইকে চিনতে পেরে সে বললে, "বিনু দিদি, তুমি গা-গাছের উপর কী ক-করো?"

মোক্ষদাবুড়ির নাতিনটি তোতলা। উমাশশীর পিতা রাজবল্লভ ঘোষাল ধনাঢ্য ব্যক্তি। বেশি বয়সের সন্তান ওই উমাশশী। বুকের ধন এই মেয়েটির চিকিৎসায় রাজবল্লভ কোনওই ত্রুটি রাখেননি। আশপাশের দুই জেলা তো বটেই, কাশী থেকে রাজবৈদ্য পর্যন্ত দেখিয়েছেন এনে। লাভ হয়নি বিশেষ। উমাশশীর জিভের আড়ষ্টভাব থেকেই গেছে। রাজবল্লভ একবার প্রস্তাব পেড়েছিলেন, মেয়েটাকে কলকেতা নিয়ে গিয়ে যদি একবার সায়েব ডাক্তার দেখানো যায়— মধুসূদন মিত্রের ছেলে গোরাচাঁদের হাঁপানি সরিয়ে দিয়েছে চৌরঙ্গির হ্যালিডে সায়েব, সেখানেই যদি একবার। এইবার বেঁকে বসলেন মোক্ষদা। ছেলেকে সাফ জানালেন ওসব কেরেস্তানি কাণ্ড মোক্ষদাসুন্দরী বেঁচে থাকতে ঘোষালবাড়িতে হবে না। আর কে না জানে, মধু মিত্তিরের ঠাকুদ্দা শ্যামলাল মিত্তিরকে কলকেতায় নবাবের পেয়াদারা জোর করে গোমাংস খাইয়ে মোছলমান করেছিল কেল্লা দখল করার সময়। মিত্তিররা বামুনদের টাকা খাইয়ে, প্রাচিত্তির করে সে-সব ধামাচাপা দিয়েছে। কিন্তু মেলেচ্ছ ভাব একবার ধরলে কি আর ছাড়ে? ওরা সায়েবের ওষুধ খাবে না তো কে খাবে! মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখে রাজবল্লভ আর রা কাড়েননি।

কলকেতা যেতে না দিলেও, মোক্ষদা নিজের নাতনিটিকে কিছু কম ভালোবাসেন না। উপোস, মানত, দেবতার থানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা রাতভর— সবই করেছেন। কিন্তু ওই আবাগির যে কী পোড়া কপাল, আট বছর বয়েস হল, এখনও কথা বলে আধো-আধো, তোতলাতে তোতলাতে। যুগিপাড়ার বাইরে এক সন্ন্যেসী এসে নাকি আসন করেছে ক'দিন হল। তেলপড়া জলপড়া দিয়ে হারাণ যুগির মায়ের দু'কুড়ি বছরের পুরোনো গেঁটেবাত ভালো করেছে। এমনিতে ছোটোজাতের ধারপাশ মাড়ান না মোক্ষদা। কিন্তু গরজ বড়ো বালাই। তাই যাচ্ছিলেন নাতনিকে নিয়ে, যদি মাদুলি পাওয়া যায় একটা। সেই সময় এই অসৈরন কাণ্ড।

মোক্ষদা চোখ বড়ো বড়ো করে চেয়ে দেখলেন উমাশশীর 'বিনুদিদি' একখানি

সস্তা ডুরে শাড়ি গাছকোমর করে পরে ফাঁসুড়ে বটের ডালে বসে কাঁচা পেয়ারা চিবোচ্ছে। মুখপুড়ি মেয়েটা এই ভরদুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে টো-টো করে ঘুরতে ঘুরতে এসে বসেছিল গাছের উপর চড়ে। মোক্ষদাকে দেখে ফেলেছে চোখ বন্ধ করে ইষ্টনাম করতে। অগ্নিশর্মা হয়ে মোক্ষদা গলা চড়ালেন, "বিন্দু, আবাগির বেটি, তোর কি প্রাণে ভয়-ডর নেই? মর, মর, মরণ হয় না তোর? বাপ-মা খেয়ে গুষ্টিনাশ করে বসে আছ ধিঙ্গি মেয়ে...," কথা শেষ হল না মোক্ষদার, আবার সেই খিলখিল হাসি। "পেট ভরেনি গো গুষ্টি খেয়ে ঠাকমা, তাই পেয়ারা খাচ্ছি," হাসতে হাসতেই বলল বিন্দুবাসিনী।

মোক্ষদা রাগের চোটে কী বলবেন বুঝে পেলেন না। খামোখা নাতনির হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে বললেন, "চল চল, আর দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখতে হবে না।" উমাশশীর ইচ্ছে ছিল সইয়ের সঙ্গে আরও দুটো কথা বলে, কিন্তু পিতামহীকে সে প্রায় যমের মতোই ভয় পায়। গাছের ডালে বিন্দুবাসিনী আর বিন্দুবাসিনীর হাতের আধখাওয়া পেয়ারাটার দিকে তৃষিত নয়নে একবার তাকিয়ে সে পিতামহীকে অনুসরণ করল। বিন্দুর অবশ্য বিশেষ হেলদোল দেখা গেল না। গাছের ডালে ফের আরাম করে বসে পেয়ারায় মনোনিবেশ করাতেই তার সবিশেষ উৎসাহ।

শুধু উগ্রস্বভাবা মোক্ষদা কেন, বামুনপাড়ার বউ-ঝি-রা বিন্দুর কথা উঠলেই তার বাপমায়ের অকাল মৃত্যুর কথাটা পাড়তেও ভোলে না। পরশুদিনও সে জমিদারবাড়ির পিছনের পুকুরঘাটে রায়গিন্নিকে বলতে শুনেছে, "শনি কপালে না হলে কী আর এমন হয় বলো? বাপ গেল ওলাউঠোয়। অমন সোনার বরণ দেহ, বয়স হলে কী হবে, হাত-পায়ের এই গুলি, এই বড়ো মোচ। যেমন শাস্তর-জ্ঞান তেমন লাঠিখেলার ওস্তাদ। একবেলার মধ্যে সব শেষ। বদ্যি এসে বললে, ও আগেই হয়ে গেছে। সতীলক্ষ্মী বউটাও সোয়ামি ছেড়ে থাকতে পারল না। সাতদিন পরেই এই ছুঁড়িকে ফেলে রেখে সগ্গে গেল।"

তরুলতা সদ্য বিয়ে হয়ে এসেছে গ্রামে। সে এত কথা জানত না। শাশুড়ি তাকে একগাদা কাপড় দিয়ে পাঠিয়েছেন ক্ষারকাচা করতে। সে মন দিয়ে সেটাই করছিল। রায়গিন্নির কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, "ওমা, আহা রে, পোড়া কপাল ছুঁড়ির।" এদিক-ওদিক একবার চেয়ে গলা নামিয়ে রায়গিন্নি ফের বলেন, "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, পাপের ঘড়া যখন ভরে। শাস্তরে তো আর এমনি এমনি বলেনি এ কথা। ওই বিন্দুর বাপের ঠাকুদ্দা মস্ত ডাকাত ছিল তো। দিনে পুরুতগিরি করত, রাতে ডাকাতি। কত

লোকের প্রাণ নিয়েছে তার কোনও লেখাজোকা নেই। লাখ টাকা নাকি জমিয়েছিল। পাপের টাকা থাকে না রে বউ, টাকাও গেল, বংশও গেল।” রায়গিন্নির কণ্ঠস্বরে যেন সামান্য খুশির সুর। অবশ্য খুশিটি বিন্দুদের অর্থলোপের নাকি বংশলোপের— সেইটে তরুলতা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

অদূরেই ঝোপের মধ্যে বঁইচি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল বিন্দু। সব কথাই তার কানে গেছে। কিন্তু বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য করেনি। এমন কথা সে অষ্টপুর গাঁয়ে আসা ইস্তক শুনে আসছে। তাই আজ মোক্ষদার কোপবাক্যও তাকে বিশেষ বিচলিত করতে পারেনি। বাপ-মা মারা গেছেন চার বছরই তো হয়েছে, কিন্তু এই চার বছরে বিন্দুর বয়েস বেড়েছে অনেকখানি। দিদির সংসারে সে যে অনাবশ্যক একটা বোঝা— সেটা তাকে নিত্যই মনে করিয়ে দেওয়া হয়।

সংসার তো দিদির ভারী। কুলীনের মেয়ে ক'জন সোয়ামি সংসারের সুখ পায়? ওসব কথার কথা। সত্তর বছর বয়েসে ব্রজমাধব বাঁড়ুজ্যে বিন্দুর দিদি বিল্ববাসিনীকে যখন বিয়ে করে আনেন, বিল্ববাসিনী তখন চোদ্দো। বিন্দু সবে চার বছরের। ব্রজমাধবের প্রথম দুই পক্ষ ততদিনে মাথায় ডগডগে সিঁদুর নিয়ে দেহ রেখেছেন। দুই পক্ষ মিলিয়ে ছয়টি ছেলে, তিনটি মেয়ে। এহেন ভরভরন্ত সংসারে ব্রজমাধব যখন বিল্ববাসিনীকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুললেন, ভারী হুজ্জুত করেছিল সবাই মিলে। ব্রজ বাঁড়ুজ্যের নিজের নাতনিরাই সব নতুন বউয়ের চেয়ে বয়েসে বড়ো। তারা সব একজোট হয়ে নাকি দোর আটকে দাঁড়িয়েছিল। বুড়োর মরণকালে ভীমরতি হয়েছে। চিতায় উঠতে দেরি নেই, হেনকালে ওই কচি মেয়েটাকে বিয়ে করে এনেছে। কী ঘেন্না, কী ঘেন্না!

বড়ো নাতনি শৈলবালার বয়স ত্রিশ পার হয়ে গেলেও সে এখনও অনূঢ়া, ফলে তার মেজাজটিও কিছু তিরিক্ষি। সে হাতে একখানি শলার ঝাঁটা নিয়ে তড়পাচ্ছিল, “বুড়োর রস আমি ঝাড়ব আজ। আর ওই আবাগির বেটিরও আজ রক্ষে নেই। ভিখিরির জাত সব, টাকার গন্ধে গন্ধে চলে এসেছে। নিলাজ বেহায়া মেয়েছেলে।” প্রচণ্ড ক্রোধে ঝাঁটা মাটিতে আছড়াচ্ছে শৈলবালা, বাগে পেলে নববধূকে ঝেঁটিয়েই তাড়াবে বুঝি!

যেমন হয়, মজা দেখতে পাড়া-প্রতিবেশীও জুটে গিয়েছিল বেশ কয়েকজন। তাদের দু'-একজনের মনে প্রশ্নও জেগেছিল, শৈলবালার রাগের পিছনের মূল ইন্ধনটি প্রকৃতার্থে কী? বুড়ো ঠাকুরদার সম্ভাব্য ভীমরতি, নাকি সম্পত্তির ভাগীদার বৃদ্ধি! তবে সে-সব বেয়াক্কেলে প্রশ্ন তুলে এমন সরেস হাঙ্গামাটি নষ্ট করার মতো বোকা

প্রতিবেশীরা নয়। মুখে কুলুপ এঁটেই মজা দেখছিল সকলে। শৈলবালার বদমেজাজ গ্রামে প্রসিদ্ধ। সকলের আশা ছিল এইবার একটা বেশ চুলোচুলি হবে। ব্রজমাধব বিমূঢ়। পিছনে লাল চেলির জোড়ে নববধূটি কাঁপছে থরথর করে।

কিন্তু উৎসুক প্রতিবেশীদের হতাশ করে শৈলবালার তড়পানি থেমেছিল অবিলম্বেই। মেজোবউ, অর্থাৎ ব্রজমাধবের বড়ো পক্ষের মেজোছেলে নীলমাধবের স্ত্রী যোগমায়া এসে থামিয়েছিল শৈলবালাকে। বিল্ববাসিনী দীর্ঘ অবগুণ্ঠন সামান্য সরিয়ে কৃতজ্ঞচোখে দেখেছে, যোগমায়া কানে কানে কী যেন বলেছে শৈলবালার। তারপর ভাশুরঝির হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়েছে তাকে। বধূবরণের পরবর্তী সময়টায় আর দেখা যায়নি শৈলবালাকে। বরণের উয্যুগ-আয়োজন সব যোগমায়াই করেছে এক হাতে।

পড়শিরা মুখ টিপে হেসেছে। বরণ না করে উপায়-ই বা কী? জমিজমা সব ব্রহ্মোত্তর। বর্ধমান রাজবাড়ির গুরুবংশের সঙ্গে লতায়পাতায় কী একটা যোগ আছে বাঁড়ুজ্যেদের। ফলে রাজগদি থেকে ব্রজমাধব মাসোহারা পেয়ে থাকেন মোটা। এছাড়াও মাসকাবারি মোটা সিধে আসে। রাজবাড়ি তো বটেই, আরও ধনী শিষ্যের অভাব নেই ন্যায়শিরোমণি ব্রজমাধবের। পুরো পরিবারটাই বলতে গেলে ব্রজমাধবের উপর নির্ভর। ছেলেরা তো টোলের দিকও মাড়ায়নি কেউ। বাপের পয়সায় খায় আর জমিজমা তদারক করে। ব্রজকর্তা তাড়িয়ে দিলে গোটা পরিবার পথে বসে যাবে।

এসব কথা বিলুদিদি অর্থাৎ বিল্ববাসিনীই বলেছে বিন্দুকে। রাতের বেলা সবার খাওয়াদাওয়া হলে পরে দুই বোন হেঁশেলের এককোণে খেতে বসে। সানকিতে ঠান্ডা ভাত আর শুকনো কড়কড়ে তরকারি বেড়ে খায় দুই বোনে। খায় আর হেসে হেসে গল্প করে। বিন্দু জানে মুখভরা হাসি থাকলেও বিলুদিদির প্রাণে সুখ নেই। আট বছরে ব্রজমোহনের শরীর পড়ে গেছে। কোণের দিকের একটা ঘরে পড়ে থাকেন আর হাঁপ টানেন। সংসারের কত্তা হয়ে বসেছে নীলমাধব। আর সংসারের কর্ত্রী অবিসংবাদীভাবেই এখন যোগমায়া। যোগমায়ার দাপট কী এখন! ধুরন্ধর যোগমায়া যেন অপেক্ষাই করছিল ব্রজমাধবের অশক্ত হয়ে পড়ার জন্য। বিলু খানিক তেতো হাসি হেসে বলে, "মেজোগিন্নির বুদ্ধি আছে বটে! আমি অত বুঝিনি পেরথম পেরথম।" বিলু তো দূরস্থান, পাড়া-পড়শি, গ্রামের লোকই কি বুঝেছিল নাকি ছাই!

শৈলবালার তর্জনগর্জনের আড়ালে যোগমায়া নিজের দখল শক্ত করেছে বাঁড়ুজ্যেবাড়িতে ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে। শৈলবালার বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিল

বাড়ির সবাই, সে নিজেও সে-স্বপ্ন যে আর দেখত— তা নয়। বাপের বাড়িতে রাবেদাবে মন্দ কাটছিল না তার। এদিক-ওদিক যেমন শোনা যায় কুলীনের ঘরের মেয়েদের দুর্দশার কথা বাপের ঘরে— তেমনটি নয় মোটেও। কিন্তু যোগমায়া ধুরন্ধর বটে। একদিকে বাড়ির অন্দরমহলের সবটুকু নিজের মুঠোয় নিয়েছে, অন্যদিকে নিজের কোন এক তেজবরে পিসেমশায়ের সঙ্গে শৈলবালার সম্বন্ধও ঠিক করে ফেলেছে কোন ফাঁকে! শৈলবালার বিয়ে হয়ে গেল যোগমায়ার উয্যুগ-তদবিরেই। আর এ দিকে মেজকর্তা আর গিন্নি দু'জনে রাজরানি হয়ে বসেছে বাঁড়ুজ্যেবাড়িতে।

বিলুর প্রতিও যোগমায়ার সে-সহানুভূতিটুকু যে নিতান্তই একটা খোলস সেইটে বিলু এখন পদে পদে বোঝে। বাঁড়ুজ্যে-বুড়োর সেবাযত্নের দায়িত্ব তার ঘাড়েই এখন। তবে তাতে ঘরের কাজে ঢিলে দেওয়ার জো নেই। কাজে ফাঁকি পড়লে যোগমায়া তাকে আঁশবটিতে ফেলে কুটবে— বিলু ভালোই জানে। অগত্যা সকালে উঠে গোবর নিকোনো, ঢেঁকির পাড় দেওয়া, রান্নাবান্না, গোয়াল দেখা-র মাঝে বিলুকে এক কান খাড়া করে রাখতে হয় সমস্তদিন। ব্রজমোহন শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে আঁ-আঁ করে একটা জান্তব চিৎকার ছাড়েন। বিলু গিয়ে দেখতে পায় বুড়ো কাপড়চোপড় নোংরা করে ফেলেছে।

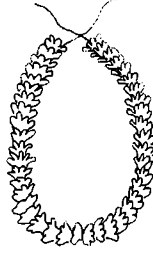
যোগমায়া দাওয়ায় বসে মুখে দোক্তা ঠুসে বলেন, "বুড়ো করে ফেলেছে নাকি? পাছপুকুরে সব ধুয়ে, ভালো করে নেয়ে ফিরবে। গোবরছড়া, গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে তবে উঠবে দাওয়ায়। যমের অরুচি সব।" শেষ কথাটা অবশ্য কাকে উদ্দেশ্য করে বলা— বোঝা যায় না। বিলু নিঃশব্দে কাজ করে। সম্পর্কে সে যোগমায়ার সৎ শাশুড়ি হলেও যোগমায়ার বয়েস তার দুনো। বুড়োকত্তা শয্যা নেওয়ার পর থেকে এমন কথাবার্তায় সে অভ্যস্ত। যোগমায়া অবশ্য নিয়মিতই তাকে মনে করিয়ে দেন যোগমায়া দাসীর মনটা কত বড়ো। "পায়ে এসে পড়েছিলে কেঁদে কেঁদে। বাপ-মা খেয়েছে একরত্তি বয়েসে, ওই অলক্ষ্মীকে কে রাখত বাড়িতে? অকেতজ্ঞ না হলে মনে রাখবা।" উত্তেজিত হলে বাপের বাড়ির যশুরে টান বেরিয়ে পড়ে যোগমায়ার কথায়।

তা ওরা দুই বোনই মনে রেখেছে। বিলু তো কচি বয়েস থেকেই ভারী শান্ত। বিন্দু বরং জংলি ধাতের। সারাটা দিন ছাড়া গরুর মতো টো-টো করে বেড়ানোটাই তার একমাত্র কাজের কাজ। বাইরে এসব 'ধিঙ্গিপনা' করে বেড়ালেও যোগমায়ার সামনে সে চুপচাপই থাকে। যোগমায়ার ঠেস দিয়ে বলা কথাবার্তার উত্তর যে বিন্দুর

দু'-একবার দিতে ইচ্ছে করেনি, তা নয়। তবে দিদির কথা মনে হতেই সে শান্ত হয়ে গেছে। বিলু ছোটো বোনটিকে ভালোই চেনে। তাই আগে থেকেই সাবধান করে রেখেছে বিন্দুকে, "তোকে মায়ের দিব্যি দিলাম বিন্দু, ঝগড়া করিসনে মেজোবউয়ের সঙ্গে।" দুঃখী দিদিটার কথা ফেলতে পারেনি বিন্দু।

মুখ থেকে পেয়ারার ছিবড়ে ফেলে দেয় বিন্দু। মায়ের কথা তার মনে পড়ে না তত। কিন্তু বাবাকে মনে পড়ে খুব। দীর্ঘদেহী পেশল শরীরের রঘুনাথ মুখুজ্যে সন্ধ্যাহ্নিকের পর প্রিয়নাথ চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপে গীতাপাঠ করতেন রোজ। যেমন গম্ভীর স্বর, তেমন সুর পাঠে। ভিড় উপচে পড়ত সেই পাঠ শুনতে। ভাগবত, পুরাণকথা, কাশীরামের মহাভারত— যা-ই পড়তেন রঘুনাথ, হাঁ করে শুনতে হত। বিন্দু ছিল বাবার সেথো। বাবার আহ্নিক শেষ হওয়ার আগেই পুঁথি রাখার কাঠের পাটা বগলে সে তৈরি। মা অন্নপূর্ণা মাঝেমধ্যে অনুযোগ করতেন, "কী রোজ ওই বুড়ো-হাবড়াদের মধ্যে নিয়ে যান বিন্দুকে। মেয়েটা বড়ো হচ্ছে, দিদির সঙ্গে ঘরসংসারের কাজ শিখলেও তো হয়। আজ বাদে কাল শ্বশুরঘর যেতে হবে, অথইজলে পড়বে যে মেয়েটা।"

সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি হাসতেন রঘুনাথ, "আহা যাক, ছেলেমানুষ। তা ছাড়া ধর্মকথা শুনলে পুণ্য হবে কত। শ্বশুরঘরের দেরি আছে। আমি বেঁচে থাকতে ওর কোনও চিন্তা নেই।" বাপের অভয় পেয়ে বাপসোহাগি মেয়ে ততক্ষণে লম্বা লাফে বাড়ির বাইরে। পুরোনো কথা মনে পড়ে বিন্দুর। পেয়ারাটা বড্ড কষা। গাঙের বুকে আধখাওয়া পেয়ারাটা ছুড়ে ফেলতে গিয়ে খেয়াল করল কখন যেন বিকেলের আলো মরে এসেছে। যে ছোঁড়াগুলো জলে দাপাচ্ছিল, তারা উঠে আসছে এক এক করে। ইস, কত দেরি হয়ে গেছে, বিশালাক্ষীর মন্দিরে সন্ধেপুজোর সময় হয়ে এল, তার পরেই শুরু হবে কথকতা। বিন্দু হাঁচোড়পাঁচোড় করে নেমে এল গাছ থেকে।



দুই

গ্রামের মধ্যিখানে জমিদারবাড়ি। তার দক্ষিণে তালড্যাংরার মাঠ পেরিয়ে আমবাগান। আমবাগানের পরে শ্মশানঘাটের দিকে আরও বেশ কিছুটা গেলে বিশালাক্ষীর মন্দির। ভারী জাগ্রত। লোকে বলে মানসিং নাকি বাংলায় এসে দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য গল্পও আছে অবিশ্যি মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে। রূপ-সনাতনের সনাতন গোঁসাই নাকি বোষ্টম হওয়ার আগে নবাবের কাজে একবার ত্রিবেণী এসেছিলেন। তখন এই মন্দির তিনিই বসান— এমনটাও বলে অনেকে। সে যিনিই প্রতিষ্ঠা করে থাকুন, দেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে আশপাশের আট-দশখানা গাঁয়ের লোকের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

শনি-মঙ্গলবার পুজোটা একটু ঘটা করেই হয়ে থাকে মন্দিরে। আজ হল গে মঙ্গলবার। বিন্দুর খেয়াল ছিল না একেবারেই। তাড়াহুড়ো করে সে ছুটতে থাকে। বাঁড়ুজ্যেবাড়ির পিছনের ধানের মরাই আর গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে একটা ভিতরের রাস্তা আছে আমবাগানের। জঙ্গুলে রাস্তা বলে লোকজন বিশেষ যায় না সে-দিকে। তা হোক, সময় কম লাগে। পুজো নিয়ে বিন্দুর মাথাব্যথা নেই তত, সে ওই কথকতাটুকু শুনতে চায়। বিশালাক্ষীর পুরোহিত রামজয় চাটুজ্যে শনি-মঙ্গলে মায়ের পুজোর পর কখনও হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার গল্প সুরে সুরে গেয়ে শোনান, কখনও উর্বশী পুরূরবার

কাহিনি। রঘুনাথের ওজস্বী গাম্ভীর্যটুকু না থাকলেও ক্ষীণকায় রামজয়ের পাঠে কথকতার সুরটি ভারী ঘরোয়া, আপনকার।

এ গাঁয়ে আসার পর থেকেই বিন্দু পুরুতমশায়ের ভীষণ ন্যাওটা। অকৃতদার রামজয়ও এই 'ধিঙ্গি', 'বুনো' মেয়েটিকে অকৃপণ স্নেহ করেন। পুজো শেষ হতে হতে সাধারণত সন্ধে কিছুটা গাঢ় হয়। ঠাকুরমশাই গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে আসার আগেই বিন্দু গিয়ে মন্দিরের চাতাল পরিষ্কার করে ঝাড়ুন দিয়ে। চাতালের মাঝে আসন পেতে দেয়, মাটির পিদিমে ঢালে রেড়ির তেল। চকমকি ঠুকে শোলা জ্বালায়, তারপর গন্ধক-দেশলাইতে সেই আগুন নিয়ে পিদিমে দেয়। ততক্ষণে মন্দিরের পিছনের জারুলগাছটায় পাখিদের জটলা থেমে গেছে, নদীর দিক থেকে ভিজে জোলো হাওয়া ভেসে আসছে, মেয়েরা এসে বসেছে চাতালে সব, পুরুতমশাই সুললিত স্বরে গাইছেন—

'ঋষিপদে হরিশ্চন্দ্র করিয়ে নমন
করজোড়ে কহে, মুনি শুনো হে বচন।
আর কিছু নাহি মোর, সবি গেছে দানে,
সত্য বচন এবে, অন্তর্যামী জানে।'

বিন্দু পাশ থেকে দোহার সেজে ধরতাই দেয়—

'কী সর্বনাশ বটে, দক্ষিণা পাবে
তবে পুরা হবে দান, তবে মুনি নেবে।
রাজপাট সব গেল, গেল রাজপুর
তারপর কী হৈল বলো গো ঠাকুর।'

বয়স্কা মহিলারা উৎকর্ণ হয়ে শোনেন তারপর কী হল, চণ্ডালের ঘরে রাজা কেমন করে গেলেন। দু'-একজন প্রবীণা অবশ্য বিন্দুর এই ধরতাই দেওয়াকে বাড়াবাড়ি বলেই মানেন। "মেয়েটাকে লাই দিয়োনি এত বাবাঠাকুর, মেয়েমানুষের এত বাড় কি ভালো?" কখনও পুজো দিতে এসে কোনও ভক্তিমতী বলেছেন রামজয়কে— রামজয় হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। বিন্দু কি আর আর দশটা মেয়েমানুষের মতো? বিন্দুর পিতা পণ্ডিত রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণশক্তি আর বাগ্মীতা বিখ্যাত ছিল জেলায়।

তার কন্যা তার থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে সে-সব। বিশেষত স্মরণশক্তি। জেলার প্রাচীনদের এখনও মনে আছে পান্তা-সায়েবের সামনে কিশোর রঘুনাথ স্মৃতি থেকে কালিদাসের 'রঘুবংশ' সম্পূর্ণ বলে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

সে আজ অনেক কালের কথা। ওয়ারেন হেস্টিংস সিরাজের পেয়াদাদের ভয়ে পালাতে পালাতে কান্ত মুদির ঘরে পান্তা খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন কোনওমতে। গোটা বাংলায় সায়েবের নাম হয়ে গিয়েছিল পান্তা-সায়েব। ভাগ্যের ফের এমন, সেই পান্তা-সায়েবই পরে হয়ে গেলেন বড়োলাট। সায়েবের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, চট করে বুঝে নিলেন সমাজপতিদের হাতে রাখা দরকার। সমাজের মাথাদের আর হিন্দু জমিদারদের চটিয়ে সিরাজ ভুল করেছিলেন, সেটা সায়েব নিজের চোখে দেখেছেন তো। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে একযোগে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এক সভা আহ্বান করলেন। ম্লেচ্ছ সায়েবের আমন্ত্রণ গ্রহণে জাত যায় কি না এ নিয়ে সে-সময় ভারী গোল হয়েছিল। শেষে ঠিক হল সম্পূর্ণ তর্ক-বিচার-কাব্যালোচনা গঙ্গাবক্ষেই হবে। "কলিযুগে গঙ্গাই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, তাঁর স্রোতে সব দোষ ধুয়ে যায়। সর্ব্বং কৃতযুগে পুণ্যং, ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম। দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্র্যং, গঙ্গা কলিযুগে স্মৃতা।"[২]— বলেছিলেন মহামহোপাধ্যায় কনকেশ্বর আচার্য। রঘুনাথ তাঁরই চতুষ্পাঠীর উচ্চশ্রেণির ছাত্র। রামজয়ও সেই চতুষ্পাঠীতেই তখন এসেছেন সবে সবে নবীন ছাত্র হয়ে। তাঁদের মতো ছোকরাদের কাছে আচার্যের শ্রেষ্ঠ ছাত্র রঘুনাথ শুধুই অগ্রজতুল্য না, আদর্শও বটে।

তখন শরৎকাল। সাত দিন ধরে চলছে এই মহোৎসব। উজ্জ্বল আকাশে ভাসছে সাদা মেঘের দল। তারই ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ছে নবদ্বীপের গঙ্গার বুকে। তার ঝিলিমিলিতে সোনার রং ধরেছে জলে। ঘাট থেকে পরপর সাজিয়ে রাখা ডিঙি নৌকোর উপর পাটাতন পেতে পেতে বিশাল করে জায়গা তৈরি হয়েছে। একদিকে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিরাট রুপোলি-লাল বজরা। তার ছাদে পাশাপাশি দু'টি কেদারায় রায়রায়ান ও বড়োলাট। মৃদু হাওয়ায় উড়ছে নদিয়ারাজের সিংহলাঞ্ছন। রামজয়ের আজও মনে আছে, ঘাটে অসংখ্য লোকের ভিড়। সবাই রাজার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, দু'-একজন বড়োলাটের নামেও। ভিড়ের এক কোণে দাঁড়িয়ে রামজয় দেখছিলেন রঘুনাথকে।

রঘুনাথের পরণে সাধারণ ধুতি। নগ্ন পদ। ঊর্ধ্বাঙ্গে সাদা চাদর। কপালে গঙ্গামাটির তিলক, বাবরি ঢেউখেলানো চুল। দু'হাত আকাশের দিকে তুলে চোখ বন্ধ করে কিশোর আবৃত্তি করছে 'রঘুবংশ'। দশরথের শব্দসন্ধানী বাণে পিতৃমাতৃভক্ত শ্রবণকুমার নিহত।

অযোধ্যানরেশ মৃত তরুণের শরীর এনে নামিয়ে রেখেছেন অন্ধ পিতামাতার পায়ের কাছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বুকফাটা হাহাকার করে শাপ দিচ্ছেন রাজাকে— সন্তানবিচ্ছেদের জ্বালা তুমিও বুঝবে রাজা, আমাদের মতো কাঁদতে কাঁদতেই মরতে হবে তোমায়। ভিড় পাথর হয়ে শুনছে, রঘুনাথ উদাত্ত স্বরে বলে চলেছেন। রঘুনাথের আবৃত্তি শেষ হলে রামজয় দেখলেন পারাপারের ঘাটের পাশে যে চাঁপাগাছটি ছিল, সেটি সামান্য দুলে উঠে নদীর জলে একটি ফুল ফেলে দিল যেন। রামজয় শিউরে উঠলেন। কনকেশ্বরের চোখে জল। সায়েব উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছেন। কৃষ্ণচন্দ্র উৎসাহের চোটে নেমে এলেন বজরার ছাদ থেকে, ত্বরিত পদে রঘুনাথের সামনে এসে তার গলায় পরিয়ে দিলেন নিজের মুক্তোর মালা।

সেই রঘুনাথ। তাঁরই মেয়ে বিন্দুবাসিনী। রামজয় নিশ্চিত জানেন ও মেয়ের মধ্যে দৈবী অংশ আছে।

কিন্তু সে-সব পুরোনো কথা। এখন তো বিন্দু জঙ্গল মাড়িয়ে ছুটে চলেছে মন্দিরের দিকে। দেরি হয়ে গেল আজ। আজকাল ঠাকুরমশায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বুড়ো মানুষ। একবেলা স্বপাক খান কি খান না ঠিক থাকে না। ঘুসঘুসে কাশি হয়েছে ক'দিন, রাতে জ্বর আসে, বিন্দু জানে। বিলুদিদি ছাড়া বিন্দুকে যদি কেউ ভালোবাসে, তা ওই ঠাকুরমশায় আর উমাশশী। বিন্দুর বড়ো চিন্তা হয় ঠাকুরমশায়ের জন্য। ঠাকুরমশায় বিন্দুকে বোঝেন, অনেকটা বাবার মতোই। অবরে-সবরে খোঁজখবর নেন দুই বোনের। বিন্দুকে কত পুরাণের গল্প বলেন, কৃত্তিবাসি রামায়ণ শোনাতে শোনাতে পড়ার সুরটা ধরিয়ে দেন, শ্রীশ্রী চণ্ডী থেকে দেবীমাহাত্ম্য পড়েন বিন্দুকে শুনিয়ে। "হেই গো ঠাকুর, হেই মা বিশালাক্ষী, ঠাকুরমশায়কে ভালো করে দাও," ছুটতে ছুটতেই দুই হাত জড়ো করে মাথায় ঠেকায় বিন্দু।

আজ বড্ডই দেরি হয়ে গেছে। রামজয়ের পুজো অনেকটাই সারা। অঙ্গ ও করন্যাস শেষ করে তিনি এখন দেবীর ধ্যানমন্ত্রে। চাতালের পাশ দিয়ে ধুপধাপ করে ঘাস মাড়িয়ে এসে মন্দিরের দরজার পাশেই বসে পড়ল বিন্দু। মেয়েদের সারির মাঝখান থেকে আধাঘোমটার তলা থেকে চোখপাকিয়ে তাকে শাসাচ্ছে বিলুদিদি। ভরসন্ধেতে এলোচুলে সকালের কাপড়ে এসে বসেছে মায়ের মন্দিরে, তাও আবার পুজোর সময়— বিন্দু বুঝল দিদি রেগে কাঁই। এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে চোখে পড়ল হরিমাধবের পাকমারা চেহারা। ব্রজমাধবের এই বড়ো ছেলেটি একেবারেই অপদার্থ। শাস্ত্রপাঠ দূরে থাক, জমিজমার তদারকিটুকুও পারে না। এ দিকে বয়েস তিনকুড়ি

পুরতে বিশেষ বাকি নেই।

কিছুদিন আগে, ব্রজমাধব— তখনও পড়ে যাননি তিনি, রামজয়কে সরিয়ে বড়ো ছেলেটিকে মায়ের পূজারির কাজে বহাল করার জন্য বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করেছিলেন। হাজার হোক বামুনের ছেলে, পুজোর মন্ত্রটন্ত্র শিখে নিয়ে পুরুতের কাজটায় লেগে গেলে একটা হিল্লে হয় খ্যাপাটে ছেলেটার। তবে কাজটা পায়নি হরিমাধব। জমিদার শিবগতি চৌধুরির অবিশ্যি ইচ্ছে ছিল ব্রজমাধবের ছেলেকে কাজটা দেওয়ার। পাশের তালুক কুলতলির জমিদারদের খাজনা লুট হয়েছে কালেক্টরি যাওয়ার পথে, সূর্যাস্ত আইনের ফেরে কুলতলি হাতছাড়া দুশো বছরের জমিদার বসু পরিবারের। অপমানে লজ্জায় শয্যা নিয়েছেন পদ্মলোচন বসু, নিলেম হবে কুলতলির তালুক। শিবগতির বাসনা নিলেম হওয়ার আগেই এদিক-সেদিক করে তালুকটা বন্দোবস্ত করার। ব্রজমাধবের ছেলেটাকে পুরুত করে দিলে ব্রজ বাঁড়ুজ্যে খুশি, চাই কী কথাটা বর্ধমানের মহারাজ বাহাদুর তেজচন্দ্রের কানেও তুলতে পারেন শিবগতির হয়ে। বুড়োকে রাজামশায় নাকি বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করে থাকেন। দুর্জনে বলে পাকুড়দহের জঙ্গলে যারা কুলতলির খাজনা লুট করেছিল, তাদের মধ্যে নাকি শিবগতির বরকন্দাজ ভোলা বাউড়ি আর সোনা বাউড়িও ছিল। তা দুর্জনের কথায় অত কান দেন না শিবগতি। কালেক্টর-সায়েবের সঙ্গে অবিশ্যি সাঁট হয়েই আছে একরকম। তবু অধিকন্তু ন দোষায়— ব্রজমাধবকে হাতে রাখলে লাভ বই ক্ষতি নেই।

তবু কাজটা পেল না হরিমাধব। রামজয় নরমসরম গোছের লোক। সর্বদাই যেন বিনীত কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। চরিত্রের স্বাভাবিক এই নম্রতার জন্য সকলের প্রিয়ও বটে। গাঁয়ের মাথারা তাঁকে সরিয়ে গেঁজেল হরিমাধবকে পুরুত করতে নারাজই ছিলেন। তবে এসবের ওষুধ শিবগতির ভালোই জানা— কাউকে দু'বিঘে জমি, কাউকে কিছু গোধন ধরিয়ে কাজের কাজটা করার তালেও ছিলেন তিনি। কাঁটা হয়ে বসলেন জমিদারের মা ভবতারিণী। এ দিগরে যাঁকে সকলে বড়োমা বলেই জানে।

প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী বড়োমা ছেলেকে ডেকে শুধিয়েছিলেন, "হ্যাঁরে শিব, এ কী শুনছি? ঠাকুরমশায়কে সরিয়ে ওই নেশাড়ু হরি বাঁড়ুজ্যেকে নাকি মায়ের মন্দিরে পুরুত করার কথা হচ্ছে?" শিবগতি দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভূস্বামী হলেও মায়ের সামনে তাঁর বিশেষ জোর চলে না। তিনি ইতস্তত করে বললেন, "হ্যাঁ, মানে ওই, মানে ঠাকুরমশায়ের তো বয়েস হল। আর ব্রজঠাকুরও অনেক করে বলছিলেন…," ছেলের কথা শেষ হওয়ার আগেই গম্ভীরভাবে বড়োমা বললেন, "ওসব বুদ্ধি রাখো শিব।"

ভবতারিণী রেগেছেন, "ঠাকুরমশায়ের জায়গায় ওই গেঁজেল হরি? তোমার দেখছি বুদ্ধিনাশ হয়েছে। আর তা ছাড়া ঠাকুরমশায়ের মতো কথকতা, অমন মন্তরপাঠ, হরি সাতজন্ম নিলেও করতে পারবে না। ঠাকুরমশায় যদ্দিন জীবিত আছেন, অষ্টপুরের বিশালাক্ষী মন্দিরের উনিই পূজারি।" শিবগতি আর কথা বাড়াননি। রামজয়ও তাই থেকে গেলেন বিশালাক্ষীর পূজারি হয়ে।

হরিমাধবের খ্যাপামি এর মধ্যে আরও বেড়েছে। বউটা তার মরে বেঁচেছে অনেকদিন আগেই। ছিল মেয়েটা— শৈলবালা, বাপকে কড়া শাসনে রাখত। এখন তো সে-ও শ্বশুরবাড়িতে। খ্যাপা হরিমাধব তাই ছাড়া গরু হয়ে সমস্তদিন এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়, মাঝেমধ্যে মন্দিরে এসে বসে আর আকাশ ফাটিয়ে 'মা, মা' চিৎকার করে। সেই পাগলা আজও এসে বসে আছে মেয়েদের থেকে একটু দূরত্ব রেখে এককোণে। দিদির দিকে ফের চোখ যেতে বিন্দু দেখে দিদি ফিসফিস করে কথা কইছে পাশে বসা বড়োমার সঙ্গে। পুজো ওদিকে শেষ হয়েই এল। ঠাকুরমশায়ের দিকে তাকিয়ে বিন্দুর ঠিক ভালো লাগে না। ভীষণ দুর্বল যেন। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে, ঠাকুরমশায় কি অল্প অল্প কাঁপছেন? মনে হচ্ছে শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, তাও স্বর কেমন অস্ফুট। দেবীর ধ্যানমন্ত্রের মাঝামাঝি পৌঁছে রামজয় কোনওমতে বলতে পারলেন, "সদা ষোড়শবর্ষীয়াং। প্রসন্ন্যাস্যাং ত্রিলোচনাম...," হাতের ঘণ্টাটা পড়ে গেল সামনের ফুলের পাত্রে, ঠং করে একটা শব্দ। তারপর ধপ করে আর-একটা। রামজয় মুখ থুবড়ে পড়েছেন দেবীমূর্তির সামনে।

মেয়েদের ভীত চিৎকার-চ্যাঁচামেচির মাঝেই বিন্দু তড়াক করে ঢুকে পড়ল গর্ভগৃহের মধ্যে। রামজয়ের শ্বাস চলছে, তবে অতি ক্ষীণ। হাড়সার বুকটি ওঠানামা করছে খুবই আস্তে আস্তে। বিন্দু দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জোরগলায় বলে, "বেঁচে আছেন, ওগো, ঠাকুরমশায় বেঁচে আছেন।" তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, চোখ দিয়ে নেমে এসেছে জলের ধারা। মেয়েদের পিছনে একটু তফাত রেখে কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ বসেছিলেন, তাঁরা এইবার তাড়াহুড়ো করে উঠলেন, একজন হেঁকে বললেন, "মায়েরা সব সরে যান, ঠাকুরমশায়কে দেখতে দিন।" মেয়েদের কণ্ঠরোল একটু স্তিমিত হল কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা খ্যানখ্যানে উচ্চস্বর শোনা গেল ভিড়ের এক কোণ থেকে, "সর্বনাশ হবে, দেবীর কোপে সব শেষ হয়ে যাবে। মায়ের পূজা অসমাপ্ত। অভিশাপ লাগবে।" হরিমাধব উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখ অপ্রকৃতিস্থ, শীর্ণ ডানহাত আকাশের দিকে তোলা— তর্জনীটি সামান্য বাঁকা হয়ে জেগে আছে, গলার

শির ফুলিয়ে হরিমাধব চিৎকার করছে, "মা রুষ্ট হলেন, এবার আর কারও রক্ষা নেই, অষ্টপুর উজাড় হয়ে যাবে।"

ক্ষীণস্বাস্থ্য হরিমাধবের গলায় এত জোর কোথা থেকে এল? তার উচ্চকিত কণ্ঠে পুরুষেরা হকচকিয়ে উঠে থেমে গেলেন। ফিসফিসানির আওয়াজ গোটা ভিড়টা জুড়ে। মেয়েদের জটলা থেকে একটা তীক্ষ্ণ ফোঁপানির আওয়াজ ভেসে এল। বৃদ্ধ কালীশংকর মিশ্র পাশে দাঁড়ানো খর্বকায় রমাকান্ত গোস্বামীকে ঠেললেন, "যাও না হে রমা, পুজোটা উদ্ধার করে এসো। তুমি এককালে মায়ের পুজো করেছিলে না দু--একবার?" রমাকান্ত অপ্রতিভ ভাবে বললেন, "সে-সব কোনকালের কথা, এখন আর মন্তোরগুলো তেমন..., তা ছাড়া স্নান-আচমন কিছু করা নেই, সে হবে না।" বিপদগ্রস্ত হয়ে কালীশংকর এদিক-ওদিক তাকালেন, হরিমাধবকে পুরোহিত করার প্রস্তাবে তিনিই সর্বাগ্রে আপত্তি তুলেছিলেন, এখন ওই গেঁজেলটাকেই ধরতে হবে নাকি? আবার দেবীর কোপের কথাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওদিকে সকলেই তাকিয়ে আছে সমাজপতি কালীশংকরের মুখের পানে। একটা গলাখাঁকারি দিয়ে কালীশংকর হরিমাধবের দিকে এগোতে যাচ্ছিলেন— হরিমাধব তখনও চেঁচিয়ে চলেছে, "মরবে, সক্কলে মরবে দেবীর শাপে।" এমন সময় একটা রিনরিনে তীক্ষ্ণ কিন্তু সুরেলা গলা শোনা গেল মন্দিরের চাতাল থেকে।

বিন্দুবাসিনী। দস্যি মেয়েটা আঁচল কোমর থেকে খুলে গলায় জড়িয়ে নিয়েছে। গর্ভগৃহের দরজার সামনে দেবীমূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে শান্ত অচঞ্চল। চোখ বন্ধ, হাত দুটো বুকের কাছে এসে জোড় হয়ে আছে, মুখ থেকে নির্ভুল উচ্চারিত হচ্ছে দেবীর ধ্যানমন্ত্রের বাকি অংশটুকু।

'মুণ্ডমালাবলী রম্য পীনোন্নতপয়োধরাম
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাং
শত্রুক্ষয়করাং দেবীং সাধকভীষ্টদায়িকং
সর্বসৌভাগ্যজননী মহা সম্পদপ্রদং স্মরেৎ॥'

পুরো ভিড়টা কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। চারদিক নিস্তব্ধ। গাঙের হাওয়ায় প্রদীপের শিখাগুলো অল্প অল্প কাঁপছে। মন্দিরের চাতালে শুয়ে থাকা রামজয়ের শ্বাস চলছে ক্ষীণ। কালীশংকরের মুখ হাঁ। বিল্ববাসিনী কাঁপা হাতে ঘোমটা সামান্য

তুলে ধরে বোনের দিকে চেয়ে আছে অবাক হয়ে। আশ্চর্য ব্যাপার— হরিমাধবের হম্বিতম্বিও থেমে গেছে মুহূর্তের জন্য। জোড়া জোড়া চোখ বিন্দুর বারোবছুরে পিঠটায় বিঁধছে এসে। কিন্তু বিন্দুর খেয়াল নেই সে-দিকে। মন্ত্রপাঠ শেষ করে সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে গর্ভগৃহের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে। কেউ যদি খেয়াল করত তবে দেখতে পেত, বিন্দুর দুই চোখ উপচে জল গড়াচ্ছে, "হেই মা বিশালাক্ষী, দোষ নিয়ো না মা গো, ঠাকুরমশায়কে বাঁচিয়ে দাও।" বলতে বলতেই তার খেয়াল হয় রামজয়ের কথা। চট করে উঠে গিয়ে বসে বৃদ্ধ পুরোহিতের পাশে।

বিন্দুর কাণ্ড দেখে হরিমাধব আবার চেঁচিয়ে উঠেছে, "ঘোর অনাচার, ঘোর পাতকী। মেয়েমানুষের মুখে দেবীর মন্ত্র, অশুচি কাপড়, আচমনহীন— সবাই নির্বংশ হবে, মড়ক লাগবে গাঁয়ে, জেনে রেখো তোমরা।" শেষ কথাটা ভিড়ের দিকে হাত ঘুরিয়ে তীব্রকণ্ঠে বলে হরিমাধব। পুরুষদের জটলা থেকে কয়েকজন এগোল চাতালের দিকে। বিল্ববাসিনী থরথর করে কাঁপছে, কী অনাছিষ্টি কাণ্ড করে বসল হতভাগী মেয়েটা। ভয়ে, ত্রাসে বিল্ববাসিনী চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল, "ও বড়োমা গো, কী হবে মা?" বড়োমা ভবতারিণী এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির আকস্মিকতায় বুঝি তিনি সামান্য দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলেন। বিলুর বিপন্ন কণ্ঠস্বরে ভবতারিণী যেন জেগে ওঠেন, দৃঢ় পদক্ষেপে চাতালের উপর উঠে ভিড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়ান।

আধা ঘোমটা দিয়ে মুখটা সামান্য পাশ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছেন ভবতারিণী, কিন্তু তাঁর মুখে কঠোর ব্যক্তিত্বের ছাপ প্রবলভাবেই দৃশ্যমান। গম্ভীর ও শান্ত গলায় তিনি বলেন, "আপনারা সকলে শান্ত হন, বিচলিত হবেন না।" হরিমাধব তখনও খ্যাপার মতো চেঁচিয়ে চলেছে 'অনাচার, অনাচার' করে, তার দিকে তাকিয়ে ভবতারিণী বেশ উঁচুগলাতেই বলেন, "হরিমাধব, চুপ করো। দেবীর পূজা উচিতরূপে সমাপ্ত হয়েছে, কোনও অনাচার হয়নি। অযথা গোল কোরো না।" কালীশংকর মিশ্র ধীরপদে এগিয়ে এসেছেন চাতালের ধার ঘেঁষে, বেশ একটু দ্বিধাভরেই বললেন, "কিন্তু বড়োমা, হরি তো ঠিকই বলেছে, মেয়েমানুষ দেবীর মন্ত্র পড়েছে সংকল্প-আচমন না করেই...," কালীশংকরের কথা শেষ হওয়ার আগেই ভবতারিণী বেশ জোরে জোরে মাথা নাড়েন, "বারো বছর বয়েস বিন্দুর, ব্রাহ্মণ কন্যা, কুমারী, ঋতু হয়নি এখনও"— এই কথাটি বলে বিল্ববাসিনীর দিকে প্রশ্নভরে তাকান একবার বড়োমা। বিলু ঘোমটায় মুখ লুকিয়ে ফ্যালে, শুধু দীর্ঘ ঘোমটার নড়াচড়ায় বোঝা যায় উত্তরটি না বাচক।

ভবতারিণীর দাপটে হরিমাধব একটু স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, কৃশ শরীরটি আন্দোলিত করে সে এবার গলা তুলেই কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভবতারিণী তাকে সে-সুযোগ দেন না, "পুজোয় কোনও দোষ হয়নি। ও মেয়ে মায়ের কুমারী অংশ পেয়েছে আজ। অতটুকু মেয়ে নইলে কখনও দেবীর মন্তর বলতে পারে অতটা? ভুলচুক করেছে কিছু মন্তর বলতে গিয়ে?"

সকলের চোখ ঘুরে গেছে হরিমাধবের দিকে। হরিমাধব ফাঁপরে পড়ে এইবার, মন্ত্রটি তারও জানা নেই। অপ্রতিভ ভাবে তুতলিয়ে সে বলে, "হ্যাঁ মানে, না— ভুল কিছু নেই। কিন্তু...," ভবতারিণী এইবার বাগে পেয়েছেন হরিমাধবকে। গাঁয়ের লোক এমনি এমনি তাঁকে বড়োমা বলে শ্রদ্ধা করে না। স্বর্গত জমিদার দুর্গাগতি চৌধুরির বিধবা তিনি, জাঁদরেল শিবগতি চৌধুরির মা— জনতার মর্জি কেমন করে বদলাতে হয় তা তিনি ভালোই জানেন। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তিনি বলেন, "গেল-বছর লাহিড়িঠাকুরের ছোটোমেয়েটির কুমারী রূপে পুজো হয়েছিল না? আমাদের ঠাকুরমশায় কী বলেছিলেন তখন? বারো বছরে ব্রাহ্মণকন্যা মায়ের অংশ, সাক্ষাৎ ভৈরবী— বলেননি?" এবার প্রশ্নটা ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা বৃন্দাবন লাহিড়ির দিকে চেয়ে।

বৃন্দাবন লাহিড়ি ধনী মানুষ নন। অল্প কিছু জমিজমা আছে, সে-আয়ে তাঁর বৃহৎ সংসার চলে না। জমিদারবাড়ির সিধে তাঁর একটা মস্ত সম্বল। যে-মেয়েটির কথা বললেন বড়োমা, পাঁচি, বৃন্দাবনের ছোটোমেয়ে— বড়োমার গোপন অর্থসাহায্য ছাড়া গতবছর তার গৌরীদানও একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। সুতরাং গলা চড়িয়ে বৃন্দাবন বললেন, "হ্যাঁ সে-কথা নিয্যস সত্যিই বটে। বড়োমা যা বলেছেন, তাতে আর সন্দেহ কী? সবই মায়ের ইচ্ছে। জয় মা।" আড়চোখে হরিমাধবের দিকে চাইতে চাইতে জয়ধ্বনি দিলেন বৃন্দাবন।

ভবতারিণী ফের একবার উচ্চকণ্ঠে বললেন, "অযথা গোল করবেন না, ঠাকুরমশায় ভয়ানক অসুস্থ, কেউ কবিরাজমশায়কে খবর দিন।" ভিড়ের পিছন থেকে স্থূলকায় গৌরীনাথ কবিরাজের বর্তুল মুখটি উঁকি মারল। সামান্য হাঁপাতে হাঁপাতে কবিরাজ বললেন, "আজ্ঞে, বড়োমা, আমি এসে গেছি, খবর পেয়েই আসছি দৌড়োতে দৌড়োতে।"

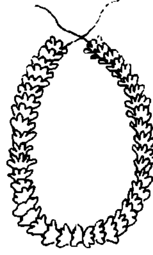
দৌড়ে কবিরাজ আসেননি অবশ্য, সেটা তাঁর ডুলি আর দু'খানি বেহারাকে দেখেই বোঝা যায়। বেহারারা অবিশ্যি যথাসাধ্য দৌড়েই এসেছে— সেটা তাদের ঘর্মাক্ত

কলেবর থেকেই বেশ স্পষ্ট। রামজয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে গৌরীনাথের মুখ আঁধার হয়ে গেল। "ওরে কানাই-বলাই, ঠাকুরমশায়কে ডুলিতে তোল, বাড়ি নিয়ে গিয়ে চিকিচ্ছে করতে হবে।" কবিরাজমশায়ের ডাকে বেহারা দুটো এগিয়ে আসার আগেই একটা বেশ কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "থামুন, ঠাকুরমশায়কে এই ভর সন্ধেবেলায় অব্রাহ্মণের ছোঁয়ার দরকার নেই।" নীলমাধব। কখন এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে দাদা হরিমাধবের পাশে। সঙ্গে বামুনপাড়ার দু'-একটা ছেলেছোকরাও জুটিয়ে এনেছে। তারাই ধরাধরি করে রামজয়কে তুলে দিল ডুলিতে। ডুলি চলে গেল কবিরাজের বাড়ির দিকে। পিছনে গেলেন কবিরাজ মশায়, হেঁটে।

ভবতারিণী এতক্ষণ ভ্রু কুঞ্চিত করে পুরো ব্যাপারটা দেখছিলেন। নীলমাধবের অবশ্য তাতে কোনও বিকার নেই, খুব স্বাভাবিকভাবেই রামজয়কে ডুলিতে তোলার ব্যবস্থা করে সে হরিমাধবের হাত ধরে টানে, "বাড়ি চলো দাদা।" হরিমাধব অনুজের দিকে ফিরে কিছু বলতে যাচ্ছিল— নীলমাধব ধমকে ওঠে, "বাড়ি চলো অখন, বিহিত হবে সবের। বিহিত হবে।" শেষ কথাটা এত জোরে বলা— সবাই চমকে উঠল। বিল্ববাসিনী চমকায়নি। সংসারের কর্তা নীলমাধবের কর্কশ উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সে পরিচিত। কিন্তু সন্ধের এই অন্ধকারে 'বিহিত হবে' কথাটা তার কানে কেমন একটা অশুভ ইঙ্গিত হয়ে বাজল এসে। শিউরে উঠে সে বোনের হাতখানা শক্ত করে ধরল। বিন্দু তখনও অঝোরে কেঁদে চলেছে।

---

২. বনপর্ব, মহাভারত



তিন

সে-রাতে দুই বোন যখন শুতে এল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মন্দিরের ভিড় ভাঙলে বড়োমা দুই বোনকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের সঙ্গে। সেখানে জোর করে দু'টি জলপান খাইয়ে সঙ্গে লোক দিয়ে বাঁড়ুজ্যেবাড়ি পাঠালেন ওদের। দাওয়ায় পা রাখতে না-রাখতে যোগমায়ার তর্জন, "দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষিছি। ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করি, আবাগির বেটিদের অনাচারে সব উচ্ছন্নে যাবে। দূর হ, দূর হ সব।" তেড়ে আসছিলেন যোগমায়া, ভাবগতিকে মনে হচ্ছিল মেরেই বসবেন এক ঘা। নীলমাধব বকুনি দিয়ে আটকায় ক্রুদ্ধা স্ত্রীকে। তার কতটা বিলু-বিন্দুর কথা ভেবে আর কতটা জমিদারবাড়ির পেয়াদাকে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—সেটা বলা অবশ্য মুশকিল। খাওয়াদাওয়া অবশ্য জোটেনি দুইবোনের সে রাতে আর। "দুনিয়াশুদ্ধু লোকের পিণ্ডির জোগাড় করতে পারবুনি বাপু" বলতে বলতে দুমদুম করে ঘরে গিয়ে শিকল দিয়েছেন যোগমায়া।

বুড়োকত্তা আজ বেশ ভালোমতন কেৎরে আছেন। বিশেষ গোলযোগ করছেন না, ঘুমিয়ে আছেন। সে-দিকটা একবার তদারক করে এসে বিছানা করতে করতে হেসে ফেলল বিলু, "মেজোগিন্নির ঘাড়ে আজ হেঁশেল ঠেলার ভার পড়েছে, তাই মেজাজ গরম।" দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে বিন্দু। জমিদারবাড়ি থেকে ফেরার

পর একবারের জন্যও মুখ খোলেনি মেয়েটা, চোখের জল চোখেই শুকিয়ে গেছে। বিলুর মুখ কোমল হয়ে এল। বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলল, "চিন্তা করিসনে বিন্দু, ঠাকুরমশায় ঠিক হয়ে যাবেন।" এইবার ঘুরে ফুঁপিয়ে উঠল বিন্দু। ছলছল চোখে দিদিকে জড়িয়ে ধরে বলল, "সত্যি বলছিস তুই দিদি?" "সত্যি, সত্যি, সত্যি। তিন সত্যি। কোবরেজ-কাকা আমাদের সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। ঠাকুরমশায় দু'দিন বাদেই ঠিক উঠে বসবেন, পুজোয় যাবেন, কথকতা করবেন— দেখে নিস তুই।" বিলু হাসে বিন্দুর চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে।

দিদির কথায় বিন্দু আশ্বস্ত হয়। "জানিস দিদি, ঠাকুরমশায়কে দেখে বাবার কথা মনে পড়ে খুব।" বলতে বলতে ফের একবার চুপ করে যায় বিন্দু। বিলুও চুপ। খানিক বাদে নিস্তব্ধতা ভেঙে সে বোনকে জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁরে বিন্দু, তুই অত বড়ো মন্তর পড়ে গেলি কেমন করে? তুই কি পড়তে শিখেছিস নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে? কী সব্বোনেশে মেয়ে তুই— মাগো মা!" বিন্দু খিলখিলিয়ে ওঠে, দিদিটা ভারী বোকা, "ধেৎ, পড়তে পারি বুঝি আমি? ওগুলো তো শুনে শুনে মুখস্ত হয়ে গেছে।" বিলু বিস্ময়াহত, "শুধু শুনে শুনে, ও মাগো, কোথায় যাব আমি!" মুখে হাত চাপা দিয়ে শিউরে ওঠে সে। বিন্দু হেসেই চলেছে। "রাতবিরেতে গলা ফেড়ে হাসিসনে অত, ধিঙ্গি মেয়ে কোথাকার!" বোনকে ধমক দেয় বিলু। তবে তার বিস্ময় যায়নি এখনও। "তুই বাবার নাম রাখবি বিন্দু, আমি তোকে এই বলে রাখলাম।" বিন্দু উৎসাহ পেয়ে তড়বড় করে বলে ওঠে, "তুই দেখিস দিদি, বড়ো হয়ে আমি বাবার মতো পাঠ করব, কথকতা করে বেড়াব— এই গাঁয়ে, হুই গাঁয়ে, অনেক অনেক দূরে।" বিলু সস্নেহে বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তার চোখের কোণে টলমল করে ওঠে দু'টি অশ্রুকণা।

সে-রাতে দুই বোনের আর ঘুম হল না। পাশাপাশি শুয়ে শুয়ে দু'জনে অবিশ্রান্ত গল্প করতে লাগল— বাবার কথকতার আসরগুলির কথা, মায়ের শান্ত গৃহস্থালির কথা, ফেলে আসা গ্রামের কথা। বাইরে শেষরাতের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে দাওয়ায়, ঘরের চালে। ভিটের কোণের কাঁঠালগাছটায় কাঁঠাল পেকে ম-ম করছে গন্ধ। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ। বুড়ো চৌকিদার হরলাল ঘুমিয়ে পড়েছে ঠিক, তার হাঁক শোনা যায় না। নিশ্চুপ এই শেষ প্রহরে বোঝার উপায় নেই সন্ধেবেলা এমন একটা তুলকালাম হয়ে গেছে। বিন্দুদিদির একঢাল চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দেয়, কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ— মায়ের চুলেও এমন গন্ধ ছিল, তার আবছা আবছা মনে পড়ে।

* * *

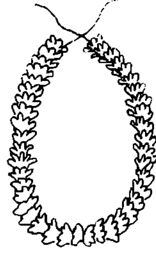
রামজয় অবশ্য আর উঠে বসেননি। গৌরীনাথ কবিরাজ পরে বলেছিলেন, "হৃৎপিণ্ডের গতি অতিশয় দুর্বল। সূচিকাভরণ প্রয়োগ করেও টাল সামলাতে পারলাম না। তবে ঠাকুরমশায় পুণ্যবান পুরুষ। প্রাণটা বুকের মধ্যে সারারাত ধুকধুক করেছে, ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে দেহ রাখলেন।" খবরটা শুনে বিন্দু কাঁদেনি আর। ওই একটা রাতে মেয়েটার মনের বয়েস বেড়ে গেছে অনেকখানি। দুপুরবেলা রামজয়ের নশ্বর দেহ বাঁশের চালায় তুলে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাচ্ছে সবাই— বিন্দু শুধু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, কাছে ঘেঁষেনি।

খোড়ো ঘরখানা খালি হয়ে গেলে ধীরে ধীরে বিন্দু ঢুকল সেখানে। নিরাভরণ ঘরখানিতে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। ঘরের একদিকে মাটিতে বিছানা করা, তার পাশে একখানি জলের কুঁজো। চালের থেকে দু'-একটি শিকে ঝুলছে, তাতে দু'-একটা মাটির হাঁড়ি। ঘরের দক্ষিণদিকে একখানি জানালা, তার তলায় ঠাকুরের আসন। একখানি শিবলিঙ্গ, একখানি বিশালাক্ষীর পট। দু'-একটি শুকনো ফুল-বাতাসা তার সামনে। আসনের পাশেই কাঠের একটা জলচৌকির উপর রাখা লাল হলুদ কাপড়ে জড়ানো কয়েকখানি পুঁথি। কাপড়ের উপর তেল-সিঁদুরের টিপ। পড়তে না পারলেও বিন্দু জানে ওখানে আছে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণ', 'শ্রীশ্রী চণ্ডী', একটি 'মনসামঙ্গল', একটি 'ধর্মমঙ্গল'। অনেক নিস্তব্ধ দুপুর বিন্দু এই ঘরে কাটিয়েছে ঠাকুরমশায়ের পাঠ শুনতে শুনতে। পড়তে পড়তে রামজয় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। বিন্দুর দিকে চেয়ে বলতেন, "তোর বাবার মতো তো আর পারব না রে মা, রঘুনাথ-দাদা ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। অমন জ্ঞান, অমন স্মৃতি— সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র।" বিন্দু অবাক হয়ে দেখত বৃদ্ধের চোখের কোল ভিজে উঠেছে।

আজ এই শূন্য কুটিরে বসে সহজ-সরল সেই বৃদ্ধ পূজারির কথা মনে করে বিন্দুর চোখ উপচে জল উঠে আসছে। বহু কষ্টে সে নিজেকে সামলায়— কাঁদবে না কিছুতেই, কাঁদবে না আজ বিন্দুবাসিনী। রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সে, নুইবে না, ব্যথায় ভেঙে পড়বে না। একদিন তার বাপের মতো লোকে তার নামও করবে, মেয়েমানুষ বলে দমিয়ে দিয়ে ছুড়ে ফেলতে পারবে না। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া একফোঁটা জল মুছে ফেলে বিন্দু উঠে দাঁড়ায়, দু'হাত দিয়ে বুকে তুলে নেয় পুঁথিগুলো।

ঘরের বাইরে রোদের তাত কমে এসেছে তখন, বিকেল হয়েছে। রামজয়ের ঘরের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে বাঁশবাগানের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে হেঁটে নদীর কাছে পৌঁছোয় বিন্দু। পুঁথিগুলো বুকে আঁকড়ে ধরে বিন্দু শুকনো ঘাসে ছাওয়া পাড়ের একদম ধারে এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে সামান্য দূরে শ্মশানঘাটে রামজয়ের নশ্বর দেহ এখন পুড়ে ছাই হচ্ছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বিন্দু একটা একটা করে পুঁথি ছুড়ে ফেলে কলকল করে মৃদুস্বরে বয়ে যাওয়া নদীর বুকে। পাড় থেকে বেশি দূরে না গেলেও, ভারী পুঁথিগুলি ডুবে যায় চট করে। সবক'টি পুঁথির বিসর্জন শেষ হলে বিন্দু ধপ করে বসে পড়ে মাটির উপর— শ্মশানঘাট থেকে তখন চিতার আগুন আর ধোঁয়া বিকেলের আকাশকে ছুঁতে চাইছে।



চার

রামজয়ের মৃত্যুর পর মাস-দুয়েক কেটে গেছে। অষ্টপুর গ্রাম আবার নিজের ধীরগতির যাপনে ফিরেছে যথারীতি। তবে এর মধ্যে বেশ কয়েকটা ঘটনাও ঘটে গেছে। বিশালাক্ষীর নতুন পুরোহিত হয়ে বসেছে হরিমাধব। বড়োমা অনেক চেষ্টা করেও সেটা আটকাতে পারেননি। সমাজপতিরা সে-রাতে জমিদারবাড়ির প্রতাপ আর বড়োমার ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নোয়ালেও, পরে চণ্ডীমণ্ডপের বিভিন্ন জটলায় বিরুদ্ধ মতটাই বারবার উঠে এসেছে। শিবগতির সেটা অজানা নয়। মায়ের রাগ ও অভিমান সত্ত্বেও এবার তিনি তাই অনড় থাকলেন। কালীশংকর মিশ্র প্রভৃতি যে দু'-একজন আগে হরিমাধবের বিষয়ে আপত্তি তুলেছিলেন, তাঁদের ভার নিল নীলমাধব।

জনে জনে গিয়ে সে বলে এসেছে— রামজয় ঠাকুরমশায় দেবীর কোপে পড়েছিলেন। মায়ের থানে মেয়েমানুষকে দিয়ে পুরাণ পাঠের ধরতাই দেওয়ানো, গোপনে মন্ত্রপাঠ শেখানো— দেবী আর সইতে পারেননি। দেবীর আর ভূস্বামীর কোপে একসঙ্গে কে-ই বা পড়তে চায়। হরিমাধব নির্বিবাদে মায়ের পূজারি হয়ে বসল। এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস হল— মন্দিরে বিন্দুর ঢোকা নিষেধ হয়ে গেল। নতুন পুরোহিত অনাচারের ঘোর বিরোধী। যোগমায়া ধুয়ো তুলেছিলেন, "শুধু মায়ের থান কেন? বাড়ি থেকেও দূর করে দাও অলক্ষ্মীটাকে।" নীলমাধব ফের একবার ধমক

দিয়েছিল মেজোগিন্নিকে। ভবতারিণী এখনও এ গাঁয়ের বড়োমা। দুই বোনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। ধুরন্ধর নীলমাধব কোনও ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না এখন।

যোগমায়ার তীব্র ক্ষোভ অন্যভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে এর পর থেকে। ঘর-গেরস্তির সব কাজের ভার যে এবার বিলুর ঘাড়ে পড়বে, তা যেন একরকম জানাই ছিল বাঁড়ুজ্যেবাড়ির সবার। সে হলেও হত, কিন্তু তার সঙ্গে যোগ হল অষ্টপ্রহর গালিগালাজ। প্রচণ্ড ক্ষোভের তাড়নায় যোগমায়া বিলু-বিন্দুর চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করেন উঠতে-বসতে। বিলু নীরবে সে-সব শুনতে শুনতে কাজ করে যায় অবিশ্রান্ত। আর বিন্দু? বিন্দু আজকাল বাড়িতে থাকেই না বলতে গেলে। সকালবেলা কোন ফাঁকে বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই রাতের বেলায়। সমস্ত দিন খায় কি খায় না, বিলুর বড়ো চিন্তা হয়।

বয়সে অনেক ছোটো হলেও, দুরন্ত কনিষ্ঠা ভগিনীটিকে বিলু একটু শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। বাবা রঘুনাথের বেশি কাছের ছিল বিন্দু, ছোটোমেয়েটির সঙ্গেই ছিল তাঁর যত গল্প। কখনও-সখনও বিলু-বিন্দুর মা অন্নপূর্ণাকে বলতেন, "বুঝলে বড়োবউ, তোমার ছোটোমেয়েটি সিদ্ধজাতিকা। এইটুকু বয়েসে এমন স্মৃতি, এমন নিখুঁত উচ্চারণ— ঈশ্বরকৃপা না থাকলে হয় না।" বিলু মায়ের ন্যাওটা বরাবর। ঘর-সংসারের কাজে, মেয়েলি ব্রত পালনে তার উৎসাহ। বাবার সঙ্গে তাই তার দূরত্বটাও ছিল বিস্তর। আজকাল বিলুর মনে হয়, বাবা বুঝি তাকে একটু কমই ভালোবাসতেন।

আজ খুব সকালে উঠেছে বিলু। এখন এ তার রোজের নিয়ম। সকালে উঠেই লেগে যেতে হয় কাজকর্মে। কাজ করতে করতেই বিলু নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবে। চোদ্দো বছর বয়েসে সে এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছে। তারপর কেটে গেছে আট-আটটা বছর। কিন্তু বাপের বাড়ি তার আর যাওয়া হয়নি। তার বিয়েটাও হয়েছিল খুবই তাড়াহুড়ো করে। তার মা অন্নপূর্ণার গুরুদেবের লতায়-পাতায় আত্মীয় হতেন ব্রজমাধব। দ্বিতীয় স্ত্রী-র স্বর্গলাভের পর ব্রজমাধব তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন। অন্নপূর্ণার গুরুদেব তুতো-ভাইটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন রঘুনাথের বাড়ি। শ্রাবণের সে এক বর্ষণক্লান্ত বিকেল। রঘুনাথ আপ্যায়ন করে বসিয়েছিলেন অতিথিদের। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই গুরুদেবের মুখের প্রস্তাবটি শুনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি উঠে দাঁড়ান। কিন্তু হাজার হোক, গুরুস্থানীয় মানুষ, পূজ্য ব্যক্তি— রঘুনাথ মুখে কিছু বলতে পারেননি। শুধু সশব্দ পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকেছিলেন হেঁশেলে। অন্নপূর্ণা রান্নায় ব্যস্ত, বিলু মাকে সাহায্য করছে—

অবাক হয়ে সে দেখেছিল বাবার মূর্তি। খোলা উঠোন পেরিয়ে নগ্নপদে পাকশালের দোরে এসে দাঁড়িয়েছেন রঘুনাথ, পায়ে কাদা লেগে, মাথা ভিজে। শেষবৃষ্টির জলটুকু পড়ছে তখনও। হাত মুষ্টিবদ্ধ, রগের শিরা ফুলে উঠেছে— প্রচণ্ড ক্রোধে রঘুনাথের ভিতর থেকে পিতৃপুরুষের দস্যুভাব বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। বিলু বাবার এমন রূপ দেখেনি কখনও।

অন্নপূর্ণা হকচকিয়ে গেলেও চট করে ঘোমটা টেনে দিয়েছেন। রঘুনাথ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, "বড়োবউ!" স্বামীর কথার উত্তর না দিয়ে অন্নপূর্ণা বিলুর দিকে তাকালেন, "বিলু তুই ভেতরের ঘরে যা, দেখ বিন্দু কী করছে।" বিলু উঠে গিয়েছিল বটে কিন্তু ভিতরে যায়নি। চোদ্দো বছর বয়েস হয়েছে তার, কিছু যে একটা ঘটছে— সে সেটা বেশ ভালোই বুঝতে পারছে। পাকশালের পিছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে সে বাবা ও মায়ের তর্কাতর্কি শোনে।

অন্নপূর্ণা এমনিতে শান্তস্বভাবা, স্বামীর কথার বিরোধিতা তিনি কখনও করেন না— বিলু শুধু মাতৃমুখীই হয়নি, মায়ের নরম স্বভাবটিও পেয়েছে। সে-দিন বিলু দাঁড়িয়ে শুনেছিল অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ড উত্তেজনা, "আপনি এর বিরোধ করলে আমি আত্মঘাতী হব— এই জেনে রাখবেন। গুরুদেবের আদেশ অমান্য করলে নরকস্থ হতে হবে, আমি সে হতে দেব না।" দীর্ঘ বাক্‌বিতণ্ডার সবটা বোঝেনি বিলু, তবে দেখেছে শেষ পর্যন্ত পিতার হার হয়েছে। ঋজুদেহ রঘুনাথ কয়-মুহূর্তেই যেন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন, মাথা হেঁট করে তিনি ধীরপদে ফিরে গেলেন বাইরের ঘরে যেখানে কন্যার পিতার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে আছেন দু'জন বৃদ্ধ— তার একজন হবু জামাতা রঘুনাথের।

বিলু পরে কর গুনে দেখেছিল, ব্রজমাধব রঘুনাথের থেকে বয়েসে ঠিক যোলো বছরের বড়ো। তার এখন মনে হয়, বিন্দু যদি তার জায়গায় থাকত— রঘুনাথ কখনওই এ বিয়ে হতে দিতেন না। বিন্দু সিদ্ধজাতিকা, তার জন্য নরকস্থ হওয়াই যায়, বিলু তো যেমন-তেমন একটা মেয়ে— বিদ্যা নেই, জ্ঞান নেই— সে-মেয়ের অদৃষ্টকে 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' বলে পাশ কাটানোটাই হয়তো স্বাভাবিক। হঠাৎই বিলু চমকে উঠল, ছি-ছি! এসব কী ভাবছে সে! বাবাকে তো সে কম ভালোবাসত না। বিয়ে হয়ে অষ্টপুরে আসার পরে বাবাকে মনে করে অনেক রাত কেঁদে ভাসিয়েছে সে। কিন্তু কোন এক দুর্বিসহ অভিমানে রঘুনাথ আর পা দেননি কন্যার শ্বশুরগৃহে। মা অন্নপূর্ণা মাঝে মাঝে মাহিন্দার বলরামকে পাঠাতেন মেয়ের খোঁজ নিতে, সে দোরের বাইরে

থেকে কুশলসংবাদ নিয়ে যেত।

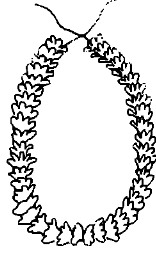
কুশলসংবাদ আর কী? বিলু একটু দুঃখের হাসি হাসে। বিয়ে করে বাঁড়ুজ্যেবাড়ি আসার পর বেজায় হাঙ্গামা হল, তারপর বুড়োকত্তা দু’-একদিন সোহাগ করার চেষ্টাচরিত্র করলেও বিলু ভয়ে সিঁটিয়েই থাকত। তারপরে তো বিলু বড়ো হল, ভরভরন্ত হল— বুড়ো ততদিনে জরাগ্রস্ত। বাপ-মা, ছোটোবোনটিকে দেখেনি অনেকদিন— একবার ভাবছে বলবে যাতে তাকে কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাপের বাড়ি, রঘুনাথের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছোল। খবর পেয়ে হরিমাধব আর নীলমাধব চলে গিয়েছিল। ফিরল বিলুর ছোটোবোনটিকে নিয়ে, অন্নপূর্ণাও দেহ রেখেছেন। রঘুনাথের খাস জমিজমা ছিল কিছু, অন্নপূর্ণার ছিল কিছু স্ত্রীধন গহনা— সে-সবের ব্যবস্থাও বোধহয় তারাই করে এসেছিল। কীভাবে? অতশত জানে না বিলু। জানতে চাওয়ার সাহসও নেই।

বোনটি ছাড়া আর কেউ রইল না তো দুনিয়ায়। বিলু মাঝেমধ্যে ভাবে, বিধাতা আর কী কী লিখে রেখেছেন তার কপালে। মা গেলেন, বাবা গেলেন, স্বামী থেকেও না থাকার মতো। এ গাঁয়ের দু’জন তাও একটু ভালোবাসতেন দুই বোনকে— তার একজন রামজয় ঠাকুরমশায় তো চলেই গেলেন বরাবরের মতো। আর ছিলেন বড়োমা। তিনিও গত হপ্তায় কাশীধামে চলে গেলেন। ভবতারিণীর গুরুদেব সেখানে শেষশয্যায়, মৃত্যুর আগে প্রিয় শিষ্যাকে একবার দেখতে চান তিনি। সেই রাতে বড়োমা না থাকলে কী যে হত, এখনও ভাবলে বিলুর গায়ে কাঁটা দেয়। বড়োমা অবিশ্যি বলেছেন, “কোনও চিন্তা করিস না মা, মাস-দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব আমি। এই ভবতারিণী দাসী যতদিন বেঁচে আছে, জানবি তোদের একজন মা আছে।” চোখের জল সামলে টিপ করে প্রণাম করেছিল বিলু।

তবে চিন্তা কী আর হয় না? ব্রজমাধব যে আর বেশিদিন টিকবেন না সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আগে তাও গলার আওয়াজে বোঝা যেত মানুষটা আছে, কয়েকদিন ধরে নির্জীবের মতো পড়ে আছেন, সাড়াশব্দ করেন না, এপাশ-ওপাশ করিয়ে দেয় বিলু, তখন গলা দিয়ে একটু ঘড়ঘড় শব্দ পাওয়া যায়। কবিরাজমশায়কে ডাকার কথা এ বাড়ির কারও মনেও নেই বোধহয়। কালকে রাতেও গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে, ধুম জ্বর। আজ হাতের কাজগুলো সেরে নিয়ে যোগমায়ার কাছে মিনতি করবে বিলু কবিরাজমশায়কে একবার ডাকানোর জন্য।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই বিলু দেখে পাছদুয়োরের বেড়া সরিয়ে চুপিচুপি

বেরিয়ে যাচ্ছে বিন্দু। সকাল থেকে মুখে কুটোটি কাটবে না, সারাদিন টো-টো করে বেড়াবে আদাড়ে-বাদাড়ে। বিলু বোঝে— রামজয়ের মৃত্যুটা বড়োই লেগেছে মেয়েটার কচি মনে। কিন্তু এমন অত্যাচার করলে রোগে পড়তে কতক্ষণ। পিছু ডাকতে গিয়েও সামলে নিল বিলু। ওদিকে বাছুরটা দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে কীভাবে যেন! একটুও দুধ পাওয়া যাবে না যদি একবার বাঁটে মুখ লাগাতে পারে। বাছুরটাকে ফের বাঁধতে বাঁধতে বিলু ভাবে, ফিরুক রাত্তিরবেলা ডাকাত মেয়েটা, খুব করে ধমক দেবে।



পাঁচ

বাড়ির পিছনদিকে গোয়ালঘর, তার একদিকে ধানের মরাই কতকগুলো। তার পাশে ঢেঁকিশাল। সেখান দিয়ে চুপিসারে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে এল বিন্দু। দিদিটা সকাল থেকে উঠে কাজে লেগেছে। দেখতে পেল কি না কে জানে? বেচারি দিদি। দোষ করল সে আর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বিলুর। দিদিটা অবশ্য ভিতুও আছে। সে নেহাত দিদির কথা ভেবে চুপ করে থাকে। নইলে যোগমায়াকে জব্দ করা কী এমন হাতিঘোড়া ব্যাপার। সময় বুঝে দুয়োরের কাছে একটু ভিজিয়ে অল্প রেড়ির তেল ঢেলে রাখলেই দু'মাসের জন্য নিশ্চিন্ত। পড়ে থাকবেন গিন্নিমশায় বুড়ো বাঁড়ুজ্যের পাশের ঘরে। দৃশ্যটা কল্পনা করেই বিন্দু ফিক করে হেসে ফেলে।

এখন বেশ পরিষ্কার আলো ফুটেছে। বুড়োদের একটা দল স্নান করতে যাচ্ছে গাঙে। গঙ্গা নাইবে, পুণ্যি হবে। পুণ্যির বহর দেখে বিন্দু তো আর বাঁচে না— এরাই সব বলেছে ঠাকুরমশায় নাকি দেবীর কোপে পড়েছিলেন। ঠাকুরমশায় যখন পুজো করতেন কেমন যেন ভর হত তাঁর উপর। পুজো করার সময় ঠাকুরমশায়ের মুখে অমন অপূর্ব ভাব, সকলে স্তব্ধ হয়ে দেখত পুজো। সেই ঠাকুরমশায়কে নাকি দেবী শাপ দিয়েছেন। নিজের অপমানে বিন্দুর তেমন গা হয় না বহুদিনই। সে-রাতের পর থেকে বামুনপাড়ার বউ-ঝি-রা তাকে পথে দেখলে ছিটকে সরে যায়, কথা কওয়ার

তো প্রশ্নই নেই। উমাশশীর উপর শাসন করেছেন মোক্ষদা— সইয়ের সঙ্গে দেখা করা মোটেও চলবে না। আজ বাদে কাল বিয়ে দিতে হবে তো মেয়েটার, ওই ধিঙ্গি বিন্দুর সঙ্গে মাখামাখির খবরটা যদি চাউর হয়ে পড়ে তবে আর রক্ষে নেই। ভাংচি দেওয়ার লোকের অভাব আছে নাকি এই গাঁয়ে? তবু উমাশশী পালিয়ে আসে কখনও-সখনও সইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সে আর ক'বার? সারাটাদিন বিন্দুর একা একাই কাটে।

তাঁতিপাড়ার পাশদিয়ে যেতে যেতে বিন্দু থমকে যায়। হরিপদ সাধু গান ধরেছে।

'আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকি যারে
সে কি আমায় বুঝতে পারে?
আমি সব ছেড়েছি তারই তরে
আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকি যারে।'

কাল রাতে অনেকটা বৃষ্টি হয়ে হরিপদর ঘরের পিছনের কলাগাছের পাতাগুলো চকচক করছে। তাদের নধর সবুজ নুয়ে পড়া কাঁদি থেকে দু'-এক ফোঁটা জল এখনও গড়িয়ে পড়ছে নীচের আকন্দ ঝোপে। আকাশ পরিষ্কার হলেও রোদ নেই। শিরশিরে একটা হাওয়া দিচ্ছে, সেই হাওয়ায় হরিপদর আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে। অদ্ভুত মানুষ এই হরিপদ সাধু। হরিপদ বাপ-পিতেমোর পেশা ছাড়তে পারেনি, তাঁত চালিয়েই খায়, তবে তার মন হচ্ছে গানবাজনার দিকে। জাতে বোষ্টম হরিপদ নিজের বাড়িতেই আখড়া করেছে, সকাল থেকে সেখানে নামগান চলে। বামুন-কায়েতরা আসে না বটে— তবে ছোটোজাতের মধ্যে হরিপদর নাম খুব আশেপাশের আট দশটা গাঁয়ে। তবে শুধু নামগান নয়, হরিপদ কবিয়ালও বটে। গেল-বছর অম্বুবাচির ব্রত পালন করার পর বড়োমার ইচ্ছেয় জমিদারবাবু বিরাট মোচ্ছবের আয়োজন করেন। দুইদিন গ্রামে কারও বাড়ি হাঁড়ি চড়েনি, সকলে পাত পেতেছিল জমিদারবাড়িতে। আর চলেছিল কবিগান। জমিদারবাড়ির সামনের মাঠে, মশাল জ্বেলে রাতভোর হয়েছিল কবির লড়াই। কলকেতা থেকে এসেছিলেন দাঁড়াকবি[৩] হরপ্রসাদ দাশ। বেজায় তাঁর নামডাক। তার সঙ্গে চেলাচামুণ্ডা এসেছিল অনেক, তবে হরপ্রসাদ একাই একশো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে গান বানিয়ে বসিয়ে দিলেন সবাইকে একেবারে। শিবগতি হরপ্রসাদের সঙ্গে লড়ার জন্য কাটোয়া থেকে খরচা করে দুই ভাই

ব্রজমালী-বনমালীকে এনেছিলেন, তারা কিছুক্ষণ বাদেই “ওস্তাদ আপনার সামনে দাঁড়াব তেমন ক্ষ্যামতা আমাদের নেই” বলে হরপ্রসাদকে পেন্নাম করে হার মেনেছিল।

হরপ্রসাদ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে শিবগতির দিকে ঘুরে বললেন, “জমিদারমশাই, প্রাচীনদের কাছে শুনিছি, ‘হুগলি জেলা— বর্ধমান/ পণ্ডিতে রেখেছে মান/ ঘরে ঘরে শাস্ত্রপাঠ/ মুখরিত গঙ্গাঘাট।’ অপরাধ নেবেন না, কিন্তু তেমনটি ঠিক চোখে পড়ল না। কলকেতার বাইরের কবিয়ালরা আজকাল পুরাণাদি পাঠ করে বলে বোধ হচ্চে না।” অপমানে শিবগতির মুখ তখন লাল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভূস্বামী। এই সময় ভিড় থেকে উঠে এল হরিপদ। জমিদারের সামনে আভূমি নুয়ে বলল, “আজ্ঞা হোক রাজামশায়, আমি এট্টু চেষ্টা করি গাইবার। উনি মস্ত কবি— আমি কি আর পারি? তবু যেটুক হয়।”

হরপ্রসাদ অর্বাচীন প্রতিপক্ষের গলার কণ্ঠি দেখে মুচকি হাসলেন। তিনি নিজে ঘোর শিবভক্ত। আজ এই বোষ্টমটাকে তিনি দেখিয়ে দেবেন এমনি এমনি ভূকৈলাসের রাজা হরপ্রসাদকে ‘কবিয়ালকুলচূড়ামণি’ উপাধি দেননি, এমনি এমনি কবিশ্রেষ্ঠ গোঁজলা গুঁই হরপ্রসাদকে প্রিয়তম শিষ্য বলে স্বীকার করেন না। পিছনে কাড়াদার শ্যাম বারিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বাজা, হাত খুলে বাজা।” শ্যাম বারিক বুঝল, হরকত্তা খেপেছেন। বোষ্টমটার কপালে দুঃখু আছে আজ। সে মহানন্দে কাড়ায় কাঠি দেয়।

এরপরের একপ্রহর জুড়ে শ্যাম বারিকের সঙ্গে পুরো গাঁয়ের লোক অবাক হয়ে দেখল হরপ্রসাদের সঙ্গে সমানে সমানে লড়ে যাচ্ছে হরিপদ। তার সঙ্গে বাজনদার নেই, নেই ধুয়ো তোলার দোহার— তবু তার উপর যেন দেবী সরস্বতীর ভর হয়েছে। হরপ্রসাদ পদ বেঁধে আক্রমণ করেন, মুহূর্তে তার জবাব দিয়ে, নতুন পদের হেঁয়ালি দিয়ে তাঁকে বেকায়দায় ফেলে দিচ্ছে অষ্টপুরের কবিয়াল। শেষে অধৈর্য হয়ে হরপ্রসাদ সরাসরি আক্রমণ করে বসেন প্রতিপক্ষকে—

‘শুনি ওরে হরিপদ, হরির পদে কী পেলি,
চালও নেই, চুলোর আকাল, তাঁত চালিয়ে (তুই) ম’লি।
হরের প্রসাদ আমার শিরে, রাজা কহেন রাজকবি
শিবের বরে সবই আছে, তুই আমারে কী ক’বি?’

উত্তর দেওয়ার আগে হরিপদ একমুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর দর্পী হরপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে একটি নমস্কার করে বলে—

‘হরির নামই আমার পাওয়া, আমার চাওয়া হরির পদ
রাবণ ছিল শিবের চ্যালা, কিন্তু ব্যাটা ভীষণ বদ।
তারও ছিল সবকিছুই তো, বিনাশ করল অহংকার।
হনুমানের রামের যেমন, (আমারও) হরির পদই পুরস্কার।’

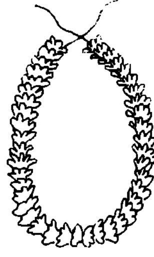
এ কথার কোনও উত্তর হরপ্রসাদ দিতে পারেননি। জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। শিবগতির মুখে উল্লাসের ছাপ। সেই ভিড়ে বিন্দুও ছিল। রঘুনাথ কবিগান পছন্দ করতেন না মোটেই। বলতেন, “ও হল শাস্ত্রের বিকৃত পরিবেশনা, ভূস্বামীদের অষ্টাবক্র রুচির কদর্য উল্লাস।” নিজেদের গ্রামে হামেশাই কবির লড়াই হলেও, বিন্দু তাই দেখেনি কখনও। কিন্তু সে-দিন রাতে তার ভালো লাগছিল খুব। হরিপদ সাধু বৈষ্ণবের শান্ত কঠিন ভঙ্গিতে যেভাবে কলকেতার কবিয়ালের অহংকার গুঁড়িয়ে দিল— বিন্দু সেটা দেখে ভিতরে ভিতরে একটা উল্লাস টের পাচ্ছিল।

সেই হরিপদ। তার গান শুনে বিন্দু থমকে গেল। শুধু কথায় নয়, হরির নামই যে তার পুরস্কার— সেটা কাজেও করে দেখিয়েছে হরিপদ। কত আসর, কত জমিদার, বাবুমশায়ের ডাক ফিরিয়ে দিয়েছে। কলকেতার ভোলা ময়রা নাকি একবার লড়তে চেয়েছিল হরিপদর সঙ্গে— বোষ্টম কবি হাতজোড় করে বলেছে, “উরিবাবা, আমি কি পারি নাকি ওস্তাদের সঙ্গে! আমি এখান থেকেই হার মানছি, তোমরা বলে দাও গে তাঁকে।” কাজকর্মেও অবশ্য আজকাল সাধুর আর মন নেই বিশেষ। হরির পদেই সে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিচ্ছে ক্রমে। হরিনাম করেই হরিপদর সারাদিন কাটে, তাঁতে আজকাল আর তেমন হাত পড়ে না।

হরিপদর মিষ্টি গলার গান শুনতে শুনতে কতক্ষণ কেটে গিয়েছে। রোদ উঠে চড়চড় করতে বিন্দুর খেয়াল হল। আর না দাঁড়িয়ে সে হাঁটা দিল, গন্তব্য ফাঁসুড়ে বট।

---

৩. আসরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান করতেন বলে কবিয়ালদের এই নামেও ডাকা হত।



ছয়

বেশ রোদ উঠে গেছে এতক্ষণে। পাড়ের দিকে কতকগুলো ঝুরি নেমেছে আদ্যিকালের, সেগুলো বেয়ে বেয়ে বিন্দু বটগাছটার উপর তরতর করে উঠে গেল। আসার সময় কয়েকটা পেয়ারা আর গাব পেড়ে নিয়ে এসেছে কোঁচড়ে বেঁধে। সেগুলো মজা করে খাবে এখন। একটা মোটা ডালের উপর বেশ আরাম করে গুছিয়ে বসল বিন্দু। মাথার উপরে ঘন পাতার ঝাঁক আড়াল করে রেখেছে ডালটা, রোদ আসে না— বেশ ঠান্ডা, এই বসার জায়গাটা বিন্দুর ভারী পছন্দের। সামনে তাকিয়ে দেখা যায় গঙ্গা দিয়ে অনেক নৌকো চলেছে আজ। গয়নার নৌকো, জেলে ডিঙি তো আছেই। একখানা ভারী জাঁকের বজরাও চলেছে আজ কলকেতার দিকে।

এই গাঙ ধরে কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে যাওয়া যায়— বিন্দু ভাবে, একদিকে গেলে কলকেতা— আর উল্টোবাগে চলতে থাকলে কাশীধাম। একদিন সেও যাবে এমন নৌকো করে, গাঙের পাড় ধরে, গ্রাম থেকে গ্রামে, তালুক পেরিয়ে অনেক অনেক দূর। কিন্তু সে কি বাপের মতো শাস্তরপাঠ-কথকতা করবে? নাকি কবিয়াল হবে— হরিপদ সাধুর মতো? কথকতায় প্রাণটা ভরে ওঠে বটে কিন্তু কবিগানের তরজায় একটা ফুর্তি আছে, নেশার মতো। গা গরম হয়ে ওঠে, হাততালি আর দুয়োর শব্দে ভিতরটা আনচান করে— ফুটতে থাকে।

গাবের খোসাগুলো কামড়ে কামড়ে থু-থু করে ফেলে দেয় বিন্দু, তারপর ঠিক করে সে কথকঠাকরুণও হবে আবার কবিয়ালও হবে। কিন্তু সে তো পড়তে-লিখতে পারে না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা মানে নরকের রাস্তা তৈরি করে রাখা, এ কথা সে জ্ঞান হয়ে ইস্তক শুনে আসছে। রঘুনাথ যে রঘুনাথ, তিনিও মেয়ের অক্ষর পরিচয় করাননি। কিন্তু বিন্দু শিখে নেবে একদিন ঠিক। হরিপদর কাছে গিয়ে নাড়া বাঁধবে। বোষ্টম তাঁতির কাছে বামুনের মেয়ে নাড়া বাঁধলে যোগমায়ার মুখের ভাবটা কেমন হবে সেইটে কল্পনা করে বিন্দু ফের একবার খিলখিল করে হেসে ওঠে।

আনমনা হয়ে ভাবতে ভাবতে, নিজের সঙ্গে কথা কইতে কইতে কখন সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে— জানে না বিন্দু। মুখ চালাতে চালাতে সঙ্গের ফলপাকুড়ও শেষ হয়ে এসেছে। বিন্দু চারদিকে তাকিয়ে দেখে সন্ধে হব-হব করছে। গাছের ডালে পাতার অন্ধকারে বসে সে এতক্ষণ টের পায়নি। বজরাখানা মাঝগাঙে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল, তার ছাদে উঠে দু'জন রংদার জোব্বা পরা মুসলমান নমাজ পড়তে শুরু করল। কোনও নবাব-বাদশা হবে, বিন্দু ভাবে— আগে তো এই বাংলাতেও নবাবের হুকুম চলত। কোন নবাব, কী বৃত্তান্ত অতশত জানে না সে। শুনেছেই শুধু। আচ্ছা নবাবরা কি কবিগানের আসর ডাকেন?

বিন্দুর চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল একটা রিনরিনে ভয়ার্ত গলার আওয়াজে। "বিনু দিদি, বি-বি-বিনু দিদিইই...,"— বিন্দু নীচে তাকিয়ে দেখে উমাশশী। ভয়ানক হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। বোঝাই যাচ্ছে অনেকটা পথ না থেমে দৌড়োতে দৌড়োতে এসেছে। বিন্দু তাড়াহুড়ো করে গাছ থেকে নেমে পড়ে। উমাশশীর সামনে এসে বলে, "কী লো সই, তোর ঠাকমা আজকে যে বড়ো ছেড়ে দিয়েছে তোকে ভর সন্ধেবেলা?" বিন্দুর কথার উত্তর না দিয়ে উমাশশী হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, "বিনু দিদি, শিগগির চল ভাই।" তার ভাবভঙ্গি দেখে বিন্দুও ভয় খেয়ে গেল এইবার। উমাশশীর দুই কাঁধে হাত দিয়ে জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে বলে, "আমার মাথা খাস, কী হয়েছে বল আমায়।"

উমাশশী এইবার ভ্যাঁ করে কেঁদে দিয়ে বলল, "বিলুদিদিকে নিয়ে যাচ্চে।"

"দিদিকে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কে নিয়ে যাচ্ছে।"

"তুই চল ভাই। তোর জা-জামাইঠাকুর মরে গ্যাচে স-সকালবেলা। অনেক লোক এসেচে। আ-আমার খুব ভ-ভয় করছে। তুই চল।"

বিন্দু দৌড়োতে শুরু করে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। আদাড়-বাদাড় ভেঙে, বিছুটি ঝোপ মাড়িয়ে, দু'-তিনবার হোঁচট খেয়ে গোড়ালির নুনছাল তুলে সে যখন

বাঁড়ুজ্যেবাড়ির সামনে পৌঁছোল, সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। বাড়ির সামনে অগুনতি লোক। হাতে হাতে জ্বলন্ত মশাল অনেকের। সেই আলোয় জমিদারবাবুর পালকিটা দেখতে পেল বিন্দু। ঠেলেঠুলে দুয়োর দিয়ে উঠোনে ঢুকে সে যা দেখল তাতে তার বুক হিম হয়ে গেল একপলকে।

উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা বাঁশের চালায় ব্রজমাধবের দেহ। সে দেহে যে প্রাণ নেই বুঝতে কোনও অসুবিধাই হয় না। উঠোনের চারদিক ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। এক কোণায় দাঁড়িয়ে হরিমাধব আর নীলমাধব। জমিদার মশাই ঠিক ওদের সামনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কীসব বলছেন। ইতিউতি বামুনপাড়ার আরও বেশ কয়েকজন মাথা দাঁড়িয়ে আছেন। মৃতদেহের পাশে একটা ডুলি। লাল কাপড় আর জরি দিয়ে সাজানো হয়েছে সেটাকে, যেন নতুন বউয়ের ডুলি। মৃতদেহের আর-একদিকে মাটিতে বসে আছে বিলু। বসে নয় ঠিক, এলিয়ে আছে। বিলুকে ঘিরে বামুনপাড়ার মেয়ের ভিড়।

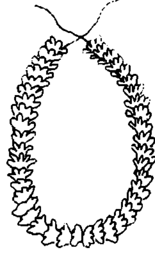
বিন্দু অবাক হয়ে দেখে বিলুর পরণে লাল চেলির জোড়। এই শাড়িতেই দিদির বিয়ে হয়েছিল না? তার আবছা আবছা মনে পড়ে, কিন্তু বিয়ের রাতের মতো গয়না নেই বিলুর গায়ে। মাথা ভর্তি সিঁদুর লেপা, পায়ে আলতা। বউ-ঝি-রা এসে হুড়োহুড়ি করে বিলুর মাথায় সিঁদুর দিচ্ছে, তালপাত আর সাদা থান এনে ছাপ নিচ্ছে আলতাপায়ের। কী আশ্চর্য, বিলু মরার মতোই ঝিমিয়ে আছে প্রায়। মুখে কোনও কথা নেই, চোখ আধবোজা, শুধু সেই চোখ দিয়ে অঝোরে গড়িয়ে যাচ্ছে জল।

"দিদি, দিদি রে।" বিন্দু মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার আচ্ছন্ন বিলুর কানে ঢোকে বুঝি, একটু নড়েচড়ে উঠে সে সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করে, ঘাড় ঘোরাতে চায় সেই ডাকের অভিমুখে। ততক্ষণে যোগমায়া খেয়াল করেছে বিন্দুকে। দ্রুতপদে এসে খপ করে বিন্দুর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে কোণের সেই ঘরখানায়। বিন্দু প্রাণপণ চ্যাঁচাচ্ছে, "ছেড়ে দাও আমায়, দিদির কী হয়েছে? দিদিকে ছেড়ে দাও। ওগো তোমার দু'টি পায়ে পড়ি আমাদের ছেড়ে দাও।" যোগমায়া দাঁত কিড়মিড় করল, "অলক্ষ্মী কি আর সাধে বলেছি? সতীর কৃপায় আমাদের চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে— এখন এই ধিঙ্গিঠাকরুণ এয়েচেন বাগড়া দিতে।" হিঁচড়ে বিন্দুকে টেনে ঘরের মধ্যে এনে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে যোগমায়া হাঁফ ছাড়ল।

শিবগতি চুপ করে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন। এবার গলা খাঁকরিয়ে তিনি বললেন, "বাপু নীলমাধব, এবার যাওয়া যাক, কালক্ষয়ে লাভ কী?" বাড়ির বাইরে একদল ঢাকি দাঁড়িয়েছিল, নীলমাধবের ইঙ্গিত পেয়ে তারা বাজাতে শুরু করল প্রচণ্ড

রবে। ঢাকের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ভিড় আকাশ ফাটিয়ে ধ্বনি দিতে শুরু করেছে, "জয়, সতী মায়ের জয়!" সেই আওয়াজে ঘরে বন্ধ বিন্দুর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। মেয়েরা ধরাধরি করে বিলুকে ডুলিতে বসিয়ে দিল, এবার সতী মায়ের যাত্রা শুরু হবে। ঠিক এই সময় বোধহয় এক মুহূর্তের জন্য বিলুর জ্ঞান ফিরেছিল। সে কান্নামাখা তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আর্তনাদ করে উঠল, "ও বিন্দু, আমাকে যে নিয়ে যাচ্ছে, ওরে বিন্দু, বোন রে আমার, ও বিন্দুউউউ...!"

ঢাকের প্রবল আওয়াজ— ভিড়ের বিপুল জয়ধ্বনি ছাপিয়ে বিলুর সেই আর্তনাদ শ্রাবণসন্ধ্যার আকাশ চিরে দিল। বিন্দু ঘরের ভিতর উন্মত্তের মতো দরজা ধাক্কাচ্ছে। যোগমায়া শিউরে উঠে দুই কানে হাত চাপা দিয়ে রামনাম উচ্চারণ করল। মরণাপন্ন সেই ডাক ছেড়ে বিলু ফের নেতিয়ে পড়েছে। নীলমাধবের ইঙ্গিতে দু'জন ডুলির সঙ্গে বিলুর পা কষে বেঁধে দিল নারকোলের দড়ি দিয়ে। তারপর বাঁশের চালায় ব্রজমাধবের মৃতদেহ আর ডুলিতে বিলুকে নিয়ে পুরো গ্রাম চলল ঘাটের দিকে। পিছনে পড়ে রইল শুধু বিন্দু। আটবছর আগের এক দিনে বিলু স্বামীর সঙ্গে অষ্টপুরের নৌকোর ঘাটে এসে নেমেছিল। আজ সে স্বামীর সঙ্গে আবার যাচ্ছে, তবে এবার শ্মশানঘাটে।



সাত

বর্ষার ভরা গাঙে নৌকো চলেছে তরতর করে। কলকেতা যেতে ছয়-সাতদিন লাগে ছয়দাঁড়ির নৌকোতে। কিছু বেশি পয়সা কবুল করে পাঁচ দিনে পৌঁছে দেওয়ার কড়ার হয়েছে। দাঁড়িগুলো খালি গায়ে মাথায় গামছা বেঁধে প্রাণপণে নৌকো বাইছে। চড়া রোদ এসে বিঁধছে তাদের ঘামে ভেজা পিঠে। বৈঠার এক-একটা ঘা দিচ্ছে গাঙের বুকে আর গলার শির ফুলিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে— হেঁইও হো।

বিন্দু স্বপ্ন দেখেছিল— এমনি করে নৌকো চেপে সে দেশ দেশান্তরে ঘুরবে তার কথকতার পসরা নিয়ে, কবিগানের আখড়ায় আখড়ায় যাবে, দুই চোখ মেলে দেখবে নদীর দুই ধারের মানুষজন, ঘরবাড়ি, জলের উপর নুয়ে পড়া গাছের ছায়া। কিন্তু এখন এই নৌকোর ছইয়ের মধ্যে এক কোণে গিয়ে সেই যে বসেছে দুইদিন ধরে, বসেই আছে।

সে-দিন অনেক রাতে এসে যোগমায়া এসে যখন দরজার শিকল খুলে দিল— দেখা গেল বিন্দুর কান্না থেমে গেছে। অন্ধকার ঘরে পাথরের মতো বসে আছে মেয়েটা। সেই রাতে তো বটেই, তার পর আর মুখে কুটোটি কাটেনি হতভাগী। যোগমায়া দু'-একদিন সাধতে গিয়েছিল ভাত নিয়ে, বিন্দু সাড়া দেয়নি— শূন্যদৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে মেজোগিন্নির মুখের দিকে। শেষে বিরক্ত হয়ে যোগমায়া হাল

ছেড়ে দিয়েছে। "মরগে যা আবাগির বেটি, ভালো করতে এসেছিলুম— তা মনে ধরল না মহারানির," বিড়বিড় করতে করতে চলে যান যোগমায়া। বিন্দু খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকে দাওয়ায়। ধুমধাম করে বাপের শ্রাদ্ধ করবে নীলমাধব। তারই জোগাড়যন্তর চলছে অবিরাম। জমিদার শিবগতি এসে দেখে গেছেন কয়েকবার। তাঁর উৎসাহটা কিছু বেশিই দেখা যাচ্ছে।

দাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে বিন্দুর চোখের সামনে দিয়ে সুয্যিঠাকুর পুরো একখান পাক খেয়ে পুব থেকে পশ্চিমে ঢলেন, মুনিষ-মজদুর, চাষিবাসীরা কাজ শেষ করে ঘরে ফেরে। একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে ঘরের ভিতর যায় বিন্দু। পিদ্দিম জ্বালে। ঘরখানা অগোছালো হয়েই পড়ে আছে। শেষবার গুছিয়েছিল বিলু। বিন্দু একবার ঘরের চার দিকে তাকাল— অগোছালো ঘরখানির সবখানেই ছড়িয়ে রয়েছে তার হতভাগিনী দিদির হাতের ছাপ। বোকাসোকা ভিতুগোছের বিলু সবেতেই বড্ড ভয় পেত। সে-দিন না জানি কত ভয় পেয়েছে, কত কষ্ট হয়েছে দিদিটার! চোখ উপচে জল আসছিল বিন্দুর, এমন সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল সে।

উমাশশী। মুখে একগাল হাসি, পিছনের দুয়োর দিয়ে কোন ফাঁকে সবার চোখ এড়িয়ে চলে এসেছে। ঘরের ভিতর ঢুকে বসল জুত করে, কোঁচড়ে করে এনেছে অনেকটা মুড়ি আর তিলের নাড়ু কতকগুলো। লাল বাতাসাও এনেছে মনে করে। বিন্দু ভালোবাসে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে হাসে বিন্দু, এই মেয়েটাও তার আর জন্মের বোন ছিল বুঝি। উমাশশীর কোঁচড় থেকে নিয়ে মুড়ি খায় বিন্দু। দু'জনেই একটু চুপচাপ আজকে।

উমাশশী জিজ্ঞেস করে, "বি-বিনুদিদি, আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবি?" মোক্ষদার মুখ মনে করে বিন্দু মলিন হাসে, বলে, "আমি এই গাঁয়েই আর থাকব না রে সই, অনেক দূরে চলে যাব। কবিগান গাইব, কথকতা করব, অনেক দেশ ঘুরব।" উমাশশী চিন্তিত মুখে বলে, "আ-আমি তো দেখতে পাব না সই।" বিন্দু বলে, "তা কেন, তোর বিয়ে হবে, বরের ঘর যাবি— আমি সেখানে গিয়ে তোদের গেয়ে শোনাব। আমার সই আমার গান শুনবে না, এমনটাও কি হয়?" বিয়ের কথায় উমাশশী একটু লজ্জা পায়, মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলে, "ধেৎ!"

বিধাতাপুরুষ বোধকরি সে-দিন বিন্দুর মনোগত ইচ্ছাটি শুনে ফেলেছিলেন। নইলে এত তাড়াতাড়ি বিন্দুকে অষ্টপুর ছাড়তে হবে কেন? কয়েকদিন ধরেই বাঁড়ুজ্যেবাড়িতে শুরু হয়েছে ধর্মদাস পালের আনাগোনা। ধর্মদাস পাল কুমোরের ছেলে হলেও পৈতৃক

ব্যবসায়ে তার মন ছিল না। সমস্তদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোতেই ছিল তার যত উৎসাহ। বেদম ঠ্যাঙানি খেয়েও যখন সে শুধরোল না, বাপ কৃষ্ণদাস ছোঁড়াকে দিল অর্ধচন্দ্র। ধর্মদাস অবিশ্যি সে-দিনই একটা মহাজনি নৌকোয় উঠে কলকেতার দিকে রওনা দেয়।

পনেরো বচ্ছর পরে সে যখন ফিরল তখন তার ভোল পাল্টে গিয়েছে একদম। গায়ে দামি শহুরে আচকান, কাঁধে শান্তিপুরি চাদর, পরণে কালনার ফিনফিনে ধুতি— ধর্মদাস গাঁয়ে ফিরল একেবারে কেউকেটা হয়ে। কৃষ্ণদাস তো ভয়ের চোটে ছেলেকে আপনি-আজ্ঞে-ই করতে শুরু করেছিল। ধর্মদাস নাকি বাপকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করে তারপর এক থলে টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, "ঘরখানা সারিয়ে-সুরিয়ে দোতলা করে ফ্যালো দিকি। আর আজ থেকে ব্যবসা বন্ধ— ছোটোলোকের মতো রোদে জলে আর চাক ঘুরুতে হবে না তোমায়।" গাঁ-ঘরে এসব কথা আগুনের মতো ছড়ায়। পালপাড়ার লোকেরা তো বটেই, অবস্থাপন্ন বামুন-কায়েতরাও ধর্মদাসকে দেখে সমীহ করে কথা বলতে শুরু করে তারপর থেকে।

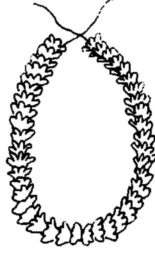
সেও হয়ে গেল দু'-তিন বচ্ছর। ধর্মদাস এখন কলকেতাতেই থাকে, মাঝে মাঝে একমাস করে এসে থেকে যায় গাঁয়ে। পয়সা যে তার ক্রমাগতই বাড়ছে সেটা আজকাল দিব্য বোঝা যায়। গেল-বর্ষায় চণ্ডীমণ্ডপের চালা বসে পড়ল একদিন ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে, ধর্মদাস নিজের পয়সা খরচ করে চণ্ডীমণ্ডপ ফের খাড়া করিয়ে দিল নতুনের মতো। ধর্মকর্মেও তার বেজায় উৎসাহ। এই ব্রজমাধব বাঁড়ুজ্যের তৃতীয় পক্ষ যখন সতী হল, তার পরে সে একশো ব্রাহ্মণ ভোজনের পয়সা দিয়েছে যাতে গাঁয়ের পুণ্যের ঘড়াটা ঠিকঠাক ভর্তি হয়। দুর্জনে অবশ্য নিন্দামন্দ করেই থাকে, ধর্মদাসের পয়সাকড়ি নাকি সবটাই খুব সৎপথে আসে না। কিন্তু তা বললে কী হবে, দেবদ্বিজে এত ভক্তি যার, তার পয়সায় কলঙ্কের দাগ থাকাটা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার— সেটা সমাজপতিরা একবাক্যে মেনে থাকেন।

এহেন ধর্মদাস ব্রজমাধবের শ্রাদ্ধকর্মের ঠিক আগে আগে বাঁড়ুজ্যেবাড়িতে যখন যাতায়াত করতে শুরু করল, সেটা অনেকের কাছেই বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও, বিশেষ উচ্চবাচ্য কেউ করেনি। একদিন সন্ধের সময় জনান্তিকে ধর্মদাস যখন নীলমাধবের হাতে একটা গেঁজেতে মুরশিদাবাদি টাঁকশালের দুশোটি টাকা গুঁজে দিল, সেটাও অবশ্য কারও চোখে পড়েনি। আবার সেইদিনই একটু বেশি রাতের দিকে যোগমায়া যখন বিন্দুকে ডেকে বেশ হাসিমুখেই বলল, "ওরে বিন্দু শোন, তোর একটা হিল্লে হয়ে

গেল। আজ রাত্তিরেই জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে রাখবি। তোর ধর্মদাসকাকা তোকে কলকেতায় নিয়ে যাবে। সেখেনে তোর মাসি থাকে রে ছুঁড়ি, তুই সেইখেনে থাকবি এখন থেকে।”

ওয়াকিবহাল কেউ যদি সেখানে থাকত তা হলে প্রশ্ন তুলতেই পারত, বিলু-বিন্দুর মা অন্নপূর্ণা ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর অন্য কোনও তুতো-বোন আছে বলেও জানা যায় না। সেখানে বিন্দুর এই নতুন মাসিটি কোথা থেকে এলেন এবং এতদিন-ই বা কোথায় ছিলেন! কিন্তু কেউ সেখানে ছিলও না, প্রশ্নগুলোও তাই ওঠেনি। আর বিন্দু? বিন্দুকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল না ইহজগতের কোনও বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে। শূন্যদৃষ্টিতে সে যোগমায়ার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ে, তারপর ফিরে যায় নিজের ঘরে। যোগমায়া অবিশ্যি চুপিসারে বিন্দুর পিছন পিছন গিয়ে ঘরের বাইরের শিকলটা তুলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

পরের দিন দুপুরবেলা বিন্দু বেশ শান্তভাবেই নৌকায় গিয়ে উঠল। দু’-একখানি পরনের কাপড়, হাতে পরার দু’খানি রুপোর বালা আর একখানি কাঁকই। এই তার পার্থিব সম্পত্তি। নৌকো যখন ছেড়ে দিল, গঙ্গার ধারে তাকে বিদায় জানাতে একটি প্রাণীও নেই, রিক্ত আকাশের নীচে শুধু ফাঁসুড়ে বটের গাছখানি দাঁড়িয়ে রয়েছে একা।



আট

কলকেতার ঘাটে যখন এসে লাগল নৌকো তখন শেষ বিকেল। ধর্মদাসের হাঁকে বিন্দু ছইয়ের ভিতর থেকে মুখ বাড়াল। এই কয়দিন ছইয়ের আড়ালেই কেটে গেছে তার। কোথায় চলেছে, কার কাছে চলেছে— এইসব প্রশ্নগুলো মাঝেমধ্যে মাথায় এসেছে, কিন্তু সেগুলোকে জোর করে তাড়িয়েছে মেয়েটা। ধর্মদাস মাঝেমধ্যে আসত দুটো মিঠে কথা বলে ভাব জমাতে। বিন্দু হুঁ-হাঁ করে কাটিয়েছে সে-সব। ধর্মদাসের পয়সা আছে। ছয়দাঁড়ির নৌকো কিছু না হোক দেড়টাকা রোজ। কলকেতা আসার জন্য সাত-আট টাকা খরচ করবে এমন ট্যাকের জোর কয়জনের আছে। তবে লোকটার নজর যেন কেমনধারা। অদ্ভুতভাবে তাকায় বিন্দুর দিকে। বিন্দুর তো নয়, বিন্দুর গায়ের দিকে। কী যেন মাপছে। মাপছে আর ভাবছে। বিন্দু জড়োসড়ো হয়ে গায়ের কাপড়টা ভালো করে জড়িয়ে বসলেও তার হুঁশ হত না, তাকিয়েই থাকত।

নৌকো এসে যেখানটায় থেমেছে সেটা ভাঙাচোরা একটা ঘাট। রানা ভেঙেচুরে গেছে, পাড় বাঁধানো ছিল এককালে— এখন তার মধ্যে দিয়ে অশ্বত্থের শিকড় চারিয়েছে। সেই ভেঙেপড়া পাড়ের ধারেই কয়েকজন স্নান করছে। খালিগায়ে পৈতে দেখে বোঝা যাচ্ছে ওরা বামুন। বুক-জলে দাঁড়িয়ে কেউ চোখ বন্ধ করে মন্তর বলছে। ঘাটের অন্যপাশে কয়েকজন মানুষ বসে বসে বেশ জোরে জোরে হাত-পা ঘষে সাফ

করছে। ধুলোয় ঢাকা তাদের শরীর, মুখ-মাথা চকচক করছে ঘামে— বোঝাই যায় ওরা মুনিষ গোত্রের। ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে বড়ো চাতাল— থাম দিয়ে পাকা ছাদ ঢালাই করা। বিন্দু পোঁটলা কাঁখে হাঁ করে দেখছিল। তার মুগ্ধতা ভাঙল ঘাট থেকে রাস্তায় পা রেখে।

থিকথিক করছে কাদা। সেই কাদার মধ্যেই রাস্তার দু'পাশে মানুষজন বসে আছে চাটাই বিছিয়ে। কত লোক, আজ কি কোনও মোচ্ছব রয়েছে নাকি! কোথাও কেউ লোকের কপালে তিলক কেটে দিচ্ছে, দু'-একজন গণতকার হাত দেখছে পথচলতি লোকের। অনেক সাধু-সন্ন্যিসী। তাদের পরণে লাল-গেরুয়া কাপড়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তাদের কেউ কেউ চিমটে বাজিয়ে মাঝে মাঝেই 'ব্যোম শংকর', 'জয়তারা' বলে এমন আওয়াজ করছে— পিলে চমকে যায়।

আর আছে ভিখিরি। এমন মারকুটে ভিখিরি বিন্দু বাপের জন্মে দেখেনি। তারা ছেঁকে ধরছে পথচলতি লোকেদের— হাত ধরে টানাটানি করছে। একজন কুষ্ঠরোগী গায়ের শতচ্ছিন্ন ফতুয়াটি তুলে তুলে ঘা দেখিয়ে দেখিয়ে পয়সা চাইছে। একটা কুঁজো বুড়ি এসে বিন্দুর হাত ধরে টানতে শুরু করল। "ও দিদি, একটা পয়সা দিয়ে যা, ও দিদি, তোর রাজপাট হবে— সোনার সোয়ামি সংসার হবে একটা পয়সা দিয়ে যা," খোনা গলায় বুড়িটা বলে যাচ্ছে। বিন্দু ভয় পেয়ে যায় একটু। ধর্মদাস খানিক এগিয়ে গিয়েছিল। বিন্দুকে পাশে না দেখে ফিরে এল, এসে দেখে এই ব্যাপার। 'হুট্ হুট্' করে বুড়িকে তাড়াতে চেষ্টা করলেও সে যাবে না, পা চেপে ধরেছে বিন্দুর। ধর্মদাস দুটো তামার পয়সা ফেলে দিল বুড়ির সামনে, মুখে বলল, "ছাড় এখন, ওই পয়সা নে গে যা। যত্ত আপদ।"

পয়সা দেখে বুড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ল। পয়সা দুটো পাশের ভিখিরিদের চোখেও পড়েছে। দু'জন এসে বুড়ির সঙ্গে ঝামেলা শুরু করল। তাদের একজন আবার মেয়েমানুষ, কাঁখে একটা রুগ্ন শিশু মড়ার মতো ঝিমিয়ে আছে। রাস্তার মাঝে তিনজনে হাতাহাতি করছে, এমন সময় ঝড়ের বেগে রাস্তার বাঁক ঘুরে চারটে ঘোড়া এসে পড়ল সেই জায়গাটায়। শুধু ঘোড়াই নয়— ঘোড়াগুলো একখানি বড়ো চারচাকার গাড়ির সঙ্গে জোতা। বিন্দু ঘোড়া দেখেছে, শিবগতির আস্তাবলেই দু'-তিনটে বড়ো ঘোড়া ছিল। কিন্তু এমন গাড়ি সে আগে কখনও দেখেনি। ঘোড়াগুলো প্রচণ্ড জোরে ছুটছিল গাড়ির সামনে বসে থাকা কোচোয়ানের চাবুক খেয়ে, বাঁক ঘোরার সময় সামলাতে পারেনি। আর-একটু হলেই বিন্দু পিছনের বড়ো চাকার ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ত।

ধর্মদাস অভিজ্ঞ মানুষ, সে বিন্দুর হাত টেনে ঠিক সময়ে সরিয়ে নিয়েছিল। ধর্মদাসের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বিন্দু। ধর্মদাসের একটা হাত তাকে ধরে রেখেছে, আর-একটা হাত তার পিঠে খেলে বেড়াচ্ছে সাপের মতো। ঘোর অস্বস্তিভরে বিন্দু নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। গায়ের কাপড় ঠিক করতে করতে রাস্তার ধারে চোখ পড়ে তার আর আতঙ্কে সে কাঠ হয়ে যায়।

গাড়িটা বিন্দুকে ধাক্কা না মারলেও, ধাক্কা মেরেছে একজনকে। বাচ্চা কাঁখে সেই ভিখিরি মেয়েটা ধাক্কা খেয়ে পড়েছে রাস্তার পাশে মুখ থুবড়ে। বাচ্চাটা ছিটকে গেছে একধারে। সন্ধে হবে একটু পরেই। আকাশ লাল এখন। সেই লাল আকাশের তলায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নিথর বাচ্চাটার মাথা থেকে আরও গাঢ় লাল রঙের রক্ত বেরিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। কোচোয়ান হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়েছে ঘোড়াগুলোকে। গাড়ি থেমে গেছে। বিন্দু দেখল খোলা জানালা দিয়ে একটা ফ্যাকাশে ফরসা মুখ বেরিয়ে এসেছে। সেই মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

সাহেব আগেও দেখেছে বিন্দু। মণিরামপুরের নীলকুঠির সাহেবরা শিবগতির নিমন্ত্রণে প্রতিবছর শীতকালে অষ্টপুরে আসত। সকালবেলা নদীর চড়ায় খুব পাখি শিকার করে-টরে রাতের বেলা জমিদারবাড়িতে হত এন্তার খানাপিনা। তাই সাহেব দেখে সে চমকাল না। কিন্তু তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে বাচ্চাটার দিকে চেয়ে। বাচ্চাটার মায়ের চোট লাগেনি। তড়িঘড়ি করে সে বাচ্চাটার কাছে গিয়ে কচি দেহটা তুলে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। গলা থেকে বিকৃত ভাঙা স্বরে একটা ঘড়ঘড়ে আর্তনাদ বেরোচ্ছে, “বাবুয়া, ধন, মানিক আমার!”

গাড়ির জানালার ভিতর দিয়ে এবার একটা হাত বেরিয়ে এল। সেই হাতে অদ্ভুত রকমের জামার হাতা। বিন্দু এমন জামা কখনও দেখেনি। নীলকুঠির সায়েবদের গায়েও না। মোটা লাল বনাত কাপড়ের জামা। কবজির কাছে হলদে গোল ডোরা আর পেতলের বোতাম। হাতের মুঠি খুলে সাহেব রাস্তার উপর ছুড়ে দিল গোল চকচকে কতকগুলো রুপোর টাকা। আবার ভিখিরিরা ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তার উপর। বিন্দু স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখল বাচ্চার নিথর দেহ বুকে জড়িয়ে মা-টি ফের হাতড়াচ্ছে রাস্তার মধ্যিখানে এসে— যদি একটা টাকাও পাওয়া যায়।

ধর্মদাস বিন্দুর হাত ধরে টানে, “চল রে ছুঁড়ি, মেলা দেরি হয়ে গেল। যত্ত অনাছিষ্টি।” তারপর বিন্দুর মুখের ভাব লক্ষ করে বলে, “ভয় পেয়েছিস? এ তো হরবখত হচ্ছে এখানে। হুঁ-হুঁ বাবা কলকেতা শহর এটা— এখেনে মশার চেয়ে মানুষ বেশি।” মুখ

বেঁকিয়ে হাসে একটু ধর্মদাস, "ভিখিরির বাচ্চা অমন কত মরছে হামেশা, বেটির বরাত ভালো— আস্ত আস্ত টাকা পেয়ে গেল সায়েবের কাছ থেকে।" বিন্দু নিশ্চুপ। ধর্মদাস তার মুখের দিকে তাকায় তারপর একটু হেঁকে বলে, "চল চল, এখেনে দাঁইড়ে দাঁইড়ে দেয়ালা করতে হবেনি। তোর মাসি ওদিকে দেরি দেখে মুচ্ছো না যায়।" শেষ কথাটা বলতে বলতে ধর্মদাসের মুখে একটা মৃদু হাসি খেলে গেল।

বিন্দু চুপচাপ ধর্মদাসের পিছন পিছন হাঁটে। ধর্মদাসের হাঁটা দেখে বোঝা যায় এসব রাস্তা তার খুবই চেনা। ঘাট থেকে বেরিয়ে খানিক গেলে রাস্তার ধারে কেবল পাকা বাড়ির সার। এত পাকা বাড়িতে কারা থাকে? গোটা অষ্টপুর গাঁয়ে পাকা বাড়ি মাত্র দু'খানি। জমিদারবাড়ি আর উমাশশীর বাপ রাজবল্লভ ঘোষালের বাড়ি। কলকেতায় তা হলে যত ভিখিরি তত বড়োলোক। বেশ অনেকটা বড়ো রাস্তা ধরে হাঁটার পর ধর্মদাস সাঁৎ করে একখানি গলির ভেতর ঢুকল। পিছন পিছন বিন্দুও। অন্ধকার হয়ে এসেছে। গলির ভিতর ঢুকতেই বিন্দুর নাকে একটা কড়া পাঁচমেশালি গন্ধ এসে ধাক্কা মারল। ভাজাভুজি আর পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধের সঙ্গে নোংরা পচা জঞ্জালের গন্ধ মিশে গেছে। অন্ধকার হয়ে এলেও গলির ভিতরটা বেশ আলো। দু'ধারে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। একতলা পাকাঘর অনেক। মাঝে মাঝে দু'-একটা দোতলা বড়ো বাড়ি। এপাশ-ওপাশে মাটির আর খোলার চালের ঘরও কয়েকখানা। ঘরের সামনে বারান্দায় আলো জ্বলছে সবক'টারই। আর সেই বারান্দায় বিচিত্র সব মানুষ। মেয়েমানুষই বেশি। তাদের মুখ সেজবাতি আর কুপির আলোয় চকচক করছে। মুখে রং মাখা। পরনের কাপড় ভারী রংদার সবার।

কেউ বারান্দায় কাঠের চৌকিতে বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। দু'-একজন রাস্তায় নেমে পড়ে হাতছানি দিয়ে পথচলতি লোক ডাকছে। একটা মেয়ে অল্পবয়সি একটি ছোকরার হাত চেপে ধরেছে, ছেলেটা হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে কিন্তু মেয়েটা যেতে দেবে না— গালে ঠোনা মেরে বলছে, "বলি ও নাগর, রসের হাঁড়ি চাকতে এয়েচ? রস তুলতে ডাবুহাতা লাগে যে, এনেচ? দেকি দেকি কেমন তোমার ডাবুহাতা?" সে-ছোকরা কোনওরকমে শেষে হাত ছাড়িয়ে পালাল। বাড়ির সামনে কাঁচা নর্দমা। সেই নর্দমার ধারেই গুচ্ছের দোকানি পসরা সাজিয়ে বসেছে। "ইলিশ মাছ ভাজা, আলুর দম, হাঁসের ডিমসেদ্দ নিন!" বলে তুমুল ডাকাডাকি করছে তারা।

ধর্মদাস বিন্দুর হাত ধরে টেনে একটা দোতলা বাড়ির সামনে নিয়ে এল। বাড়ির বারান্দায় দু'টি যুবতী মেয়েমানুষ সাজগোজ করে, খোঁপায় মালা পরে, রাস্তার দিকে

তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজন ধর্মদাসকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলল, "ওরে দ্যাক সে কে এয়েচে। পালের পো পাল এয়েচে। তা বলি ও পাল মশায়, এতদিন কি বেন্দাবন ছেড়ি থাকতি হয়? কোন মথুরায় গেসলে গো? কাদের সব্বোনাশ করে এসেচ এবার?"

ধর্মদাস বিরক্তমুখে ধমকে উঠল, "য্যা য্যা, মেলা গোল করিসনি। খদ্দের জোটেনি বুঝি আজ? মাসি কোথায়, মাসি?" অন্যজন এবার এগিয়ে এসে বলে, "আহা তেতেপুড়ে এয়েচে আমাদের পালমশায়। অমন করে কইতে আচে? পালমশায় না থাকলে আমাদের কী হত বল দিকিনি বিধু।" প্রথম মেয়েটি বিধু অর্থাৎ বিধুমুখী, সে মলিন হাসি হেসে জবাব দিল, "তা কথাটা তুই মন্দ বলিসনি ভাই। পাল মশায় না থাকলে বেওয়া হয়ে একাদশী করতুম, রোজ এমন ফুলশয্যেই বা হত কী করে?" বলতে বলতেই বিধুমুখীর চোখ পড়ে পিছনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিন্দুর দিকে। এবার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে সে বলে, "তাই বলো গো পালমশায়, ছিপ ফেলতে গিয়েচিলে? কেমন মাছ উটল দেখি। এই ছুঁড়ি ইদিকে আয়।" শেষের কথাটা অবশ্য বিন্দুর দিকে তাকিয়ে বলা। ধর্মদাস বাধা দেয়, "ন্যাকরা রাখ তোরা।" বিন্দুর হাত ধরে তারপর একটা টান মারে, "চল। ভিতরে চল, মাসি এতক্ষণে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়েছে বোধহয়।"

বিন্দু বিনাবাক্যব্যয়ে ধর্মদাসের পিছু নেয়। বাড়ির ভিতর দু'দিকে সার দিয়ে ঘর। তাদের সামনে চট আর চিকের পরদা। মাঝে মাঝেই একটা-দুটো করে লোক এসে ঢুকে পড়ছে সেই ঘরগুলোয়। কেউ একা, কেউ জোড়ে। একটা ঘরের পরদা সরানো ছিল, বিন্দুর চোখে পড়ল দু'জন নরনারী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় বসে আছে— মেয়েটির কাপড় বেসামাল, বিন্দু চোখ ঘুরিয়ে নেয়। অস্বস্তি হচ্ছে, গা গুলোচ্ছে, তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে— এ কোথায় এল সে? এরা সব কারা? কে এই ধর্মদাস? প্রচণ্ড মনের জোরে নিজেকে সামলায় বিন্দু। ধর্মদাস ওদিকে একটা ঘর দেখে নিয়েছে পরদা সরিয়ে। বিন্দুর দিকে তাকিয়ে সে বলে, "ভালো হয়েছে, তুই এইখেনে বোস, আমি দেখি মাসি কোথায় গেল।" ঘরের একদিকে একখানি চৌকি। তার উপরের বিছানাটা এমন কদর্য নোংরা যে বিন্দুর গা ফের গুলিয়ে উঠল সেইদিকে চেয়ে। মেঝের শানে একটা পাত্রে কিছু উচ্ছিষ্ট, কেউ খেতে খেতে উঠে গেছে। দুটো বোতল গড়াচ্ছে ঠিক তার পাশেই। কটুগন্ধ তরল বেরিয়ে এসেছে তাদের মুখ থেকে। ঘরের অন্যদিকের একখানি বড়ো তোরঙ্গ, তার ডালার উপর একটা ঝিমন্ত সেজবাতি।

তার টিমটিমে আলোতে দেখা যাচ্ছে দেওয়ালে একটা কুলুঙ্গি, তাতে কার্তিকঠাকুর আর মা কালীর পট।

বিন্দু আড়ষ্ট হয়ে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল। পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকে এল একজন পৃথুলা মহিলা। পিছনে পিছনে ধর্মদাস। আশ্চর্য, ধর্মদাসের মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন। এই একটু আগে পর্যন্ত সে ভাব দেখাচ্ছিল যেন মস্ত কেউকেটা একজন। এখন সে বিনীতভাবে হাত কচলাতে কচলাতে ঘরে ঢুকছে, মাথা সামান্য ঝোঁকানো— যেন গোমস্তা এসেছে জমিদারের পিছন পিছন। মহিলার মুখ সম্পূর্ণ গোলাকার, তবে মেদের আধিক্য থাকলেও বয়সকালে রূপের যে কমতি ছিল না তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মহিলার মুখভাব কঠিন। বিন্দুকে আগাপাশতলা দু'-তিনবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পিছন ফিরে ধর্মদাসকে শুধোল, "হ্যাঁরে পালের ব্যাটা, বারো বচ্ছর বললি তুই বাপু, দেকে তো ষোলোর কম মনে নিচ্চে না। দেকতেও তো বাপু সুবিধের নয়— তায় আবার গড়ন পেটন কেমন কাঠ কাঠ, ইশ্‌শ, হাড্ডিগুলো কেমন মোটা মোটা।"

কথাটা মিথ্যে নয়। বিন্দুর মুখশ্রীতে মায়ের লাবণ্যের বদলে বিধাতা বাপের পুরুষালি ছাঁদটি অকৃপণভাবে ভরে দিয়েছিলেন। ধর্মদাস একটু হেঁ-হেঁ করে বলল, "না বয়েসটা নিয্যস বারোই বটে, বাড়ি থেকে শুধিয়ে নিয়েছি, দেখতে একটু নিরেস আছে, তবে আজকাল বাবুভেয়েরা একটু মদ্দানি মেয়েছেলে পছন্দ করেন, করেন কি না?" একটু থামল ধর্মদাস, তারপর গলাটা একটু নামিয়ে যোগ করল, "তবে তোমায় বলি, গতরের গড়ন-পেটন যা আছে, বাবুদের বাড়ির লক্কা পায়রা ছোঁড়াদের ভিড় লেগে যাবে। সে-সব আমি দেখে নিইছি।"

"হারামজাদা, তোর ছুঁকছুঁক করার অব্যেস আর গেলনি," মহিলা দাঁত ছরকুটে হাসে।

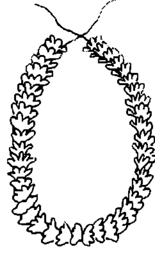
"তা বললে চলবে কেন? তোমাদের জন্য মাল সরেস ছাড়া এনিছি কখনও?" ধর্মদাস হাসে, "তা আমার হিস্যাটা?"

"সে তুমি দ্বারিকবাবুর মুচ্ছুদ্দির থেকে বুঝে নিয়ো। তার কাছ থেকে মাল তোলার দাদন নিয়েচ— তার সঙ্গেই কারবার তোমার। আমায় টানবে না তার মদ্যিখানে।" মহিলা ফের মুখ কঠিন করে বলে।

ধর্মদাস একবার বিন্দুর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে এগোয় সে-দিকে এক পা। ভাব দেখে মনে হয় কিছু বলবে বুঝি বিন্দুকে। কিন্তু না— তারপর একটাও কথা না বলে লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ধর্মদাস পাল। বিন্দু এতক্ষণ কাঠ হয়ে সব

শুনছিল, বিশেষ কিছুই বোঝেনি অবশ্য। কিন্তু ধর্মদাসকে চলে যেতে দেখে তার মনটা কেমন কু গেয়ে উঠল। সে অজান্তেই "ও কাকা, কই যাও গো" বলে দরজার দিকে পা বাড়াতেই সেই মহিলা খপ করে তার হাত ধরে ফেলল। খলখল করে হেসে বলল, "কাকা? তা ভালো রে ছুঁড়ি, তা ভালো। তুই কোতায় চল্লি আবার? তোর ঘর একন এখেনেই।"

বিন্দুর চোখে জল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলে, "তুমি আমার মাসি?" মহিলা এইবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে, বলে, "বটেই তো, শুদু তোর কেন রে ছুঁড়ি— দ্বারিকবাবুর কসবিপট্টির সব আবাগির মাসি আমি।" বিন্দুর হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে ফের একবার সজোরে হেসে ওঠে সে। তারপর বাইরের দিকে মুখ করে হাঁকে, "ও বিধু, কোতায় মরে আচিস? ঢলানিপনা ছেড়ে একবার ইদিকে আয়।" কয়েকমুহূর্ত পরে পরদা সরিয়ে মুখ বাড়ায় বিধুমুখী। মাসি তাকে হুকুম দেয়, "এই ছুঁড়ির ভার তোর। ফাগুনে ঠাকরুণের পুজো দিয়ে ঘরে বাবু বসাবে, কতাটা খেয়াল থাকে যেন।"



নয়

বুদ্ধিমতী মেয়ে বিন্দু। দু'-একদিনই লেগেছিল 'মাসি' আর তার 'বোনঝি'-রা মিলে ঠিক কোন ধরনের বসত জমিয়ে বসেছে মোকাম কলকেতার একেবারে মধ্যিখানে সে-ব্যাপারটা বুঝে উঠতে। অন্তরাত্মা সংকুচিত হয়ে উঠেছিল তার। অপরিসীম ঘৃণায় তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠেছিল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল অসহায় ক্রুদ্ধ চিৎকার— "না, না, না!"

বিধুমুখী প্রথম থেকেই সঙ্গে সঙ্গে আছে তার। মাসির হুকুম টালবার জো নেই, সাহসও নেই কারও। তার উপরে প্রথম দেখাতেই বিন্দুর উপর কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে তার। ধর্মদাস যখন রেখে গেল বিন্দুকে, মেয়েটার তখন পাগল-পাগল অবস্থা। তখন বিধুমুখীই সামলেছিল উদ্ভ্রান্ত বিন্দুকে।

বিন্দুর নাওয়া-খাওয়া, কাপড়-চোপড়, শোওয়া-থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল বিধুমুখী। নিজের ঘরেই এনে রেখেছে সে-মেয়েটাকে। তিন-চারদিন ঘরে খদ্দের পর্যন্ত নেয়নি। দু'-একজন বলতে এসেছিল বটে, "ওরে বিধু, পাগলামি করিস না। তোর তো বাবুও নেই বাঁধা। চলতি খদ্দের না নিলে নাম খারাপ হয়ে যাবে। তার উপর যদি রোগ আছে বলে একবার গপ্পো রটে যায়— হয়ে গেল! তোর ব্যবসা লাটে উঠবে, মাসিও কি পট্টিতে আর রাখবে ভেবেছিস তোকে?"

বিধুমুখী কান দেয়নি এসব কথায়। যদিও কথাগুলো খাঁটি সত্যি। তবুও কচি মেয়েটাকে এখন এক মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে যেতে তার মন সায় দেয়নি। প্রথম দুটো দিন বিন্দু মুখে কুটোটি দেয়নি। ঘরের কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকত হাঁটু মুড়ে, মুখ নিচু করে। পায়ের শব্দ পেলেই সন্ত্রস্ত চোখে সে-দিকে তাকিয়ে আরও ঘষটে সরে আসত অন্ধকার কোণটায়। বিধুমুখী টানা সাধ্যসাধনা করে গেছে খাবারের থালা নিয়ে। বিন্দু ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে থালা, যত্ন করে বেড়ে নিয়ে আসা ভাত-তরকারি মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে ছত্রখান হয়ে। বিধুমুখী বিনা বাক্যব্যয়ে সে-সব পরিষ্কার করে আবার নতুন করে খাবার সাজিয়ে এনেছে।

তিনদিনের দিন সন্ধেবেলা আর থাকতে না পেরে বিন্দু দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রায় আনমনেই বলেছে, "খিদে পেয়েছে।" কার উদ্দেশে বলেছে সে নিজেও বোধকরি জানত না। কিংবা হয়তো জানত, আধো-অন্ধকার ঘরের অন্যদিকে ঠাকুরের কুলুঙ্গিতে সন্ধে দেখাচ্ছে বিধুমুখী। বিন্দুর মুখ থেকে অস্ফুটভাষে আসা কথাগুলো শুনে বিধুমুখীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে ঠাকুরের সামনে একটা প্রণাম করে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল খাবারের জোগাড় করতে।

আজ খিচুড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। বেশি বেশি করে বিধুমুখী বেড়ে দেয় বিন্দুকে। খাওয়া দেখেই বোঝা যায় খিদেতে কত কষ্ট পাচ্ছিল মেয়েটা। বিধুমুখী স্মিতমুখে দেখতে থাকে বিন্দুর খাওয়া। তার চোখ থেকে হঠাৎই টপ করে ঝরে পড়ে এক ফোঁটা জল। সে কি ছাই জানত, তার এই পোড়া চোখে জল বেঁচে আছে এখনও কাঁদবার জন্যে! ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বিধুমুখী চোখের জল মুছে নেয় চট করে। মুখ তুলে দেখতে পায়, বিন্দু খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে বড়ো বড়ো দুই চোখ মেলে। নিজেকে সামলে নিয়ে হালকা গলায় বিধুমুখী বলে, "অমন করে কী দেখিস মেয়ে? পেট ভরে খেইচিস, না আরেটু দেব?" বিন্দু দুইমুহূর্ত অনড় হয়ে থাকে, তারপর ঘষা ঘষা গলায় জিজ্ঞাসা করে, "বিধুদিদি, আমি কী করব এখন? আমার কী হবে?"

'দিদি' ডাক শোনার জন্য বিধুমুখী প্রস্তুত ছিল না। একমুহূর্ত বিন্দুর চোখের দিকে তাকিয়ে সে নিজের চোখ নামিয়ে নিল। খুব মৃদুকণ্ঠে বলল, "তা জানি না রে, বোন। সত্যিই জানি না। কপালে কী লেখা আছে কেউ কি বলতে পারে?" বিন্দু খানিকটা বিভ্রান্তভাবেই বলল, "ধর্মদাসকাকা আমায় এখানে রেখে গেল? এখানে? এমনভাবে?" সে যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না অষ্টপুরের ধর্মদাস পাল

এমনটা করতে পারে তার সঙ্গে। বিধুমুখী নীরবেই হাসল। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে বোঝা না গেলেও তার সেই হাসিতে জড়িয়ে ছিল মর্মছেঁড়া বেদনা। "তুই কাকা বলে ডাকতিস ওই ধর্মদাসকে? আমি কী বলে ডাকতাম জানিস?" এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। বিধুমুখীর কথায় এবার তার সেই হাসির ব্যথা ঝরে পড়েছে। বিন্দুর কান এড়ায়নি তা। সে কিছুটা চমকেই তাকাল বিধুমুখীর মুখের পানে। বিধুমুখী হাসছে এখনও, হাসতে হাসতেই সে বলল, "আমি ওকে ডাকতুম 'ওগো' বলে।" বিন্দুর মাথায় যেন বাজ পড়েছে। হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে তার।

বিধুমুখীর সে-দিকে খেয়াল নেই, সে আপনমনেই নিজের মর্মন্তুদ কাহিনি বলে যাচ্ছে— "রাধাবাজারের শীলবাবুদের বাড়িতে কাজ করত মা। ছোট্টবেলায় বিয়ে দিয়ে পর করেছে, কিন্তু ঠাকুর আমায় দূরে থাকতে দিলে না মায়ের থেকে। এয়োর শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে সেই মায়ের দোরেই এসে দাঁড়ালাম যখন, বয়েস পনেরো পোরেনি তখনও। মা কেঁদে গিয়ে পড়ল শীলগিন্নির কাছে। শীলগিন্নির মনটা ভালো। আমায় বললে, 'থাকো বাছা তুমি। তবে তোমার যেমন গড়নপেটন, বাবুদের সামনে বেশি যেয়োনি কিন্তু। এ বাড়িতে ছোকরা বাবু অনেক। তাদের মদ্দানি খাঁই বেজায়। গতর নাচিয়ে অঘটন কিছু ঘটালে এ বাড়িতে আর মা-মেয়ের ঠাঁই হবেনি, এই বলে দিলুম।"

দীর্ঘ একটা শ্বাস নেয় বিধুমুখী। বিন্দুর হাতে খিচুড়ি শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেছে। নিথর হয়ে শুনছে সে। "বাবুদের ছুঁকছুঁক ছিল না— তা বলব না। বাঁচিয়ে-বুঁচিয়ে চলতে হবে, মা পইপই করে বলে দেছিল। আঁধার সিঁড়ির কোণে কেউ হাত ধরে টানবে, কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে টাকা নাচাবে দু'-চারখান। কিন্তু মাথার ওপরকার ছাদ চলে যাবে ওসব ফাঁদে পা দিলে।" বিধুমুখী হাসছে আবার। তেতো হাসি। "ফাঁদে সেই পড়লাম। তবে ছোকরা বাবুদের ফাঁদে নয়, এই হাড়হাভাতে অলপ্পেয়ে পালের পো-র ফাঁদে।" বিন্দু বিধুমুখীর সব কথা ঠিক বুঝতে পারছে না, আবছা আবছা ধরতে পারছে।

"শীলকর্তার মোসায়েব হয়ে এয়েছিল নচ্ছারটা। কয়েকদিন বাদে ইনিয়ে-বিনিয়ে কত না ভালোবাসার কতা কইতে শুরু করেচে আমার কানের পাশে এসে। নিতান্ত ছুঁড়ি বয়েস তখন। গলে গেলুম সে। বললে বিয়ে করবে। আমি তো অবাক হয়ে মরি আর-কি! মাগো, কী ঘেন্নার কতা! বেওয়া মাগির আবার বে হয় নাকি? পালের পো বললে সায়েবপাড়া ছাড়িয়ে নাকি এক পাথুরে গির্জে[8] রয়েচে, সেখেনে গিয়ে কেরেস্তান হলে নাকি সব মাফ। আমিও বোকা, ভাবলুম হবেও বা। খুব ভাব-ভালোবাসা চলল

ক'দিন।" বিন্দু মন্ত্রমুগ্ধের মতো জিজ্ঞাসা করল, "তারপর?" বিধুমুখী কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, ঘরের পরদা সরিয়ে উঁকি মেরেছে পাশের কামরার পারুলবালা। "ও বিধু, তুই কি আজকেও ঘর খুলবিনে? মাসি কিন্তু বলে দিয়েচে এ হপ্তার টাকা বুঝে নেবে কড়ায় কড়ায়।" বিধুমুখী শক্তভাবেই উত্তর দিল, "তুই যা দিকি। মাসির সঙ্গে আমি কতা কয়ে নোব অখন।" পারুলবালা বিরস মুখে চলে গেল।

বাইরে সন্ধ্যা হয়েছে। এসে ইস্তক বিন্দু দেখছে সন্ধে হলেই দিনমানে ঝিমিয়ে থাকা পাড়াটার ভোল পাল্টে যায় পুরো। চতুর্দিক কুপি, লণ্ঠনবাতির আলোয় ঝলমল। দোকান পসরার জাঁকজমক কী! কারবারি আর খদ্দেরদের বচসায় গমগম করছে সরু গলিরাস্তা। বাবু আর ভিখিরি পাশাপাশি এসে ঢুকছে সেই গলিতে। মাসির বাড়ির 'বোন-ঝি'রা বারান্দায়, রাস্তার ধরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ভারী সেজেগুজে। কিন্তু বিধুমুখী যায়নি। গত তিনদিন ধরেই যায়নি সে। পারুলবালা চলে যাওয়ার পর উঠে গিয়ে দরজাখানি বন্ধ করে এল শুধু। বিন্দু একভাবেই বসে আছে তখনও। বিধুমুখী এসে বসে তার সামনে। তারপর ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করে নিজের কাহিনি।

কাহিনি আর কী? কলকেতার বুকে এমন কাণ্ড তো হরবখত হচ্ছে। বিধুমুখীর মতো অসহায় মেয়ের কমতি নেই এখানে, আর ধর্মদাস পালের মতো শকুনরাও তাদের দিকে চোখ দিয়ে বসে থাকে সর্বদাই। চোখ ধর্মদাসের ছিলই বিধুমুখীর উপর। ভাব-ভালোবাসা, যেমনটা বলেছে বিধুমুখী, সেইটে ছিল ধর্মদাসের মাগনার ফুর্তি। আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য। সেটা অবশ্য বিধুমুখী বোঝেনি তখন। যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। পেটে তার সন্তান এসে গেছে।

বিধবার ধর্মনষ্ট হলে ছি-ছিক্কার পড়ে। আর বিধবার পেটে যদি সন্তান আসে তা হলে সর্বনাশের সীমা নেই, পরিবারের ইহকাল-পরকাল সমস্তই নষ্ট। মা-মেয়েকে দূর দূর করে তাড়িয়েছিলেন শীলগিন্নি। মাকে ভাইয়ের বাড়ি রওয়ানা করে দিয়ে ধর্মদাসের হাত ধরেছিল বিধুমুখী। ভাই তার কাজ করে বন্দর মালখানার সেরেস্তায়। এমনিতেও ভাইয়ের ঘরে গিয়ে উঠতে পারত না সে, তার উপর তার চোখে অনেক স্বপ্ন তখন। পাদরিসায়েবের কাছে কেরেস্তানি দিক্ষে নিয়ে স্বামী সন্তান সংসারের সোয়াদ নেবে। ধর্মদাস কিছুদিন তাকে নিয়ে চিৎপুরের দিকে একটা খোলার ঘর ভাড়া করে থাকল, তারপর একদিন সিধে এনে তুলল এই মাসির ঘরে। তারপর তার আর পাত্তা নেই।

বিন্দুর মতো অবিশ্যি দেরি হয়নি বুঝতে। ঘরে ঢুকেই বিধুমুখী বুঝে গিয়েছিল সে কোথায় এসে পড়েছে। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ তখন, পালানোর উপায় নেই। একমাস

খুব যুঝেছিল বিধুমুখী। কিন্তু তারপরে আর পারেনি, পেটের শত্তুরটা সব শক্তি শেষ করে দিচ্ছিল তার। মাসি কড়া পাহারায় রেখেছিল নতুন চিড়িয়াটাকে। সময় হলে বাচ্চা বিয়োনোর ব্যবস্থাও হয়েছিল মাসির তদারকিতেই। বাচ্চাটা বাঁচেনি। মায়ের শরীর-মনের বেদনা নিয়েই জন্মেছিল সে, নাড়িকাটার পর বেশিক্ষণ তাকে আর সে-যাতনা সহ্য করতে হয়নি।

সে-কথা মনে পড়লে আজ বিধুমুখী মনে মনে ঠাকুরের পায়ে গড় করে। পোয়াতি কিনতে মাসি দুনো দাম দিয়েছিল ধর্মদাসকে। বাচ্চাটা বেচে সেই দাম উসুল করত। সে-সুযোগ না পাওয়ায় বেশ খেপেই গিয়েছিল কসবিপট্টির অলিখিত মালকিন। তার উপরে বিধুমুখীকে খদ্দের বসানোর জন্য তৈরি করতেও দু'-তিনমাস লেগেছিল মাসির। বাচ্চা হারিয়ে প্রথম প্রথম উন্মত্তের মতো আচরণ করত হতভাগী। একবার জোর করে এক মাড়োয়ারিকে এনে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল মাসি। বিধুমুখী কামড়ে কানের লতি ছিঁড়ে নেয় ফুর্তি করতে আসা মোটাসোটা ব্যবসায়ীটির। তারপর থেকে বদনাম বিধুমুখীর। দু'-তিনমাস পরে নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে মাসির শেখানো পথে কসবি হওয়ার তালিম নিতে শুরু করলেও রাক্ষুসি মাগি বলে তার বদনাম ছড়িয়ে পড়েছিল পট্টিতে। কোনও বাবু আর পাকাপাকিভাবে রাখতে চায়নি বিধুমুখীকে। চায়নি তো চায়নি, বিধুমুখীর বয়েই গেছে। সে নিজের মনেই আছে।

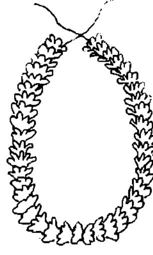
কথা শেষ করার পর অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। বিন্দু ভাবেনি গোটা দুনিয়ায় এত দুঃখ। এত দুঃখী মানুষ। বিধুমুখীর সঙ্গে ঈশ্বর যে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছেন, তার সামনে নিজের দুর্ভাগ্যকেও যেন কিছুটা কম বলে মনে হল তার। বিন্দু শুধু একবার কোনওমতে ভিজে গলায় বলে উঠতে পারল, "তুমি ছেড়ে দিলে ওই ধর্মদাসকে? ও বুকফুলিয়ে আবার আসতে পারল এ পাড়ায়?" বিধুমুখী মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, "ইচ্ছে হয়েছিল। শয়তানটার গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল ওকে এ পাড়ায় আবার দেখে। কিন্তু মাসি ভয় দেখিয়ে আটকে রাখল আমায়। বলল, আমার ভাইয়ের পাড়ায় রটিয়ে দেবে আমি বেবুশ্যে। সবাই পতিত করবে ওদের। জাত চলে যাবে। একটা ভাইঝি আছে আমার, এই তোর বয়েসি হবে এখন।" গলা ধরে আসে বিধুমুখীর। বহুক্ষণ চেপে রাখা কান্না এইবার উপচে এসেছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "বিয়ে দিতে পারবে না মেয়েটার। ওর শেষে আমার মতো অবস্থা হবে, কসবি হয়ে রোজ বাবুদের খুশি করে জীবন কাটবে।" বিন্দু পাথরের মতো নিশ্চল, বিধুমুখীর কান্নার বেগ বেড়ে গেছে। "সে আমি পারব না রে বিন্দু, সে আমি পারব না। এখান থেকে

পালাতেও পারলাম না, শয়তানটাকে শাস্তি দিতেও পারলাম না। ওই শয়তানটা জিতে গেল। আমি হেরে গেলাম।"

বিধুমুখীকে জড়িয়ে ধরল বিন্দু। তার চোখের জল অঝোরধারে বিধুমুখীর মুখমাথা ভিজিয়ে দিচ্ছে। দু'জনের চোখের জল মিশে মেঝেয় পড়ছে টপটপ করে। বিন্দু অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করছে, "আমি পালাব বিধুদিদি। বিন্দুকে ওই শয়তানগুলো হারাতে পারবে না।"

---

৪. কলকাতাস্থিত সেন্ট জন'স চার্চ (প্রাক্তন ক্যাথেড্রাল)



দশ

তা কথা বিন্দু রাখার চেষ্টা করেছিল। পালানোর চেষ্টা করেছিল সে খুবই। একবার নয়। একাধিকবার। প্রত্যেকবারই ধরা পড়েছে। প্রথমবার মাসি শুধু একটা থাপ্পড় মেরে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর ক্রমে শাস্তির মাত্রা বেড়েই গেছে। শেষবার বিন্দু পালিয়ে বড়ো রাস্তা অবধি চলে গিয়েছিল। ভাগ্যি মন্দ তার। মাসির পেয়ারের মাগি টগর রাস্তার ধারে কোম্পানির একটা পেয়াদার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছিল, সে-ই বিন্দুকে দেখে ফেলে।

এবারে মাসি আর ছাড় দেয়নি। উস্তম-কুস্তম পিটিয়েছে একখানা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে। বিন্দুর সারা শরীর কেটে রক্ত বেরিয়েছে, তবুও মাসি ক্ষান্ত দেয়নি। বিধুমুখীর জন্যই বেঁচে গেছে এ যাত্রা বিন্দু, না-হলে মাসির রুদ্রমূর্তি দেখে মনে হচ্ছিল, খুনই করে ফেলবে আজ। উপায় না দেখে বিধুমুখী চেঁচিয়ে উঠেছিল, "ও মাসি, অমন করে শ্যাল-কুকুরের মার মেরো না গো, খুঁতো হয়ে যাবে ছুঁড়িটা।" তবে মাসি থেমেছে। কিন্তু রাগ কমেনি তার। বিধুমুখীর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলেছে, "তোর চেয়েও বেশি জ্বালাচ্ছে এই ছুঁড়িটা। সামলে রাখ, নইলে বেচে দেব সোজা গোলামকারবারিদের কাছে।"

বিধুমুখী শিউরে উঠেছিল। কোম্পানির রাজ কলকেতে জেঁকে বসলেও ইতিউতি

গোলামকারবারিরা রয়ে গেছে ঠিক। তক্কে তক্কে ঘোরে তারা। অল্পবয়েসি মেয়েদের দিকে তাদের নজরটা কিছু বেশি। প্রথমে কারবারিরাই ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে মেয়েটাকে। তারপর জাহাজের খোলে বন্ধ করে নিয়ে যাবে কালো মানুষদের দেশে, যেখানে সাদা সায়েবদের রাজত্ব। না, সে-জীবন নরকের চেয়েও খারাপ। বিধুমুখী নিজের অজান্তেই একবার কেঁপে ওঠে। এ হতে দিতে পারে না সে। ওদের হাতে পড়ার চেয়ে বিধুমুখী বিন্দুকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে।

মাসি চলে গেলে বিন্দুর পিঠে দাগড়াগুলোয় চুন হলুদ লাগাতে লাগাতে নরম গলায় বিধুমুখী বলল, "বিন্দু, এইবার ক্ষ্যামা দে বোন। ঠাকুর কিছু না কিছু রাস্তা ঠিক দেখাবেন। কিন্তু তুই যদি অমন করতে থাকিস, এরা তোকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে।" বিন্দুর চিবুক ধরে মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে আনে বিধুমুখী। "আর এমন খ্যাপামি করবি না বল, কথা দে আমায়!" বিধুমুখীর স্বরে আর্তি ঝরে পড়ছে। কিন্তু বিন্দুর হেলদোল নেই, দৃষ্টি কঠিন। সে-দৃষ্টির পানে তাকিয়ে বিধুমুখী বুঝল তার অনুনয়ে কাজ হয়নি। সব পাখি খাঁচায় থাকে না। পায়ে শিকল পরার জন্য বিন্দুর জন্ম হয়নি। বিধুমুখীর ভয় করছে। কেন, সে জানে না। খুব ভয় করছে। কোনও অঘটন ঘটবে কি?

* * *

বিধুমুখীর ভয় অমূলক ছিল না। কয়েকদিন নিশ্চিন্তেই কেটেছে। তারপর এক রোববারের সকালে মাসি এসে হাজির। শরৎ আসন্নপ্রায়। কলকেতার আকাশ হাসছে। লোকজনের মনেও দেদার ফুর্তি। বিন্দু জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইছে—

'হলাহল কেন দিলে তুমি প্রভু, এ জীবনে সুধা ঢালা
পরাণ তুমিই দিয়েছ, আবার, দিলে গো পরাণজ্বালা।
আশিসে ভরাও, কখনও আবার চাও না দাসের পানে
তোমা ছাড়া তবু— এ হৃদি আমার, আর কিছু নাহি জানে।'

হরিপদ-সাধুর গান। স্মৃতিধর বিন্দু কখন যেন শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছে ভক্তের আর্তিভরা পদের কথা, সুর। আজ এই দুঃখের সময়ে এসে যেন হরিপদর

অনুযোগ ভরা আকুতিই বিন্দুর গলায় গান হয়ে উঠে এসেছে। বিধুমুখী মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই দড়াম করে ঘরের দরজা খুলে গেল এক প্রচণ্ড ধাক্কায়। মাসি এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ গম্ভীর। গান থামিয়ে বিন্দুও চমকে তাকিয়েছে। তার দিকে কটমট করে একবার তাকিয়ে মাসি বিধুমুখীকে বলল, "বিধু, মন দিয়ে শোন, সন্ধেবেলা এই হারামজাদি ছুঁড়িটাকে নাইয়ে-ধুইয়ে তৈরি করে রাখবি। দরকার আছে।" যেমন এসেছিল, দুমদুম করে তেমনিই চলে গেল মাসি। বিন্দু ও বিধুমুখী একে অন্যের দিকে চাইল নিঃশব্দে। দু'জনের চোখেই ভয়ের ছাপ। কী দরকার রয়েছে মাসির?

সন্ধেবেলাতেই অবশ্য দরকারটা বোঝা গিয়েছিল। সারা দুপুর অসহ আশঙ্কায় কেটেছে বিধুমুখীর। বিন্দুও ছটফট করেছে সারাবেলা। তবু মাসির হুকুম, বিন্দুকে নাইয়ে পরিষ্কার করে চুলে ফুলেল তেল দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছে বিধুমুখী। সাঁঝেরবেলা বিন্দুকে নিতে এল টগর। তাকে দেখেই বিধুমুখীর ভুরু কুঁচকে গেছে। এ মেয়েটার হাবভাব সুবিধার নয়, হিংসুটে টগর কখনও ভালো চায়নি কারও। টগরের চোখে আজকে যেন কী এক শয়তানি ঝিলিক দিচ্ছে। টগরের হাতে বিন্দুকে একা ছাড়ল না বিধুমুখী। পিছন পিছন চলেছে সে-ও। টগর বিন্দুর হাত ধরে চলেছে মাসির দোতলা বাড়ির দিকে। যেতে যেতে অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপছে বিধুমুখীর। কেন সে জানে না।

মাসির নিজের ঘরখানা দেখার মতো। দামি পালঙ্ক, পাকা শান-বাঁধানো মেঝে, চকচকে সেজবাতি। হবে না-ই বা কেন, বয়সকালে দ্বারিকবাবুর বাঁধা মাগ ছিল মাসি। বাগিয়ে নিয়েছে অনেক। বাকি জীবনটা এমনিই কেটে গেলেও অসুবিধা ছিল না, কিন্তু মাসির খাঁইয়ের কমতি নেই— দ্বারিকবাবুর হয়ে এখন পট্টির মালকিন হয়ে বসেছে একরকম। ঘরের কোণে একখানি ভারী জাঁকের কেদারায় বসে মাসি পান চিবুচ্ছিল। হাতে রুপোর জল-করা ভারী পানের বাটা। টগরের সঙ্গে বিন্দুকে দেখে মাসির মুখে একটা হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। পিছনে পিছনে আসা বিধুমুখীকে দেখতে পেয়েছে মাসি, বিরক্তভাবে খেঁকিয়ে উঠেছে, "তুই আবার আসতে গেচিস ক্যানে? তোকে কে বলেচে আসতে?"

বিধুমুখী কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামনে এক দৃশ্য দেখে তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল— মাসির কান অবধি পৌঁছোল না। ঘরের অন্যদিকের দরজা খুলে "কই গো মাসি? আর কত দেরি করবে? আমাকে আবার বউবাজার যেতে হবে একবার। একটা ছুঁড়িকে তাক করে রেখেছি অনেকদিন ধরে, আজ কাজ একটু

এগিয়ে রাখব।” বলতে বলতে বেরিয়ে এসেছে ধর্মদাস। হ্যাঁ ধর্মদাস পাল। ভুল দেখেনি বিধুমুখী। ধর্মদাসের মুখের হাসি থেকে উল্লাস আর নোংরা একটা ইঙ্গিত একসঙ্গে চুঁইয়ে পড়ছে। একমুহূর্তেই সব বুঝতে পারল বিধুমুখী। ধর্মদাস এসেছে বিন্দুর নথ ভাঙতে।

এমনিতে ‘নথ ভাঙা’ ভারী একটা উৎসবের বিষয়, পট্টির মেয়েরা সবাই খুব মানে এই আচার। আজকের নয়, কবে থেকে চলে আসছে প্রথা কেউ জানে না, তবে পালন করে খুব মন থেকে। সরস্বতী পুজোর দিন যদি কারও ‘নথ ভাঙা’ হয় সে মেয়ের ঘরে বাবুর অভাব হয় না কখনও— এমনটাই সকলের বিশ্বাস। মাসিও তো তাই ঠিক করেছিল বিন্দুর জন্য। কিন্তু বিন্দুর বারবার পালানো বাদ সেধেছে তাতে। মাসি খেপে উঠেছে। জবরদস্তি ‘নথ ভাঙানো’ মাসির শয়তানি বুদ্ধির পুরোনো নমুনা। বেয়াড়া ছুঁড়িদের এমন করেই জব্দ করে। একবার নথ ভেঙে গেলে সব মাগিই টিট হয়ে যায়— এমনটাই বক্তব্য মাসির। একবার তো মনসুর সহিসকে পাঠিয়েছিল এক নতুন চিড়িয়াকে ‘টিট’ করতে। মনসুর নিজের কাজ ঠিকই করেছিল, কিন্তু ছুকরিটা বিছানা নিয়েছিল এক হপ্তার জন্য। তারপর আর কোনও বেগরবাই করেনি সে। মাসি জানে, এ ওষুধের কোনও মার নেই।

বিধুমুখী ভয়ে কেঁপে ওঠে একবার। ধর্মদাসকে ডেকে এনেছে মাসি খুব হিসেব করে। ধর্মদাসের নজর ছিলই বিন্দুর উপর, বিধুমুখী জানে— মরদদের চাউনি দেখলেই সে বুঝতে পারে। আরও বড়ো কথা হল— বিন্দুর ‘ধর্মদাসকাকা’, গাঁয়ের মানুষ, তাকে দিয়ে এই কাজ করালে বিন্দুর মন ভেঙে যাবে, ধক যাবে শুকিয়ে। কলিজায় জোর থাকবে না। আর পালাবে না বিন্দু। আর গাইবে না, ‘তোমা ছাড়া তবু— এ হৃদি আমার, আর কিছু নাহি জানে।’ বিধুমুখীর হতভম্ব চোখের সামনেই টগর বিন্দুকে ঠেলে দিয়েছে ঘরের মধ্যে। বিন্দুও ধর্মদাসকে দেখে অবাক এবং ক্রুদ্ধ। কিন্তু সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই টগর তাকে দিয়েছে এক ধাক্কা। হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল সে, ধর্মদাসের দুই হাত এসে তাকে ধরে নিয়েছে। আবার সেই লোভী হাত দুটো খেলছে তার শরীরে। একটা চিৎকার। কিন্তু এই চিৎকার বিন্দুর গলা থেকে আসেনি। চিৎকার করেছে বিধুমুখী।

“ওকে ছুঁবি না শয়তান। ছেড়ে দে ওকে।” পাগলের মতো চিৎকার করছে বিধুমুখী। ছুটে এসেছে ঘরের মধ্যে, ধর্মদাসের দিকে। টগর আর মাসি হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এসেছে বিধুমুখীকে আটকাতে। কিন্তু তার আগেই সে ধর্মদাসের বুকে মেরেছে

এক প্রচণ্ড ধাক্কা, আর সেই ধাক্কায় ধর্মদাস পিছিয়ে গেছে কয়েক পা— বিন্দু ছাড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে। ধর্মদাস নিজেকে সামলাতে একমুহূর্ত নিল, তারপর প্রচণ্ড ক্রোধে দু'হাতে টিপে ধরল বিধুমুখীর গলা। বিন্দু প্রবল আতঙ্কে দেখল— দেখনদারি হাসি আর মিঠে কথার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে ধর্মদাসের আসল মুখ বেরিয়ে এসেছে এইবার। সেই মুখে জান্তব হিংসার বাঁধনছেঁড়া প্রকাশ। সেই মুখে কদর্য লালসার কালো ছায়া পড়েছে। বিধুমুখীর গলা টিপে ধরে ধর্মদাস সাপের মতো হিসহিসিয়ে বলছে, "মর তুই আবাগির বেটি খানকি মাগি। মরে যা।"

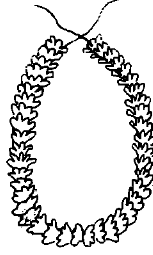
বিন্দু ভয়ে কাঠ হয়ে দেখল সেই প্রচণ্ড টিপুনিতে বিধুমুখীর দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তার চোখের মণি যেন বেরিয়ে আসছে ঠিকরে। বিন্দু পিছন থেকে ধর্মদাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আঁচড়াচ্ছে, ঘুসি মারছে, ঢুঁসো মারছে— কিন্তু ধর্মদাসের বজ্রমুষ্টি আলগা হয়নি। মাসি আর টগর জাপটে ধরে সরিয়ে এনেছে বিন্দুকে। টগর ধর্মদাসকেও বাধা দিতে যাচ্ছিল, মাসির চোখের ইশারায় থেমে গেছে। "মরুক মাগি," মাসি ফিসফিস করে বলে, "হাড়জ্বালানির একশেষ।" বিন্দু মরিয়া হয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, "বিধুদিদি!" বিধুমুখীর চৈতন্য সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হওয়ার আগে সে শুনতে পেয়েছে সেই ডাক। শরীরের শেষ শক্তিটুকু একত্রিত করে সে দুই হাত জড়ো করে কোনওক্রমে আঘাত করেছে ধর্মদাসকে। ধর্মদাস ছিটকে গেছে। তার কণ্ঠায় লেগেছে আঘাত।

কয়েক মুহূর্ত দু'জনের লাগল একটু সামলে নিতে, হাঁপাচ্ছে দু'জনেই। ধর্মদাসই আগে সামলে উঠেছে, কোমর থেকে লিকলিকে একটা ছুরি বার করে প্রবল জিঘাংসায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিধুমুখীর উপর। কিন্তু ওদিকে বিধুমুখীও যেন হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেছে দরজার পাল্লার পাশে নামিয়ে রাখা ভারী লোহার খিলখানা। সম্ভবত বিপদের আঁচ করেই সে খিলটা তুলে আগুয়ান ধর্মদাসের মাথা লক্ষ্য করে হেনেছে এক প্রচণ্ড আঘাত। ধর্মদাস শেষমুহূর্তে উদ্যত খিলটাকে দেখতে মাথা সরিয়ে বাঁচার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি এড়াতে পারেনি আঘাতটাকে। তার কানের পিছনে সপাটে এসে লেগেছে খিলের বাড়ি। পড়ে যেতে যেতেও ছুরি চালিয়েছে ধর্মদাস। সে-ছুরি গিয়ে বিঁধেছে বিধুমুখীর গলায়। তারপর দু'জনেই পড়ে গেছে মেঝেতে।

ধর্মদাসের শরীরটা একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। পাপিষ্ঠ ধর্মদাসের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়েছে। বিধুমুখীর ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে রক্ত। বিন্দু টগরের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে এসে হাঁটু মুড়ে বসেছে বিধুমুখীর পাশে। বিধুমুখী

তার দিকে তাকিয়ে হাসল। নির্মল নিশ্চিন্ত সে-হাসি। হাসবে না-ই বা কেন? মা নিজের সন্তানের কাছে যাচ্ছে। বিধুমুখীর পরাণজ্বালা আর পরাণ— দুই থেকেই মুক্তি দিয়েছেন ঈশ্বর।

মাসি ভারী পদক্ষেপে এসে দাঁড়িয়েছে বিন্দুর পাশে। বিন্দু মুখ তুলে তাকাল। তার চোখ শুকনো। একফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি বিন্দুবাসিনী।



এগারো

হপ্তাখানেক বাকি আছে আর ফাগুন মাস পড়তে। এ বছর মাঘ মলমাস। ঠাকরুন মানে সরস্বতীর পুজো তাই ফাগুন মাসের প্রথম দিনে হবে। এখন থেকেই বাগবাজার থেকে বউবাজার অব্দি গলিতে গলিতে যত কসবিপাড়ায় ধুম লেগে গেছে। দুয়োরে দুয়োরে হলুদ রঙে ছোপানো ঝালর আর নিশান। তবে উৎসাহী বাবুর দল অত দিন অপেক্ষা করতে রাজি নয়, রোজ সন্ধেতেই ইয়ার-বকসির দল জুটিয়ে ঘরে ঘরে মোচ্ছব করছে। বাগবাজার থেকে বউবাজারের গলির সমস্ত কসবিপট্টিতে এই অবস্থা।

মাসির বাড়ির দোতলার একটা ঘরে বসে ওস্তাদের কাছে গান শিখছিল বিন্দু। ওস্তাদ সাতঘাটের জল খাওয়া পুরোনো লোক। কিন্তু সাধারণত কসবিপাড়ায় যেমন দেখা যায় গানের ওস্তাদদের— বদনামী কোটনামি ধান্দাবাজির সীমা নেই, গান শেখানো ছুতো, আসলে তারা শেখায় ছেনালি আর গতরদেখানি, এ ওস্তাদ তেমন নয়। মাথায় মুসলমানি টুপি, পরনে ওই ঢঙেরই চোগা চাপকান। তার উপর রংবেরঙের জরির কাজ। এরকম রংদার পোশাক পরে মুখে জর্দা-পান ঠুসে সে শিষ্যাদের শেখায়, "হ্যাঁ, ঢিমে তেতালায় ধর দিকি, যেমনটি বলিছি।" কখনও বা কাউকে ধমক দিয়ে ওঠে, "তোমায় দিয়ে হবেনি বাছা। তখনই জানি, এমন বেতালা গলায় কী আর গান হয়? এক কাজ কর না কেন? বোসপুকুরের মুরারি ভড়ের পায়ে পড়ে যা— দ্যাখ সে

যদি তোকে রাখে। সে কানে কালা কিনা।”

ছাত্রী হয়তো হাসছে তখন লুটিয়ে লুটিয়ে, ওস্তাদ ফের ধমকায়— “দাঁত বার করবিনি এক্কেবারে, পানের বাটার বাড়ি দিয়ে দাঁত ভেঙে দেব।” সর্বক্ষণের সঙ্গী পেতলের পানের বাটাটা হাতে তুলে দেখায় সে। বিন্দুর সঙ্গে অবশ্য সে-সব মুশকিল নেই। গানের দক্ষতা মেয়েটার সহজাত। গান তোলাতে তোলাতে ভারী খুশি হয়ে ওঠে ওস্তাদ, “আহা, কেয়াবাত— হবে, হবে, তোর হবে রে মা। একদিন তুই কুসুমকুমারীর মতো বড়ো হবি।”

বিন্দুর কোনও হেলদোল নেই। শাসন, শাস্তি অথবা শাবাশি, ভাবলেশহীন মুখে গ্রহণ করছে সে সবই। বিধুমুখীর মৃত্যুর পর আরও একবার সে যেন পাথর হয়ে গেছে। যেমন হয়েছিল বিলুর মৃত্যুর পরে। মাসি লক্ষ করেছে সবই, তবে বিন্দু যে আর পালানোর চেষ্টা করেনি, এতেই মাসি খুশি। বিন্দু সত্যিই পাল্টে গেছে। মাসি এবার শশীকলার হাতে দিয়েছে বিন্দুকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়ার ভার। শশীকলা এ পাড়ার পুরোনো কসবি। বিন্দুকে সরস্বতী পুজোর আগেই রাঁড়গিরিতে পাকা করে তুলতে সে আদাজল খেয়ে লেগে পড়ল। আশ্চর্য, বিন্দু যেন বাধ্য ছাত্রী হয়ে গেছে, রাঁড়গিরি ছয় পন্থা অর্থাৎ ছলনা-ছেনালি-ছেলেমি-ছাপান-ছেমো-ছ্যাঁচড়ামির পাঠ নেয় সে মন দিয়ে।

তবে বেশি আগ্রহ তার গান শেখায়। গান শিখতে বসলে তার মন ভালো হয়ে যায়। সহজাত দক্ষতায় সে একের পর এক গান, সুর তুলে নেয় কণ্ঠে। ওস্তাদ মুগ্ধ। অথচ বিন্দু এ ধরনের গান গায়নি কখনও। গাইবে কী ছাই, জানতই না এ ধরনের গানও হয়। পণ্ডিত কথকের মেয়ে বিন্দুকে ওস্তাদ গান শেখায়, সে-গানের ছত্রে ছত্রে নিষিদ্ধ ইশারা, নির্লজ্জ আহ্বান। তবে বিন্দু এ ধরনের গানেও খুঁজে নিচ্ছে নিহিত সুর-তাল-ছন্দের অকলঙ্ক ধারা, শুদ্ধ তানের খোঁজ। বিন্দু চোখ বুজে গায়—

‘নতুন জনম হল বঁধু তোমারি চরণে এসে
বঁধু মরেছি বেঁচেছি জেনো তোমারেই ভালোবেসে
তোমারই প্রেমের মধু
বুকেতে রেখেছি শুধু
(তোমারই) বুকেতে মাথা রেখে আমি মরিব গো হেসে হেসে।’

ওস্তাদ থ-মেরে যায়। এই গানটার হওয়ার কথা ছিল ঢলানিতে ভরপুর। রাঁড়রমণী তার বাবুর গায়ে ঢলে পড়ে গায় যে-গানের কলি, সুর টেনে টেনে ছেনালি ঢুকিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিতবাহী করে তোলে যে-গানকে— বিন্দু কোন মন্ত্রবলে যেন সেই গানকে বিশুদ্ধ প্রেম আর পূজার অর্ঘ্য করে তুলেছে শুদ্ধ সংহত গায়কির জোরে। ওস্তাদের মনে হচ্ছে কোনও ভক্ত যেন সুরের ছাঁচে ঢেলে নিজের দেবতাকে বলছে নিজের মনের গভীর উপলব্ধির কথা।

তবে ওস্তাদের পাকা কানে একটা জিনিস ঠেকেছে। বিন্দুর গানে প্রেমভাবের তুলনায় ভক্তিভাবটাই যেন বেশি করে ফুটে উঠেছে। অথচ এই গানখানা এমন জায়গায় নিয়ে গেছে মেয়েটা নিজের দক্ষতায়, প্রেমভাবের আরও একটু মিশেল হলে পুরোপুরি খোলতাই হত, ওস্তাদ ভাবে। সেইটে বলতে যাবে বিন্দুকে নরম করে, ঠিক তক্ষুনি খোলা দরজার পাশ দিয়ে উঁকি মারে রোগাসোগা শ্যামলাবর্ণের একখানি মুখ। সৌদামিনী এসেছে।

ওস্তাদকে দেখে জিভ কেটে সে বলে, "ওই যা, ওস্তাদজি যে। বিন্দুদিদি গান তুলছে নাকি? যাই তবে, পরে আসব'খনে।" ওস্তাদ শশব্যস্তে বলে, "আরে তাই আবার হয় নাকি। তোমরা দু'জন গল্পগাছা করো, আমি উঠি। একবার সিমলেপাড়ায় যেতে হবে। বিকেলের দিকে আসব একবার।" সৌদামিনী মুচকি হেসে ঘরে ঢুকে পড়ে। এ পাড়ায় সবার কাছে তার সাত খুন মাফ। হবে না-ই বা কেন? মানদাসুন্দরীর গর্ভে চোরবাগানের মিত্তিরদের ছোটোবাবুর সন্তান ওই সৌদামিনী। চোরবাগানের মিত্তিরদের টাকাপয়সার লেখাজোকা নেই। আর ছোটোবাবুর প্রসাদে মানদারও দবদবা অশেষ। এই পাড়ায় দোতলা পাকাবাড়ি দুটো। একটা মাসির, আর একটি মানদার নিজের। মেয়েকে এই ধান্দায় আনবে না পণ করেছে মানদা, এখন যতদিন মিত্তিরবাবুর আশীর্বাদ মানদার উপরে— কারও কিছুই বলার নেই।

মাসি দু'-একবার বলতে গিয়েছে মানদাকে, "হ্যাঁ লা মানদা, মেয়েটাকে ব্যবসায় বসাবি না তো করবি কী? তোর না হয় একনও যাকে বলে সব্বো অঙ্গ ভত্তি যৈবন, মিত্তিরবাবুও তোকে ছাড়া চোকে অন্নকার (অন্ধকার) দ্যাকে। এমনটি তো চেরকাল থাকবেনি রে। বুড়ো বয়সের একটা হিল্লে কর। মেয়েটাকে তৈরি কর।" মানদা ঝাঁঝিয়ে উঠে মাসিকে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। চিন্তা করার অবিশ্যি কারণ যথেষ্ট। বাবুদের পিরিত আর পদ্মপাতায় জল একই বস্তু। মিত্তিরবাবু অবশ্য বলে থাকেন, "মানদা রে, তুই আমার ধম্মপত্নীই বটে। নেহাত লোকাচার— তাই সাতপাক ঘুরে তোকে বে কত্তে

পাল্লুম নে। তা তুই চিন্তে করিসনে, তোর আর সদুর সব ভার আমার।"

তবুও সদুর কথা মাঝে মাঝে ভেবে হয়রান হয় মানদা। সদু বা সৌদামিনীর অবশ্য সে-দিকে বেখেয়াল। সে আছে নিজের তালে। সারাদিন উড়নতুবড়ির মতো ঘুরে বেড়ায়। মানদার কাছে উবগার পায়নি এমন মেয়ে এ পট্টিতে নেই। তার উপর দ্বারিকবাবু আবার মিত্তিরদের একজন বড়ো খাতক। তাই মানদার উপর কথা বলবে এমন ধক মাসিরও নেই। সদু তাই কসবিপট্টিতে রয়েছে একটা মূর্তিমান বেহিসেব হয়ে।

বিধুমুখী আর ধর্মদাসের মৃত্যুর পর ভয়ানক কাণ্ড হতে পারত, দু'-দু'খানা লাশ পড়েছিল মাসির সাধের ঘরে, ভয়ানক ব্যাপারই বটে। কিন্তু দ্বারিকবাবু থানাদারকে পয়সা খাইয়ে ব্যাপারটা চেপে দিয়েছিল। পট্টিতে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল যদিও। সবার একটাই প্রশ্ন, কে এই ছুঁড়িটা, যার জন্য এরকম একখান প্রলয় বেঁধে গেছে! সৌদামিনীও তখনই কৌতূহলী হয়ে এসেছিল বিন্দুকে দেখতে। সেই শুরু। তারপর থেকে এ কয়মাসে দু'জনের সখ্য অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। রোজ অন্তত দুইবার বিন্দুর ঘরে টুঁ না মারলে সৌদামিনীর আজকাল চলে না।

এ ব্যাপারটা মাসির মোটেও পছন্দ নয়। এমনিতেই সৌদামিনীকে সে বিষনজরে দেখে। অনেক কষ্টে বিন্দু পথে এসেছে। মানদার আদরের দুলালির পাল্লায় পড়ে মেয়েটা আবার বিগড়ে না যায়, এইটেই মাসির ভয়। তবে মাসি সৌদামিনীকে কিছু বলতেও পারে না। অক্ষম আক্রোশে দেখতে থাকে দুই সখীর গুজগুজ ফুসফুস। তবে অনেক ভেবে মাসি শেষে একখান উপায় বার করেছে। লাহাবাবুই হবে মাসির সব সমস্যার সমাধান। লাহাবাবুকেই বিন্দুর প্রথম বাবু করে তুলতে হবে সরস্বতীপুজোর দিনে।

এর মধ্যে অনেক কথা আছে। লাহাবাবু আর মিত্তিরবাবুতে রেষারেষি অনেককালের। চামড়ার চালান নিয়ে ঝামেলা শুরু। এখন সেই ব্যবসার লড়াই গিয়ে ঠেকেছে বাইনাচ, দুর্গাপুজো, মোচ্ছবের ঘটাপটার রেষারেষিতে। মাসি খবর পাঠিয়েছিল লাহাবাবুর বাড়িতে। পিঁজরায় নতুন পাখি এসেছে। যদি বাবুর পছন্দ হয়ে যায় তা হলে মাসির আমদানি ভালোই হবে— আবার মানদা মাগি যে খুঁটির জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে আজকাল, সেই জোরটাও কমবে খানিক। সোদা আর বিন্দুতে মাখামাখিটাও কমবে যে, তা দিব্যি গেলে বলতে পারে মাসি।

বিন্দুকে অবিশ্যি প্রথমে লাহার পছন্দ হয়নি। বিন্দু মুখ নিচু করে কঠিন হয়ে

বসেছিল মাসির ঘরে। কিছুতেই মুখ তুলবে না। মাসি পিছন থেকে তার চুলের গোছে টান দিয়ে মাথা হেলিয়ে ধরে। লাহাবাবু গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল, "এ তো দেখি ব্যাটাছেলের মতো রকমসকম। কসবি মাগিরা ছেনালি না করলে আমার আবার পিরিতভাব জাগে না।" মাসি কান এঁটো করা হাসি দিয়ে উত্তর দিয়েছিল, "সে সব আজ্ঞা, হয়ে যাবে। এই শশীকলা আছে, শিকিয়ে-পড়িয়ে নেবে সব। কী রে শশী, বল না হারামজাদি।"

পিছন থেকে শশীকলা তড়বড় করে বলে, "সে আপনাকে কোনও চিন্তা করতে হবে না বাবুসায়েব, এই শশীর উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘর যান।" লাহাবাবু একটু দোনামোনা করেই বলেন, "তা বলছ যখন, দেখি একে রেখে। তা ছাড়া ওই শুয়োরের বাচ্চা মিত্তিরের যে-পাড়ায় বাঁধা মাগি আছে, সে-পাড়ায় আমার একখানা চাই বই-কি। আমার অবশ্য আছে হাড়কাটা, সিমলে, জানবাজারে একখান করে। তবু এ পাড়ায় একখান রাঁড় রাখা খুবই দরকার।"

বিন্দু এসব অবশ্য সদুকে বলেনি। এর মধ্যেই এই হাস্যমুখী মেয়েটিকে ভারী ভালোবেসে ফেলেছে সে। সদুকে দেখে মাঝে মাঝে বিন্দুর উমাশশীর কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্য কোথায় উমাশশী গ্রাম্য জড়বাক্ মেয়ে, আর কোথায় এই প্রগলভ সদু। কিন্তু সৌদামিনী কেন কে জানে, তাকে বোনের মতোই ভালোবাসে। আজ সেই সৌদামিনী এসেছে ফের, বিন্দু মুখ তুলে বলে, "আয় সদু, বোস। দিলি তো ওস্তাদকে ভাগিয়ে? আজ গানে বেশ মন লেগে গেছিল।" সৌদামিনী বয়সে খানিকটা বড়োই হবে, কিন্তু সদু বলেছে, 'না-হয় তুমি আমার দিদিই হলে, আমি তোমার বোন'— বিন্দু সহাস্যে মেনে নিয়েছে।

সদু মিটিমিটি হেসে বলে, "ওস্তাদ আর কদ্দিন? এবার যে তোমার নতুন ঘর হবে। এবার আর ওস্তাদ নয়, লাহাবাবু শুনবে তোমার গান।"

"খবর পেয়ে গেছিস?" বিন্দু কঠিন মুখে বলে।

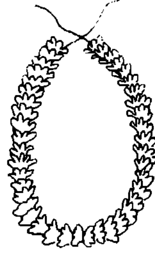
"তা আর পাব না? ঘরে ঘরে ওই কথা হচ্ছে যে গো বিন্দুদিদি!"

"ওই আশায় থাকুক সবাই। আমি এখানে থাকব না, চলে যাব ঠিক। পালিয়েই যাব।" বিন্দুর গলায় পুরোনো প্রত্যয়। বহুদিন বাদে যেন জেগে উঠেছে রঘুনাথ পণ্ডিতের মেয়ে বিন্দুবাসিনী।

"হায় কপাল, পালিয়ে আর যাবে কই? মাসি যে লাহাবাবুকে বলে দু'-দুটো মুশকো পাইককে মোতায়েন করেচে দুয়োরের সামনে, তা কি জানো না?" আক্ষেপভরে বলে

সৌদামিনী।

"পালাব, আমি পালাব ঠিক। দেখে নিস তুই সদু।" বিন্দু গোঁয়ারের মতো বলে। সৌদামিনী তাকিয়ে থাকে চুপ করে।



বারো

ভোর হচ্ছে। বিন্দু চুপিসারে উঠে পড়ল। আজ সরস্বতী পুজো। রঘুনাথ বাড়িতে পুজো করতেন। বিলু বিন্দুকেও ভোর ভোর উঠিয়ে দিতেন ঘুম থেকে। রঘুনাথের গম্ভীর গলায় মন্ত্রপাঠের সঙ্গে বিন্দু ঘুম চোখে দুলত, বলা ভালো ঢুলত। সে-সব যেন আজ আর কোনও জন্মের কথা। আজ বিন্দুর ঘর হবে, বাবু হবে, বরাত খুলে যাবে। এইসব কথা মাসি বেশ হেসে হেসে বলছে ক'দিন ধরে। সকালে পুজো, দুপুর থেকেই বাবু আর ইয়ারদের মদ-মাংসের মোচ্ছব আর তারপর রাত্রিবেলা লাহাবাবুর পা পড়বে বিন্দুর ঘরে। পাশে সৌদামিনী ঘুমোচ্ছে অঘোরে। কাল রাতে যখন সৌদামিনী এসে বলল, "আমি আজ বিন্দুদিদির সঙ্গে শুচ্চি এখেনে," বিন্দু খুশিই হয়েছিল। মাসির অবিশ্যি বিশেষ ভালোলাগেনি ব্যাপারটা। গত এক হপ্তা ধরে মাসি দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে রাখে। সৌদামিনী থাকলে সেটি আর হচ্ছে না। ব্যাজার হয়েই মাসি বলল, "তা বাছা থাকো তুমি, তোমার যকন ইচ্ছে হয়েচে। এই ছুঁড়িটারও একটু খেয়াল রেখো।" বিন্দুর খেয়াল রাখতেই এসেছে সৌদামিনী, সেটা বিন্দু জানে। বিন্দুর মুখে বারবার পালানোর কথা শুনে ভয় পেয়েছে মেয়েটা। তাই সঙ্গে থাকবে রাতটা, পাচ্ছে বিন্দু হুট করে কিছু করে বসে।

চুপিসারে উঠে খুব আস্তে করে দরজার পাল্লা খুলল বিন্দু। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে

আকাশ পুরো ফরসা হয়নি। রাতে হিম পড়েছে, চারদিক ঠান্ডা হয়ে আছে। সামান্য কুয়াশা জমে আছে বাইরে। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে বিন্দু। লাহাবাবুর পাইকদুটো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গলিতে পা রাখলে কিছুদূরেই গঙ্গা। নদীর ঘাটে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে একটা না একটা নৌকোয় কি উঠে পড়া যাবে না? বিন্দু সন্তর্পণে পাইক দুটোর মধ্যিখানে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

পোড়া কপাল তার। দরজায় হেলান দিয়ে সড়কি রেখেছিল কোনও একটা পাইক। গায়ের ধাক্কায় আড়া হয়ে পড়ল সেটা ধপাস করে। চারদিকে ভোরের নৈঃশব্দ্য, আওয়াজটা বেজায় জোরে বাজল এসে কানে। বিন্দু আর পিছনদিকে না তাকিয়ে দৌড়োচ্ছে। ঘুম ভেঙে উঠে একটা পাইক চিল্লাছে, "আবে ও রামভরোসা, ই লড়কি তো ভাগ গইল বা। উঠ, উঠ তু হারামখোর, জলদি উঠ।" পিছন থেকে ধপধপ করে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে বিন্দু। খুব কাছে চলে এল ওরা।

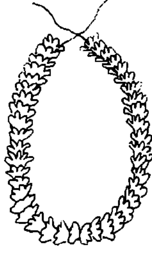
"আরে এ লড়কি, রুক যা অভি, রান্ড কাঁহিকি।" হাঁকতে হাঁকতে একজন বিন্দুর ঠিক পিছনেই চলে এসেছে। ভয়ে, উত্তেজনায় বিন্দুর মাথার ঠিক নেই। পায়ে ঠেকল একখানা বড়ো গোছের ঢেলা। সেইটে তুলে নিয়ে পিছন ঘুরে সে ছুড়ে মারল। পাইকটার চোখে গিয়ে লেগেছে ঢেলাটা। "বাপ" বলে সে চোখে হাত চেপে বসে পড়ল। মাটিতে থেবড়ে বসে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে, "মার ডালা রে। ই চুড়েইল হামকো মার ডালা।" অন্য পাইকটাও চলে এসেছে ততক্ষণে। এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে। ডানহাতে ধরা সড়কির মুখ মাটির দিকে।

মালিকের রাঁড় এই লড়কি। কিছু হয়ে গেলে তার নৌকরি চলে যাবে তো বটেই, মালিক থামে বেঁধে চাবুক মারবে— সে ভালোই জানে। এগোতে এগোতেই পিছন থেকে একটা হ্যাঁচকা টান খেয়ে পাইকটা থেমে গেল। সৌদামিনী। ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। একমুহূর্তেই সব বুঝতে পেরেছে চালাক মেয়েটা। পেয়াদাটার কোমরে বাঁধা লাল কাপড়টা টেনে ধরেছে আর চ্যাঁচাচ্ছে, "পালাও বিন্দুদিদি, পালাও।"

পাইকটা পিছনে ঘুরে সৌদামিনীকে দেখল, তার পরের মুহূর্তেই বাঁ-হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড একটা আঘাত করল মেয়েটার মুখে। অমন জোর একটা ঘা খেয়ে সৌদামিনী ঘুরে পড়ল। তবে আশ্চর্য, মেয়েটা মুঠি করে তখনও ধরে রেখেছে পাইকের কোমরের কাপড়। সেই টানে এবার একটু বেসামাল হয়ে পড়ল লোকটা, পিছনে হেলে গেল। পালিয়ে যাওয়ার এটাই সুযোগ।

দৌড়োতে গিয়েও থেমে গেল বিন্দু। পাইকটা সৌদামিনীর হাত ছাড়ানোর জন্য

লাথি মারছে, সৌদামিনী মার খাচ্ছে কিন্তু কাপড়টা ছাড়েনি। বিন্দুর মাথায় আগুন জ্বলে গেল। সে প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো মাথা নিচু করে ঢুঁসো মারল পাইকটাকে। পাইকটা অতর্কিত এই আক্রমণ আশা করেনি, এবার সে উল্টেই পড়ে গেল সৌদামিনীর পাশে। বিন্দু হাঁপাতে হাঁপাতে সৌদামিনীর দিকে হাত বাড়িয়েছে, ঠিক তখুনি পিছন থেকে মাথায় একটা সাংঘাতিক বাড়ি খেয়ে দড়াম করে পড়ল মাটিতে। জ্ঞান চলে যাওয়ার আগে দ্রুত বুজে আসতে থাকা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল মাসি এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে, পিছনে মানদাসুন্দরী।



তেরো

ছইয়ের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে সৌদামিনী গাড়োয়ানকে বলল, "বলি ও ভালোমানুষের পো, একটু হাত চালাও গো। এমনধারা চললে শ্যামনগর পৌঁছুতে বেলা গড়িয়ে যাবে তো। এতগুলো লোক রয়েছে, সকাল থেকে কেউ মুখে কুটোটি কাটেনি। এমন করলে তো চলবে না বাপু। বাবুদের বাড়ি পৌঁছে খাওয়াদাওয়া করতে হবে, একটুখানি জিরিয়ে নিতে হবে। ভূতের মতো বাপু আসরে নামতে পারবনি এই বলে দিলাম।"

গাড়োয়ান বুড়ো মানুষ। বহুদিন ধরে সে হরিবল্লভী বোষ্টমির দলকে নিয়ে যায় এদিক-ওদিক। সে নিরুদ্বেগে বলে, "তুমি দিদি মেছামেছি গোল করচ। কোনওদিন দেরি করিয়েচে তোমাদের এই সত্যবান দাস? তুমি ভেতরে গে বসো দিনি। বাইরে রোদ বড্ড। বিন্দুদিদিকে দ্যাকো একবার, কেমন নক্ষি মেয়ের মতো বসে আচে ভেতরে।"

নিরস্ত হয়ে সৌদামিনী ফের ছইয়ের ভিতরে মাথা ঢোকায়। সত্য গাড়োয়ান ঠিকই বলেছে। বিন্দু অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে বসে আছে ছইয়ের মধ্যে। ছইয়ের মধ্যে বিন্দুর পাশে সৌদামিনী। উল্টোদিকে গুরুমা অর্থাৎ হরিবল্লভী বোষ্টমি বসে। তার পাশে বসে নিস্তারিণী নাপতেনি পান সেজে দিচ্ছে গুরুমাকে আর অবিশ্রান্ত বকবক করে যাচ্ছে।

বিন্দুর দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় সৌদামিনী, এমন নিশ্চিন্দি খুশিমুখ যখন— ধরে নিতে হবে আজ আসর মাত হতে চলেছে। গত কয়েক বছরে এর অন্যথা হয়নি কখনও।

পাঁচটা বচ্ছর কেটে গেছে। পাঁচ বছর আগের সেই সরস্বতী পুজোর সকালে বিন্দুর চোখের সামনে যখন পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসছে, এসে দাঁড়িয়েছিল মাসি, আর তার পিছনেই মানদাসুন্দরী। এসেছিল মিত্তিরবাবুও। সমস্ত ঘটনাটা বুঝতে কোনওই অসুবিধা হয়নি কারও। সৌদামিনীকে বাঁচিয়েছে বিন্দু। মিত্তিরবাবু কী যে কলকাঠি নাড়ল, মাসি আর বিরক্ত করেনি বিন্দুকে। বিন্দু চলে এসেছিল মানদার বাড়ি, সৌদামিনী আর সে একসঙ্গে থাকবে। আশ্চর্যের ব্যাপার— লাহাও আর এ পাড়ায় আসেনি। মানদা পরে বলেছিল, "হবেনি কেন, মিন্টু সায়েবের[৫] সঙ্গে যে আমাদের মিত্তিরকত্তার খুব খাতির। ওই লাহার কি আর বদমায়েসির কমতি আচে? মিত্তিরকত্তা গিয়ে সায়েবরে ধরেচে, সায়েব লাহাকে ডেকে দিয়েচে ধমক। ব্যস, আর কী চাই?"

কথা সত্যি হোক বা না হোক, লাহার উপদ্রব বিন্দুকে আর সইতে হয়নি। আর মিত্তিরবাবু লোক বেজায় ভালো। বিন্দু আর সৌদামিনী, মেয়েদুটোকে হরিবল্লভী বোষ্টমির কাছে তালিম নিতে পাঠানোর কথা সেই বলে মানদাকে। হরিবল্লভী ছিল মিত্তিরবাবুর জ্যাঠার বাঁধা মেয়েমানুষ। সেই জ্যাঠা মারা গেলে হরিবল্লভী নেড়িগানের দল খোলে। এখন নাকি তার খুব নামডাক। গান শোনাতে চলে যায় কখনও গোবরডাঙা, কখনও চুঁচড়ো। মোকাম কলকেতায় তো হরবখত তার দলের বায়না হচ্ছে। মানদা সাত-পাঁচ ভেবে রাজি হয়ে যায়। এ পাড়ায় থাকলে মেয়েদুটোকে কদ্দিন আর বাঁচিয়ে-বুঁচিয়ে রাখা যাবে? মিত্তিরবাবু-ই বা কত করবে? তার চেয়ে কণ্ঠি নিয়ে বোষ্টম হয়ে নেড়িগানের দলে ভিড়লে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে। চাই-কি পরে বে-থা করে সংসারীও হওয়া যায়।

ব্যস, আর কী? বিন্দু আর সৌদামিনী চলে এল হরিবল্লভীর দলে। প্রথমে কণ্ঠি নিয়ে, তিলক কেটে, মন্তর নিয়ে বোষ্টম হতে হল। তারপর শুরু হল তালিম। হরিবল্লভীর ব্যবহার মিষ্টি আর মুখখানা গিন্নি গিন্নি হলে কী হবে, তালিমের সময় সে ভারী কড়া গুরুমা। চড়-থাপ্পড় তো আছেই, আর আছে তার সঙ্গে চোখে জল এনে দেওয়া বাক্যবাণ। সে-সব সইতে সইতেই বিন্দু মাস-ছয়েকে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠল। সৌদামিনী বরং একটু নিরেস, সময় লাগে তার পাঠ নিতে। বিন্দু ওদিকে গুরুমাকে থ করে নিখুঁত গায় কীর্তন। পুরোনো পদের গান তেমন চলে না আজকাল, লোকে

শুনতে চায় না। আজকাল কলকেতার কবিয়ালদের গানের চল বেশি। হরিবল্লভী অবাক হয়ে দেখে বিন্দু কী অবলীলায় জ্ঞানদাস[৬], গোবিন্দদাসের[৭] পদ গাইছে। বিন্দু অবশেষে যেন পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। কৃষ্ণনামের গানে মগ্ন হয়ে সে দিনরাত এক করে গেয়ে যায়।

বিন্দু নিজেও বুঝতে পারছে ক্রমে, গানেই তার মুক্তি। তবে প্রচলিত পদগুলির বোল আর সুর অসামান্য হলেও বিন্দু কোথাও কোথাও যেন কিছুটা অতৃপ্ত হয়ে পড়ছে আজকাল। একদিন দাওয়ায় বসে গুরুমার শিখিয়ে দেওয়া পদ গলায় তুলছিল সে গুনগুন করে। "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর/ প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" সাধক কবি জ্ঞানদাসের পদ। শয়ে শয়ে বছর ধরে এ গান মানুষকে উদ্বেল করে তুলেছে, প্রেমিককে বানিয়েছে পাগল। বিন্দুও মুগ্ধ হয়েই গায়, তবু সে নিজেই যেন উপলব্ধি করছে— তার গায়নে খামতি থেকে যাচ্ছে। সে পুরোপুরি একাত্ম হতে পারছে না কবিহৃদয়ের অনুভূতির সঙ্গে। কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে একটা। প্রেমের কথা তেমনভাবে আলোড়ন ফেলতে পারছে না গায়িকার মনে— যেমনটি হওয়ার কথা, যেমনটি গুরুমা নিজে গাইলে হয়।

বরং বিন্দু বেশি তন্ময় হয়ে যায় জ্ঞানদাসেরই অন্য একটি পদ গাইতে গিয়ে। "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,/ অনলে পুড়িয়া গেল/ অমিয় সাগরে সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল।" এই পদটির অন্তর্লীন তীব্র তীক্ষ্ণ বেদনা বিন্দুর হৃদয়ে সহজেই ঘর খুঁজে নেয়। গাইতে গাইতে বিন্দুর চোখ ভিজে ওঠে, গলা বুজে আসে। অসহ যন্ত্রণায় বুক খান-খান হয়ে যেতে থাকে। তবু বিন্দু গান থামায় না। কিন্তু সেই বিপুল বেদনার মধ্যে থেকে কখন যেন অলক্ষে একটি ক্ষোভ, একটি অনুযোগ উঠে এসেছে। কিন্তু তা কী করে গানের ছাঁচে ঢালবে বিন্দু? কবি তো সে হদিস দিয়ে যাননি। বিন্দু দিশাহীন পথিকের মতো অসহায় বোধ করে।

তবে দিশা পেয়েছিল বিন্দু। পেয়েছিল বহুপ্রত্যাশিত পথের সন্ধান। সেবার বারাসাতের বিশ্বাসদের ছোটোছেলের বিয়েতে বিন্দুকে আসরে নামিয়েছিল হরিবল্লভী। সখীসংবাদ অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ের গান হবে। চারদিকে লোকের ভিড় দেখে বিন্দু বেশ জড়োসড়ো হয়ে পড়েছে। দলের বাঁধনদার সুদর্শন সেই কবে তুলিয়ে দিয়েছে গানখানা, কিন্তু এত লোক তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে— বিন্দু প্রথমটায় ভেবলে গিয়েছিল। পিছন থেকে হরিবল্লভী ফিসফিস করে বলে, "কিছু চিন্তা করিসনে মা— তুই শুধু 'চিতেন'টা[৮] ধরে দে, বাকি আমরা সামলে দেব'খনে।" মনে

জোর এনে বিন্দু 'চিতেন' শুরু করে—

'বলি ওগো বাঁশিয়াল, কেমন এ ছল
বাঁশি দিয়ে ডাকো রাইয়ে পিরিতি প্রবল।
ঘোর অমানিশা আজ কালিন্দীর কূলে
রহিতে না পারি ঘরে, ছুটি লাজ ভুলে
কানাই নিঠুর ওগো নন্দের নন্দন
রাধার কলঙ্ক রটে ভরি বৃন্দাবন।'

নিখুঁতভাবে 'চিতেন'-পর্ব শেষ হয়। গানের নিয়ম মেনে এবার আসবে 'মহড়া'[৯], তার পরে 'অন্তরা'[১০]। অনেকে অবশ্য আজকাল 'মহড়া'তেই শেষ করে দেয়, 'অন্তরা'য় না গিয়ে নতুন গান ধরে। পিছন থেকে দলের লোকেরা খোল-কত্তাল-বাঁশি বাজাতে শুরু করেছে মহা উৎসাহে, নতুন মেয়েটা এত ভালো ধরবে গান— অনেকেই ভাবেনি। হরিবল্লভী ভাবে চমৎকার শুরু হল। লোকজন উদগ্র হয়ে শুনছে, এবার হরির কৃপায় 'মহড়া'টা উতরে গেলেই হয়। সুর তেমন কঠিন কিছু না, সুদর্শন 'মহড়া' অংশটা লিখেছেও চমৎকার। রাধা বলবে কলঙ্কের পরোয়া সে করে না, কৃষ্ণের জন্য কলঙ্কেও তার সুখ— লোকলজ্জার ভয় তার নেই। কৃষ্ণের জন্য সে ছেড়ে আসতে পারে সমাজ-সংসার-স্বজন। হরিবল্লভী আশা নিয়ে বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকে, মেয়েটা নিশ্চয়ই পারবে।

কিন্তু ওদিকে বিন্দু চুপ। সুদর্শনের লেখা তার মনে গেঁথে আছে। সে পঙ্‌ক্তিগুলিতে রাধার সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার আকুতি ঝরে পড়ছে। বিন্দু জানে এই পুরো আসর আকুল হয়ে শুনবে, গান তোলার সময় সে নিজেই দেখেছে সদু কাঁদছে ঝরঝর করে। কিন্তু বিন্দুর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না গান গাওয়ায়। সব হারিয়ে তো সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে আজ এই খোলা আসরে। হারিয়েছে বাবা, মা, দিদি, আশ্রয়। হারিয়েছে স্নেহ-মমতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা। হারিয়েছে বিধুদিদিকে। শুধু কি সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েই যাবে সে? জীবন কি শুধু সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় নিয়েই যাবে তার থেকে? সমাজ-সংসার-দুনিয়া যা করেছে অভাগী বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে, সেই একই কাজ নিলাজ নিঠুর কালাচাঁদ কেন করবে রাধিকার সঙ্গে?

বিন্দুর স্তব্ধতায় বাজনদারেরা অবাক, লোকজন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

একটা দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বিন্দু সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখ মুদে আকাশের দিকে হাত তুলে দিয়েছে সে, যেন প্রবল প্রতিস্পর্ধায় প্রতিবাদ করছে কোনও শাশ্বত অনাচারের। বিন্দু জানে না, বহুবছর আগে ও বহু ক্রোশ দূরে এক কিশোর বিদ্যার্থী এভাবেই দাঁড়িয়ে চরম বাগ্মিতার প্রমাণ দিয়েছিল। রামজয় ঠাকুর বেঁচে থাকলে বিন্দুকে দেখে বলতেন, "এই তো, এবার ঠিক বোঝা যাচ্ছে, বিন্দু আমাদের রঘুনাথদাদারই মেয়ে।"

বিন্দু গান ধরেছে। দর্শকরা গভীর মনোযোগে শুনছে। কিন্তু বাজনদারেরা সঙ্গত করতে গিয়ে থমকে গেল। চমকেছে হরিবল্লভীও। এ গান তো সুদর্শন বাঁধেনি। বিন্দু কি নিজে নিজেই গান বেঁধে গাইছে? কিন্তু বাজনার সঙ্গত না থাকলে মুশকিল, লোকে দুয়ো দেবে, কুকথা বলবে। গুরুমা'র ইশারায় পাকা ও অভিজ্ঞ বাজনদারেরা দ্রুত সামলে নিয়ে বাজাতে থাকে। বিন্দু তন্ময় হয়ে গায়—

'লোকে বলে কলঙ্কিনী, গালি দেয় সবে;
আমি বলি, এ কলঙ্ক মোর কেন হবে?
দিয়াছি তোমায় প্রেম, তনুমন? তাও।
বনমালী, আমার এ কলঙ্ক তুমি নাও।
রাধার প্রেমের সুখ চাহো নিরবধি
(তবু) রাধার কলঙ্ক ত্যাজো, এ কেমন বিধি?'

সে-দিন আসর ভাঙার পর অনেক রাতে বিন্দুকে শুধিয়েছিল হরিবল্লভী, "বিন্দু, এমন গান তুই বাঁধলি কী করে? তারপর আবার আসরের মদ্যিখানে?" কে একটা যাচ্ছিল কাঁচাপথ ধরে মশাল জ্বালিয়ে গান গাইতে গাইতে। অস্পষ্ট ভেসে আসছিল এককলি গান, 'রাধার কলঙ্ক ত্যাজো, এ কেমন বিধি?' আনমনে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসা সুরটা শুনতে শুনতে বিন্দু মৃদুস্বরে বলে, "কে জানে গুরুমা, মাথায় চলে এল হঠাৎ করেই। ব্যাটাছেলেদের দুনিয়া, মেয়েমানুষের তো কোনও দামই নেই এখানে। সব যখন জবরদস্তি করে নিয়েই নিচ্ছে, কলঙ্ক-ই বা ফেলে রাখবে কেন আমাদের জন্য, বলো?"

---

৫. লর্ড মিন্টো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা নিয়োজিত ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি বা

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির গভর্নর জেনারেল। চলতি কথায় বড়োলাট। কার্যকাল ১৮০৭-১৮১৩।

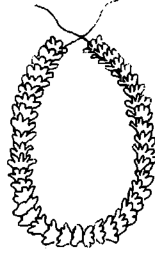
৬. জ্ঞানদাস ষোড়শ শতাব্দীর এক বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি, পদকর্তা।

৭. গোবিন্দদাস ষোড়শ শতাব্দীর আর-একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি, পদকর্তা।

৮. কবিগানের প্রারম্ভিক অংশ।

৯. কবিগানের মধ্য অংশ।

১০. কবিগানের অন্তিম অংশ।



চোদ্দো

কথাটা অবশ্য চাপা থাকেনি। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। হরিবল্লভীর নেড়িদের মধ্যে একখান ঝাঁঝালো ধানিলংকা এসেছে। দেখতে কিছু সরেস না হলেও তার গান করার ঢং নাকি বিলকুল আলাদা। নিজেই গান বেঁধে গাইতে পারে কচি ছুঁড়িটা। ধর্মদাস পাল একটা কথা ঠিক বলেছিল, কলকেতার বাবুদের মদ্দানি গোছের ছুঁড়িদের দেখে ভারী সুখ হয়। বিশ্বাসবাড়ির আসরের পর হরিবল্লভীর বরাত ফিরে গেল। বায়নার পর বায়না। কলকেতার বাবুদের সবার বিন্দু বোষ্টমির গান শোনা চাই। হরিবল্লভী খুশি।

বিন্দুর একটু কেমন কেমন লাগত প্রথমদিকে, সে পষ্টো বুঝতে পারত বাবুরা যত না গান শোনে— তার চেয়ে বেশি তার গা গতর চাটে চোখ দিয়ে। তবে একবার গানে ঢুকে পড়লে বিন্দুর আর ওসব খেয়াল থাকে না। নামগানের একটা শক্তি আছে— হরিবল্লভী বলে বটে, তবে বিন্দুর মনে হয়, শুধু যেন ঠাকুরের নামের শক্তি নয়, গান হল তার বলতে চাওয়া কথা। যেগুলো সে বলে উঠতে পারে না, সেই কথাগুলোই সুর হয়ে গান হয়ে বেরিয়ে আসে। যেমন এসেছিল সেই বিশ্বাসদের বাড়িতে। গান না করলে সেই কথা সেই কান্না জমে জমে তার বুক ফাটিয়ে দিত হয়তো।

এভাবেই গান করতে করতে কতগুলো বছর কেটে গেল। বিন্দুর বয়স সতেরো এখন, মাসি তাকে দেখলে হয়তো বলত 'সব্বো অঙ্গ ভত্তি যৈবন'। গোটা কলকেতা

তো বটেই, বিন্দু দলের সঙ্গে ঘুরে ফেলেছে কত কত মফস্‌সল। নিজেই সে বাঁধে গান এখন, মুখে মুখে, আসরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। তবু হায় তাকে কেউ কবিয়াল বলে না। মেয়েমানুষ সে, লিখতে-পড়তে জানে না— কবিয়াল হবে এমন ভাগ্যি তার নেই, সে হল নেড়িকবি[১১]।

আজ তাদের গানের বায়না শ্যামনগরের জমিদারবাড়িতে। জমিদারবাবুর ছেলের পৈতে, ভারী খরচাপাতি করছে বলে শোনা যাচ্ছে। নেড়িগানের পরে নাকি ভোলা ময়রা আর রাম বসুর কবিগানের লড়াই হবে। পুরো বাংলাদেশে রাম বসু আর ভোলা ময়রার লড়াই সুবিখ্যাত।

ভোলা ময়রা আর রাম বসু দু'জনেই একসময় হরু ঠাকুরের কাছে তালিম নিত। রাম বসু যখন নিজের গানের দল খুলল, হরু ঠাকুর নাকি ভারী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তারপর থেকে হরু ঠাকুর ভোলা ময়রাকে নিজের ভালো ভালো সমস্ত গান দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করলেন। আর ভোলা ময়রাও হরু ঠাকুরের সাহায্যে হয়ে উঠল অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল। কিন্তু ব্যাপারটা রাম বসুর মোটেই পছন্দ হল না। তাই আসরে ভোলা ময়রার সামনাসামনি হলেই দু'জনে প্রাণপণ করে লড়াইয়ে নামত। মজা হত শ্রোতাদের। এসব কথা সবাই জানে। তাই বিন্দু তো বটেই এমনকি গুরুমা হরিবল্লভীও মুখিয়ে রয়েছে ওই লড়াই দেখার জন্য। আগে ভালোয় ভালোয় তাদের গানের পালাটা মিটে যাক, তারপর জুত করে বসে দুই কবির ষাঁড়ের লড়াই দেখা যাবে, ভাবে বিন্দু।

শ্যামনগর পৌঁছোতে পৌঁছোতে বেলা গড়িয়ে গেল। পথে দমদমার কাছে অবিশ্যি গাড়ি থামিয়ে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে— সুতরাং খুব বেশি তাড়া নেই। জমিদারবাড়িটা গাড়িচলার রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে। বড়ো পেয়ারাবাগানেই পিছনে সরু রাস্তার শেষে হঠাৎ করেই অনেকটা খোলা মাঠ। মাঠের পরে একটা বিশাল দিঘি। দিঘির পিছনেই মস্ত দোতলা জমিদারবাড়ি। এই মাঠেই তবে আসর বসবে। মেয়েদের জন্য বাড়ির একটা মহল ছেড়ে দিয়েছে না জমিদারবাবু। বিশ্রাম সেরে-টেরে হরিবল্লভী হাঁক দিয়ে উঠল, "ওরে ছুঁড়িগুলো, গতর তোল দিকি। যা যা তৈরি হয়ে নে সব। আমি ওদিকে গিয়ে দেখি বাজিয়েগুলোর কী অবস্থা। আর অ্যাই সদু, ধরতাই দেওয়ার সময় মিউ মিউ করবিনে একদম— এই বলে দিলুম। গেল-হপ্তায় বোসপুকুরের গাওনাতে কী যে বললি শুনতেই পেলুম নে। যা যা তুই আর বিন্দু সেজে নে বরং এইবেলা।"

এমনসময় দরজার বাইরে থেকে মনোহর তাম্বুলীকে দেখা গেল উঁকিঝুঁকি মারতে। মনোহরের বয়স আন্দাজ করা মুশকিল, চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে যে-কোনও কিছুই

হতে পারে। দীর্ঘদেহী মনোহর সামান্য ঝুঁকে হাঁটে— দলের মেয়েরা তার নাম দিয়েছে কুঁজো মনোহর। মনোহর হাতের ইশারায় হরিবল্লভীকে ডাকল। হরিবল্লভী চৌকাঠের ধারে গিয়ে বলল, "কী ব্যাপার? এখন দিক কোরো না তো, যাও এখন।" মনোহর দীর্ঘদিন ধরে দলের হিসেবপত্তর সামলায়। বায়না আনা, আগাম নেওয়া, গাওনার বন্দোবস্ত করা— সবকিছুই তার একার হাতে। এমনিতে তার মাথা খুবই ঠান্ডা, কিন্তু এখন বেজায় উদ্বিগ্ন হয়ে সে বলল, "ইয়ে মানে একটা গন্ডগোল হয়েছে। ভোলা ময়রার শরীর খুব খারাপ। তিনি আসতে পারেননি। ইদিকে কলকেতা থেকে জোঁড়াসাঁকো, পাথুরেঘাটা, জানবাজারের বাবুরা সব এয়েচেন। তেনাদের তো আর কবির লহর না দেকিয়ে ফেরত পাঠানো যায় নাকো।"

"কী সব্বোনাশ! এখন কী উপায় হবে?"

"মানে তোমরা যদি রাজি থাকো, তা হলে তোমাদের নিয়ে বসুজা-র সঙ্গে একটা গাওনার ব্যাবোস্তা করা যায়। জমিদারমশায়ও তাই কয়েচেন, বাবুদেরও দেকচি তেমনই ভাব।" মনোহর মাথা চুলকে বলে।

"তোমার কী শেষে বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরল মনোহরবাবু? আমরা সামান্যি নেড়িগান করে খাই, রাম বসুর সঙ্গে আমরা পারব কেন? আর তা ছাড়া এখন এসব বলছ এসে, আমাদের চাপান-উতোরের[১২] সওয়াল-জবাব তো বসুজার সঙ্গে বলা-কওয়া করে রাখা হয়নি। 'বাঁধুটী'[১৩] তবে হবেনেকো। আসরে বসে চাপান-কাটান তৈরি করে গাইতে হবে। মানে গাওনা হবে 'উপস্থিতি'[১৪] ঢঙে। রাম বসু 'উপস্থিতি'র ওস্তাদ। না না, সে হবেনিকো। আর তা ছাড়া ব্যাটাছেলের সঙ্গে মেয়েমানুষ লড়বে? ঘেন্না ঘেন্না। এ আবার হয় নাকি?"

"আমিও তাই কইলাম বাবুদের। কিন্তু সবাই একেবারে চুর হয়ে আছে মদে। আমার কোনও কথা কেউ শুনলনি। উল্টে শাসিয়ে দিল, না গাইলে আমরা মোকাম কলকেতার কোথাও আর বায়না পাবনি কক্ষনো।" একমুহূর্ত চুপ করে থেকে হরিবল্লভী বলল, "বেশ। ওরে ও সদু। বিন্দুকে বেশ করে সাজা। আর শোনো তাম্বুলীর পো। শুধু উতোর-চাপান হবে সখীসংবাদের গানে। খেউড়[১৫] এক্কেরে নয়। বিন্দু আমাদের বাচ্চা মেয়ে। ওর সঙ্গে সে-সব আমি হতে দেবনি। কোনওমতেই না।" নিশ্চিন্তির একটা শ্বাস ফেলে মনোহর বলল, "সে তো বটেই। সে তো একশোবার। আমি গে বাবুদের বলে আসি তবে।"

কথাটা শুনে বিন্দু ভয় পায়নি। বেশ অন্যরকম উত্তেজনা হচ্ছিল তার। সৌদামিনী

ওদিকে ঘেমে-নেয়ে কেঁপে-টেপে একশা। শেষে বিন্দুকেই বলতে হল, "আ মোলো যা, অমন জ্বরো রুগির মতো কাঁপিস কেন?" সৌদামিনী বোষ্টমমতের দীক্ষা ভুলে-টুলে বলে উঠল, "হেই গো মা কালী, জোড়া পাঁঠা মানত করচি, বিন্দুকে একটু দেখো মা।" বিন্দু হাসতে হাসতে আসরের দিকে এগোয়। ওদিকে রাম বসুও প্রথমে রাজি ছিল না। কিন্তু এতজন বাবুর শাসানি— তাকেও তো গান বেচেই খেতে হয়। তার উপর যদি বায়নাগুলো সব ভোলা ময়রা, ভবানী বণিক বা নিতে বৈরাগীর কাছে চলে যেতে থাকে— রাম বসুকে কলকেতা থেকেই পাততাড়ি গুটোতে হবে। নিমরাজি হয়ে ব্যাজার মুখে রাম এসে দাঁড়ায় আলোকিত আসরের মাঝখানে।

বিন্দু মন দিয়ে দেখছিল রাম বসুকে। ত্রিশ-বত্রিশের স্বাস্থ্যবান যুবক। গৌরবর্ণ। মুখে স্বাভাবিক স্মিত হাসি একখানা। চোখের তারায় সম্ভবত কৌতুকের ঝিলিক। বেশ সুপুরুষ এই কবিয়াল। রামও দেখছিল বিন্দুকে। তবে অবাক হয়ে। এই মেয়ে লড়বে তার সঙ্গে? সে ভেবেছিল ভারিক্কি বয়স্কা কোনও বোষ্টমি এসে দাঁড়াবে আসরে। এই মেয়ে তো নিতান্তই ছুকরি। বেশ শক্ত গড়ন-পেটন। মুখের ভাবে একটা পুরুষালি কাঠিন্য। দীর্ঘ চুল খোঁপায় বেঁধে রেখেছে একখানি ফুলের মালা জড়িয়ে। দুই কানে দু'টি মাকড়ি আর গলায় একখানি মুড়কিমালা। আর চোখদুটো অসম্ভব ধারালো। ওদিকে বাবুরা সব হল্লা করতে শুরু করে দিয়েছে। আসরবন্দনার পর গান শুরু হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাম বসুর ফের একবার অবাক হওয়ার পালা। সখীসংবাদে বিন্দু গোপী সেজে কৃষ্ণের নামে অভিযোগ করছে রাধাকে ছেড়ে মথুরা চলে যাওয়ার জন্য। রাম বসু কৃষ্ণ সেজে সে-সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করছে। রাম অবাক হয়ে দেখল মেয়েটা যে শুধু সমানে সমানে জবাব দিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, বেশ চটপট করে ঘোরালো প্রশ্নের খোঁচাও মেরে দিচ্ছে। খুব সাবধানে সন্তর্পণে চাপান-উত্তর এগিয়ে নিয়ে যায় সে। কথা হয়েছিল খেউড়, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা গালাগালি হবে না। রামের তেমন ইচ্ছেও ছিল না, কিন্তু মেয়েটা ক্রমাগত কোণঠাসা করে ফেলছে তাকে। একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে বেশ চোখা আক্রমণ করে বিন্দুকে—

'যেমন বিন্দু বিন্দু জল জমলে সাগর হতে লাখ বছর
বিন্দু রে তোর গানের গুঁতোয় দিব্যি সেটা হয় গোচর
গুরু আমার হরু ঠাকুর, আমার শিরে তাঁরই হাত
কায়েতেরই ব্যাটা আমি, বল-রে বিন্দু তুই কী জাত?

গুরুর নাম বল রে বেটি, কোন গুরুতে তালিম তোর?
না জানিলে বলবে সবাই, বিন্দু নেড়ি জুয়াচোর।'

হরিবল্লভীর মাথায় আগুন জ্বলে যায়। পাশে বসা মনোহরকে সে রুষ্টভাবে বলে, "খেউড় চলবে না, সেটা বলে দাওনি তুমি বসুজাকে?" মনোহর কি একটা বলতে যায় কিন্তু বাবুদের মত্ত হর্ষোল্লাসে তার কথা ডুবে যায়। সবার চোখ এখন বিন্দুর দিকে, এ খেলা আর থামানো যাবে না। প্রমাদ গোনে হরিবল্লভী। কিন্তু বিন্দুর উপর আজ কবিরাজ গোঁজলা গুঁই ভর করেছেন বোধহয়। একটুও না রেগে, উত্তেজিত না হয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে উত্তর দেয়—

'ভ্যালা রে মোর রামচন্দ্র, (তোমার) হাল জানতে নাইকো বাকি
তোমার গুরু হরু ঠাকুর তোমায় দেছেন মস্ত ফাঁকি
রামের মতোই তোমার কপাল, হক্কের ভাগ তোমার নাই
ভরত তো তাও ভালো ছিল, তোমার শনি গুরুভাই।'

তারপর রামের দোহার আর বাজিয়েদের দিকে হাত দেখিয়ে বলে—

'বানর সেনা নিয়ে কি তাই একাই এলে নির্বাসনে?
হায় রে কপাল সীতার মতো কেউ জোটেনি তোমার সনে?'

সমস্ত শ্রোতা এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। পাথুরেঘাটার শীলবাবু পাশে বসা জমিদারবাবুকে বললেন, "এতদিনে রাম বসুর জুড়ি পাওয়া গেল। এমন বেকুব ব্যাটা কোনওদিন হয়নি। তাও নাকি একটা মেয়েছেলে, নেড়ির দলের ছুঁড়ি একটা। শ্রীরামপুরের গঙ্গাকিশোর ভট্চাজ কলকেতায় সম্প্রতি একখানি কাগজ বার করেছে[১৬]। এ তারই উপযুক্ত খবর বটে।" ওদিকে রাম হকচকিয়ে গিয়েছিল বললেও কম বলা হয়। তবে তার নামও রাম বসু, গত পনেরো বছর ধরে সে কবিগান গাইছে— সামলে নিয়ে সে ফের আক্রমণ করে, এবার ভীষণতর—

‘সীতার খোঁজেই এসেছিলাম, সীতা ছাড়া জীবন ফাঁকা
শ্যামনগরে দেখতে পেলাম দাঁড়িয়ে আছে শূর্পণখা।
শূর্পণখা ছদ্মবেশী এ কথা তো জানিই আমি
আজকে দেখি রাক্ষসীটা সেজেছে-রে এক বোষ্টমি।’

দোহারের দল প্রবল উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, “আজকে দেখি রাক্ষসীটা সেজেছে-রে এক বোষ্টমি।” আকস্মিক আঘাতে বিন্দু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। তার রূপের অভাব নিয়ে যে প্রকাশ্যে এভাবে নিষ্ঠুর বিদ্রুপ কেউ করতে পারে, সে ভাবতে পারেনি।

থরথর করে কেঁপে উঠল সে, পায়ে যেন জোর নেই আর একটুও— বসে পড়ল। ওদিকে বাবুরা তীব্র অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছে। বাজনদারেরা কাঁধে তুলে নিয়েছে রাম বসুকে। হরিবল্লভী ধীরে ধীরে এসে বিন্দুকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে। মুখে কথা নেই। বিন্দু গুরুমার কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠল। চোখ থেকে অঝোর ধারায় নেমে আসছে জল। তাই বিন্দু দেখতে পেল না রাম বসুর দু’টি উজ্জ্বল চোখ তাকে লক্ষ করে যাচ্ছে।

---

১১. মহিলা বৈষ্ণব কীর্তনিয়া। এঁরা দল বেঁধে গান করে বেড়াতেন। সেই গানকে নেড়িগান বলা হত।

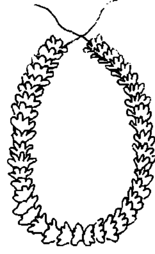
১২. দুই প্রতিপক্ষ কবিয়ালের মধ্যে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন উত্তর ও প্রতিপ্রশ্নের লড়াই।

১৩. যদি দু’পক্ষের কবিয়ালরা আগে থেকে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে চাপান-উতোরের প্রশ্ন ও উত্তর তৈরি করে রেখে তারপর আসরে এসে গাইত, তাকে ‘বাঁধুটী’ বলা হত।

১৪. আসরে দাঁড়িয়েই যদি তাৎক্ষণিকভাবে মুখে মুখে গান তৈরি করে গাওয়া হয়, তাকে বলে ‘উপস্থিতি’।

১৫. কবিগানে যদি অশ্লীল বা আদিরসাত্মক বিষয় উঠে আসে, অথবা কবিয়াল প্রতিপক্ষকে ওইধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন, তাকে বলে ‘খেঁড়ু’ বা ‘খেউড়’। .

১৬. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮৩১) ছিলেন প্রথম বাঙালি প্রকাশক, মুদ্রক ও পত্রিকা-সম্পাদক। তিনি ‘বাঙ্গাল গেজেট’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।



পনেরো

নেড়িদের দলের একটা ছুঁড়ি রাম বসুকে জোর টক্কর দিয়েছে এই কথাটা কলকেতায় ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মতো। রামের জুটল টিটকিরি— ভোলা ময়রা দু'টি গাওনায় তীব্র বিদ্রুপ করল তাকে। কিন্তু রাম বসু যেন সে-সব গায়ে মাখছে না। শুধু কী তাই? বিন্দুর নামগানের আসরেও মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগল তাকে।

ওদিকে বিন্দুর নাম ফের বাবুদের মধ্যে আলোচনার একটা বিষয় হয়ে উঠেছে। পোস্তার বসাকদের বড়ো তরফের মেজো ছেলে তো সোজা চলে এল হরিবল্লভীর ঘরে, বিন্দুকে সে রাখবে। এমন গাইয়ে মেয়েছেলেকে বাঁধা রাঁড় রাখলে নাকি সমাজে তার প্রভাব প্রতিপত্তি হু-হু করে বাড়বে। বদলে যত চাই, তত টাকা দিতে সে রাজি আছে। বসাকের ব্যাটাকে অবিশ্যি হরিবল্লভী সঙ্গে সঙ্গেই হাঁকিয়ে দিয়েছে।

তবে বিন্দুর বিষয়েও সে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। আজকাল গানে যেন মেয়েটার মন নেই। রাম বসুর অপমানটা খুব লেগেছে মেয়েটার। তার উপর ওই রামব্যাটা আজকাল বিন্দুর আসরগুলোতে এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে— হরিবল্লভীর চোখ এড়ায়নি। সবার শেষে চুপিচুপি এসে জোটে, একধারে বসে থাকে নিশ্চুপে। আসর শেষে সবার আগে উঠে চট করে কেটে পড়ে। ব্যাটার কী মতলব কে জানে?

সে-দিন চিৎপুরে লক্ষণ ধরের ছেলের অন্নপ্রাশনে বিন্দুর গাওনা ছিল। লোক

বিশেষ হয়নি— অনুষ্ঠানও ছোটো। বিন্দু তাড়াতাড়ি শেষ করে বেরিয়ে এল। ভরা বিকেল তখন। সঙ্গে সৌদামিনী ও নিস্তারিণীও ছিল। হরিবল্লভী আজকাল এসব ছোটোখাটো আসরে আসে না— বয়েস হচ্ছে। বিন্দু বাকিদের বলল, "তোরা ফিরে যা ভাই, আমি একটু গাঙের হাওয়া খেয়ে আসি।" সৌদামিনী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, বিন্দু তাকে বাধা দিয়ে বলল, "চিন্তা করিস না সদু। আমার কিচ্ছুটি ভয় নেই। রাক্ষসী যে আমি, জানিস নে বুঝি?" বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল। সৌদামিনী ব্যথিত মুখে চেয়ে রইল। রাম বসুর কথাগুলো বিন্দু ভুলতে পারেনি।

ভুলতে সত্যিই পারেনি বিন্দু। ভরা আসরে রামের তীক্ষ্ণধার বিদ্রুপ বিন্দুর মর্ম ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তার উপরে সে-দিন সেই বিদ্রুপের কোনও জুতসই জবাবও দিতে পারেনি, এতটাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। হারের চেয়েও সেইটে বিন্দুর গায়ে লেগেছে বেশি। বিন্দু হার সহ্য করতে পারে না। বিন্দু জিততে চায় এখন সবসময়। তবু রাগ নয় ঠিক, অন্য কী যেন একটা অনুভূতি হচ্ছে বিন্দুর। বুকভাঙা সেই অনুভূতি যেন রাগের মতো হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে না, বরং হৃদয়ের দু'কূল ছাপিয়ে মাঝে মাঝে মগ্ন করে দিচ্ছে বিন্দুর বোধচৈতন্য।

বিন্দুর এবার রাগ হচ্ছে নিজের উপর। ওই লোকটার উপর সে রাগ করতে পারছে না কেন? চরম অসোয়াস্তিতে ছটফট করে বিন্দু। মাথা থেকে কিছুতেই মুছে ফেলা যাচ্ছে না লোকটার চেহারা, চওড়া হাসি। আর যতবার মনে পড়ছে ততবার গলায় উঠে আসছে একটা ব্যথা, চোখের কোণে চলে আসছে জল। ভারী মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

একে তার এই অবস্থা, তার উপর সেই বিচ্ছিরি লোকটা আজকাল তার আসর হলেই কোত্থেকে যেন উদয় হয়। বুদ্ধির ঢেঁকি একেবারে। ভেবেছে মুখে মাথায় কাপড় জড়িয়ে আসলে যেন বিন্দু টের পাবে না। বিন্দুবাসিনী কি তেমনই বোকা নাকি? দেখতেই সে চিনে নিয়েছে। প্রথম দিন ভারী অবাক হয়েছিল, আর রাগও হয়েছিল অনেকটা। রাক্ষসীর গান শুনতে এসেছে কেন এই লোকটা?

বিন্দু ভেবেছিল খুঁত ধরতে এসেছে বুঝি সবজান্তাটা। নিজের অজান্তেই সে আড়ষ্ট হয়ে গেছিল। গানের প্রথমদিকে সে আড়ষ্টতা ফুটে উঠছিল বারবার তার গলায়, সুরে। তবে তারপরেই বিন্দু ফের সতর্ক হয়। ওই রাম বসুর জন্য সে নিজের গান খারাপ হতে দেবে না মোট্টেও। মনে জোর এনে সে তন্ময় হয়ে গান এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে রাম বসু নিশ্চুপই ছিল। গান শেষ করে বিন্দু চোখ চেয়ে দেখে কখন যেন উঠে গেছে

লোকটা।

সেই শুরু। গত কয়েক মাস ধরে যেখানে বিন্দুর গান, সেখানে রাম বসু। ক্রমে বিন্দুর একরকম অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল ব্যাপারখানা। নিজের অজান্তেই যেন বেয়াড়া চোখ দুটো আজকাল আসরে গান শুরুর আগে ওই লোকটাকেই খোঁজে। আবার যখন দেখে ঠিক নিয়মমাফিক এককোণে এসে বসে আছে কবিয়াল, বিন্দু অপ্রস্তুতও হয় ভারী। তারপর সে গান শুরু করে, একটু নিশ্চিন্তির ভাব নিয়েই বুঝি বা।

আজ লক্ষ্মণ ধরের বাড়ির আসরেও বিন্দুর অবাধ্য চোখ দুটো খুঁজছিল রামকে। পায়নি। রাম আসেনি। বিন্দু উসখুস করছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে আসর বন্দনার। সদুর আলতো খোঁচায় ধাতস্থ হয় বিন্দু। সে খামোখা ওই বাজে লোকটার কথা ভেবে এমন করছে কেন? যত্তোসব। তবে গান জমেনি। বিন্দু সেটা নিজেও বুঝতে পারছিল। বায়না করে টাকা দিয়ে যায় বাবুরা জমাটি আসরের জন্য। এই আসর, এই গাওনা হল দলের রুজিরুটি। বিন্দু তা অবহেলা করে ফেলেছে আজ। লজ্জা লজ্জা। সব দোষ ওই বিচ্ছিরি লোকটার। ক্রমে আবার সেই অজানা অচেনা অনুভূতিটা দখল নিতে থাকে বিন্দুর মনের। সে ভাবে খোলা হাওয়ায় একটু হেঁটে বেড়ালে হয়তো ভালো লাগবে।

গঙ্গার ধারে প্রায় চলেই এসেছে এমন সময় একটা ভুজাওয়ালার দোকানের পাশ থেকে রাম বসু বেরিয়ে এল। হুট করে একটা ঢ্যাঙা লোককে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে একটু হকচকিয়েই গিয়েছিল বিন্দু। যদিও চারদিকে ফুটফুট করছে আলো, ভয়ের কিছু নেই। তারপর ভালো করে চেয়ে দেখল মুখে হাসি নিয়ে রাম বসু দাঁড়িয়ে, দুই হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করা। ও, আসরে আসা হয়নি— কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা হচ্ছিল তবে? নির্ঘাত আবার অপমান করতে এসেছে লোকটা। সবার সামনে করেনি এবার, একলা বলতে এসেছে কিছু। ইশ, দয়ার সাগর একেবারে। বিন্দু দয়া চায় না। ভিখিরি নয় সে।

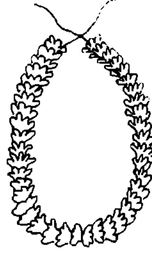
ঝামটা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলেই যাচ্ছিল বিন্দু, পিছন থেকে রামের ভরাট গলা শুনতে পেল, “আমি কিন্তু তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছিলাম।” দাঁড়াতে হল। বেশ তীব্র ঝাঁঝালো স্বরে বিন্দু বলল, “মাপ চাইবেন কেন? শূর্পণখার নাক-কান কেটে দিয়েছেন তাই? বেশ করেছেন। মাপ চাইবার কী আছে? মেয়েমানুষের সঙ্গে তো এমনই করেন পুরুষেরা। দশরথপুত্র বলুন বা আপনি, দু'জনেই শুধু পুরুষের ধর্ম পালন করেছেন।” বলতে বলতে বিন্দু টের পেল বুকের ভেতর ঘনিয়ে আসছে আবার সেই বানভাসি ব্যথা। গলা বুজে আসছে কেন তার? এ মা ছিঃ, চোখের কোলে

জল উপচে এসেছে যে! বোকা বিন্দু জানে না, একে অভিমান বলে।

রাম বসুর মুখে হাসিটি অমলিন, "তোমাকে অমন করে আঘাত করা আমায় অন্যায় হয়েছে মানছি, কিন্তু তুমি কিন্তু আমায় মাত দিতে পারতে— যদি সামলে নিতে নিজেকে। আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কবিয়াল তো অপেক্ষা করবে কেমন করে অন্যজনকে রাগিয়ে দিয়ে নিজে খেলা ঘোরানোর জন্য। আমি তোমায় উত্তর দিতে গিয়ে নিজেও সংযম হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার তুমি করতে পারোনি," একটানে এতগুলো কথা বলে থেমেছে কবিয়াল, চেয়ে আছে বিন্দুর মুখের দিকে। সে-দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের ধারালো হিংস্রতা নেই, রয়েছে শান্ত সখ্যের আভাস।

বিন্দু ভারী অবাক হয়ে অদ্ভুত এই লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। রামের সে-চাউনির দিকে তাকিয়ে বিন্দুর গা কেমন শিরশির করে উঠল। দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু বিন্দু জানে তার কান আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিল বিন্দু। অকারণেই কাপড়ের খুঁট ধরে আঙুলে পাকাতে পাকাতে খুব মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "সে-সব কেমন করে করতে হয়?" রাম বসুর দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মুখের হাসি আরও চওড়া। সে বলল, "চাও তো আমি শেখাতে পারি, শিখবে তুমি?" বিন্দুর বুক টিপ-টিপ করছে। ভয়ে। বিস্ময়ে। আনন্দে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল রাম তখনও তার দিকে উৎসুক হয়ে চেয়ে রয়েছে। বিন্দু ঘাড় অল্প কাত করল— শিখবে। "তা হলে কাল বিকেলবেলা বাগবাজারের ঘাটে এসো বিকেল-বিকেল।" এইটুকু বলে যেমন এসেছিল হঠাৎ, তেমন করেই চলে গেল কবিয়াল।

সে-দিন রাতে বিন্দুর ঘুম হল না। অজানা ভয়, শঙ্কা আর একটা অন্যরকম আনন্দ তাকে ঘিরে ধরেছে। পরেরদিন সারাবেলা সে অপেক্ষা করল বিকেলের জন্য। গান তোলায় মন দিতে পারল না কিছুতেই। সুরে ভুল হল অনেকবার। গুরুমার ধাতানিও খেল। কিন্তু বিন্দুর মন আজ পড়ে রয়েছে বিকেলবেলার জন্য অধীর আগ্রহে। বিকেলে ঘাটে পৌঁছে দেখে একখানা নৌকার উপর বসে আছে রাম, নৌকা ঘাটের গায়ে লাগানো। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই রাম তাড়া দেয়, "চলে এস বোষ্টমি, হাওয়া খেতে খেতে গান করা যাবে'খন।" অল্প ইতস্তত করে বিন্দু নৌকায় ওঠে। রাম হাত বাড়িয়ে ধরেছে। সেই হাতে হাত রাখতেই বিন্দু শিউরে উঠল একবার, তারপর আঁকড়ে ধরে চওড়া শক্ত সেই হাতটা।



ষোলো

'একবার ডেকো সুরেতে বাঁশিতে, ডেকো মোরে শ্যামরায়
চেয়ে দেখো কালা, অভাগিনী রাধা তোমারেই শুধু চায়।
যশোদাদুলাল ওগো দয়াময়, তুমি যে দিশারি আঁধারে
তুমি কাণ্ডারি, তুমি ত্রাণকারী, তোমারই এ ভব মাঝারে।
অবোধ এ আমি, তুমি অন্তর্যামী, অবলার মুখে দাও ভাষ
তোমারই ব্যাখান তোমাকেই করি, জুড়ি বৎসর দিন মাস।'

তন্ময় হয়ে নিজেরই বানানো একটা পদ গাইছিল বিন্দু। গালে হাত রেখে শুনছিল রাম। দু'জনের নৌকাভ্রমণ সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় প্রাত্যহিক হয়ে গেছে। বেড়েছে নৌকাভ্রমণের সময়ও। আজকে নৌকা চলে এসেছে সায়েবদের কেল্লার কাছাকাছি প্রায়। নৌকার মাঝি রামের চেনা। সে হাল ধরে বসে আছে নিশ্চুপ। বিকেলে গঙ্গার বুকে নৌকো করে হাওয়া কেটে বেরিয়েছে অনেক ক'টা সায়েব-মেম। কয়েকটা দেশি বাবুদের নৌকাও রয়েছে। বাতাস বইছে হালকা হালকা। সেই হাওয়ায় বিন্দুর চুল উড়ে এসে পড়ছে তার মুখে, গাইতে গাইতে আনমনে হাত দিয়ে সে সরিয়ে দিচ্ছে সেই চূর্ণকুন্তল। রাম মুগ্ধ হয়ে দেখছে।

রাম বসু নামজাদা কবিয়াল। হারু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য ছিল একসময়। ভোলা ময়রা যদি কোনও কবিয়ালের কবিপ্রতিভার সম্মান করে, তবে তা রাম বসুর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার। এসব অকারণে নয়। রাম বসু সত্যিই অনন্য কবি। শব্দ সুর তাল ছন্দ যেন সর্বদাই তার অনুগত। সেই কবিকুলচূড়ামণি রাম বসু বিকেলের পড়ন্ত আলোয় অবাক হয়ে দেখছে মগ্ন হয়ে গাইতে থাকা বিন্দুকে, তার মনে হচ্ছে তার সামনে বসে থাকা এই অষ্টাদশী যেন স্বয়ং মূর্তিমান এক প্রেমকাব্য। হ্যাঁ, প্রেম। এই একগুঁয়ে জেদি তরুণীটির প্রেমে পড়েছে রাম বসু।

পড়েছে প্রথম দিন থেকেই। শ্যামনগরের আসরে বিন্দুর তেজী মূর্তি দেখে তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল। মেয়েটি যেন এই মরলোকের কেউ নয়, যেন কোনও দৈবশক্তির প্রকাশ হয়েছে এই পুরুষালি ছাঁদের মেয়েটির মধ্যে। সেই থেকে রাম বসু আর রইল না রাম বসু। প্রেমাহত কিশোরের মতো সে ছুটে বেড়িয়েছে বিন্দুবাসিনীর এক আসর থেকে অন্য আসরে। শেষে সাহস সঞ্চয় করে সে-দিন রাস্তায় সে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় বিন্দুর। তার পরেও তো কেটে গেছে কতগুলো দিন। রাম বসুর মুগ্ধতা দিন দিন বেড়েছে বই কমেনি। এর মাঝে বিন্দুকে সে সাহায্য করেছে কবিগানে আরও তুখোড় হয়ে উঠতে— তার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছে, খামতিগুলোকে চিহ্নিত করেছে। একসঙ্গে কাটিয়েছে বহু সময়। তবুও মনের কথাটা তার আর বলে ওঠা হয়নি বিন্দুকে।

দিনের পর দিন এই নৌকোর বুকে বসে হাত-পা নেড়ে রাম বিন্দুকে কবির লড়ায়ের নীতিরীতি শিখিয়েছে, বাতলেছে নানারকম কৌশল। বিন্দু অবাক হয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছে। বাধ্য ছাত্রীর মতো বুঝে নিয়েছে লহরের নানা মারপ্যাঁচ। যদিও কখনও তার কাজে লাগবে না এসব, বোষ্টমি নেড়িকবিকে কে-ই বা জায়গা দেবে কবিয়ালদের আসরে? তবুও রাম শেখায়, তবুও বিন্দু শেখে। বলতে নেই, বিন্দুর মতো ছাত্রী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। দলের ছেলেছোকরাদেরও তো এভাবেই শেখানোর চেষ্টা করেছে রাম কতবার। মাথামোটার দল। একটা কথা যদি কানে ঢোকে। রামের মাঝেমধ্যে মনে হয় বিন্দুকে নিয়ে যায় আখড়াতে। গিয়ে বলে, 'দ্যাখ, ভালো করে দ্যাখ অকালকুষ্মাণ্ডের দল। সংগীতশিক্ষা একটা সাধনা। এভাবে সেই সাধনা করতে হয়।'

আজও মুগ্ধ হয়ে বিন্দুকে দেখছিল, বিন্দুর গান শুনছিল রাম। হ্যাঁ, শিখেছে বটে মেয়েটা। প্রথমদিকে যে-সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল বিন্দুর প্রশিক্ষণহীন কণ্ঠে, তা ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে রামের শিক্ষায় আর তার নিজের কঠোর পরিশ্রমে। হ্যাঁ, প্রতিভা

রয়েছে বটে মেয়েটার। সেই শ্যামনগরে এই মেয়েটাই রাধিকা হয়ে প্রতিবাদ করে উঠেছিল গানে গানে সোচ্চারে, আজ আবার এই মেয়েটাই রাধারানির সমর্পণের সুর কী অবলীলায় তুলে এনেছে গলায়। একই কণ্ঠে কত রূপ, কত সুর এই বিন্দুবাসিনীর, অবাক হয়ে ভাবে রাম বসু। তবুও একটা কাঁটা খচখচ করে যেন বেঁধে রামের মনে। মেয়েটা গাইছে এত ভালো, তবু কীসের যেন অভাব। হঠাৎই সোজা হয়ে বসে রাম, চোখে তার ঝিলিক খেলে যায়। অভাব প্রেমবোধের। যে সর্বপ্লাবী প্রেমভাব রামের নিজের হৃদয়কে উথালপাতাল করে দিচ্ছে নিয়ত, বিন্দুর মধ্যে সেই প্রেমভাবের স্ফুরণ হয়নি। বিন্দু জানে না প্রেম কী জিনিস।

রাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বিন্দুকে কী বলবে সে বুঝে পায় না। শুধু বলে, "বিন্দু তুমি চমৎকার পদ বেঁধেছ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের পদে পূজাভাব ছাড়াও ভালোবাসার একটা মস্ত জায়গা রয়েছে কিন্তু। সে-ভালোবাসা শুধুই ভক্তের প্রতি ভগবানের ভালোবাসা নয়। প্রকৃতি-পুরুষের চিরন্তন প্রেম সেটা। কবিকে বুঝতে হয় সেই প্রেম, অনুভব করতে হয় সেই হৃদয়পীড়া। তবেই কবিয়ালের যাত্রা সম্পূর্ণ হয়, সাধনা সফল হয়। যে পারে সেই তো আসল কবিয়াল।" বিন্দু বেকুবের মতো তাকিয়ে আছে। রামের কথার মর্ম ঠিক উপলব্ধি করতে পারছে না সে। আমতা আমতা করে শুধু বলল, "কিন্তু তা হলে কবির লড়ায়ের তরজা— খেউড়?"

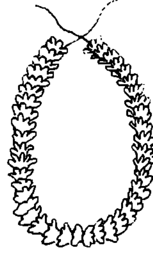
রাম বিষণ্ণ হাসে, "আমরা আসলে কবি, পদকার। কিন্তু লোকে বোঝে কই? খেউড় তো লোকজনের আবদারে করতে হয়। অন্যথা পেট চলে না। কিন্তু মনে রেখো বিন্দু, সখীসংবাদ, আগমনী, শাক্তগান আমাদের আসল লক্ষ্য। আমরা ঈশ্বরের সাধনা করি কলমের থেকে উঠে আসা শব্দে, আবার সৃষ্টি করি ঈশ্বরের মতোই। গানই আমাদের পুজো, কাব্যই আমাদের ভগবান।" রামের মুখচোখ দীপ্ত হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি প্রখর। উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে সে বিন্দুকে বলছে, "কবির বুকভরা ব্যথা একদিকে ছোটে প্রেমের আগুন হয়ে, অন্যদিকে ধায় নিবেদনের স্রোতরূপে। কবিকে ধারণ করতে হয় সেই আগুন, স্নান করতে হয় সেই ধারায়। তবেই সৃষ্টি হয় কাব্য। এর কোনও একটি উপলব্ধি হতে বঞ্চিত থাকলে যে প্রকৃত কাব্য রচনা করা যায় না বিন্দু।"

বিন্দু বিষণ্ণমুখে বলে, "আমি যে সামান্য মেয়েমানুষ, আমি কী করে এতসব বুঝতে পারব? আমি কী করে হব তবে কবি?" বিন্দুর হাতে হাত রেখে রাম বলে, "যে-মেয়েমানুষ ভক্তি আসরে রাম বসুকে গাওনায় ঘোল খাইয়ে দিতে পারে, সে যদি সামান্য হয়, তবে জগতে অসামান্য কথাটার সৃষ্টিই হয়েছে অকারণে।" বিন্দু কি

বলবে বুঝে পায় না, রামের হাতের উপর ঝুঁকে মাথা রাখে অদ্ভুত এক আবেগে। একমুহূর্তের দ্বিধা, তারপর রাম বুকে টেনে নেয় বিন্দুকে। থরথর করে কেঁপে ওঠে বিন্দুর শরীর। রাম দুই হাতের মধ্যে তুলে ধরেছে বিন্দুর মুখখানি। বিন্দুর মুখে এখন ওই নদীর ওপারের রাঙা সুয্যিঠাকুরের রং ধরেছে। চোখ মুদে ফেলেছে, শ্বাস দ্রুত বইছে বিন্দুর। রাম আস্তে আস্তে নিজের ঠোঁট নামিয়ে আনল বিন্দুর ঠোঁটের উপর।

দু'-এক মুহূর্ত যেন পৃথিবীটা থেমে গিয়েছিল সম্পূর্ণ। নৌকার গায়ে যেন গাঙের ছলছলাৎ শব্দ নেই, পাড়ের ধারের বিরাট গাছগুলোয় ফিরতে ফিরতে পাখিরাও যেন কিচিরমিচির করতে ভুলে গেছে। সেই কয়েকটা মুহূর্ত যেন অনন্তের সমান। বিন্দুর মুখ ছেড়ে দিয়েছে রাম। আর চোখ বুজে নেই বিন্দু, দিঘল চোখ মেলে অপলকে চেয়ে আছে রামের মুখের দিকে। এইবার রাম অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। ক্ষণিকের দুর্বলতায় এ কী করে বসল সে? ভয় করছে রাম বসুর। তবে রামকে একমুহূর্তের বেশি চিন্তা করতে দিল না বিন্দু। কবিয়ালকে হতভম্ব করে এবার দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটা। তারপর রামের ঠোঁটে এবার সে নিজেই ডুবিয়ে দিয়েছে নিজের উন্মুখ ঠোঁট দুটো।

বিন্দুবাসিনী রাম বসুকে ভালোবেসেছে।



সতেরো

বিন্দু আর রাম একসঙ্গে থাকবে। দু'জনে মিলে তাই ঠিক করেছে। হরিবল্লভী শুনে প্রথমে একটু গাঁইগুঁই করছিল। আর লোক পেল না বিন্দু, শেষে ওই রাম বসু? বিন্দু মুচকি হেসেছিল গুরুমাকে লুকিয়ে। হরিবল্লভী কড়াধাতের মানুষ হলেও দলের মেয়েদের সে নিজের পেটের মেয়ের মতোই মনে করে। শ্যামনগরে যে-কাণ্ডটা ঘটিয়েছিল রাম, সে-রাগ এখনও যায়নি হরিবল্লভীর।

হাসি চেপে গুরুমাকে জড়িয়ে ধরেছিল বিন্দু। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছিল, "ও মানুষটা খারাপ নয় গো, গুরুমা। ওই একরকম। বাইরেটা রুখোশুখো, কিন্তু মনটা ভারী নরম। এই একেবারে তোমার মতো।" বলেই খিলখিল করে হেসে উঠেছিল বিন্দু। "চুপ কর ছুঁড়ি, মুখের কোনও আগল নেই তোর। এক চড় দেব।" হরিবল্লভী দাবড়ানি দিয়েছিল বিন্দুকে, তবে রাম আর বিন্দুর একসঙ্গে থাকা নিয়ে বিশেষ আপত্তিও করেনি আর।

উৎসাহে টগবগ করছিল সৌদামিনী। "তবে কি কবিমশায়কে জামাইঠাকুর বলে ডাকব এখন থেকে? জামাইঠাকুর আর বিন্দুদিদির ঘরসংসারে আমায় অতিথ করে ডাকবে তো মাঝে মাঝে? বলো না, ও বিন্দুদিদি?" সৌদামিনীর চোখে দুষ্টুমি ঝিলিক দিচ্ছে। কপট রাগে সৌদামিনীর গালে একটা ঠোনা মেরে বিন্দু উত্তর দিয়েছিল,

“মরণ! ঘরসংসার মাথায় থাক, আমার এখন বল কত্ত কাজ! লেখাপড়া শিখতে হবে, গানের তালিম নিতে হবে, কত্তামশায়ের কাছ থেকে কবিগানের ঘাঁতঘোঁত বুঝে নিতে হবে...!” বিন্দুকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সৌদামিনী খিলখিল করে হেসে ওঠে ফের, “গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? হ্যাঁ, বিন্দুদিদি, এখন তিনি বুঝি ‘কত্তামশায়’ হয়েচেন?” লজ্জায় লাল হয়ে ঘর থেকে একরকম ছুটেই বেরিয়ে গিয়েছিল বিন্দু।

অবশ্য খবরটা পেয়ে সৌদামিনী যে ভীষণই অবাক হয়েছে, তেমনটাও নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই সন্দেহ তার হচ্ছিলই। এই তো কিছুদিন আগে, একদিন বেশ সন্ধ্যা করেই বিন্দু ফিরেছে— অবশ্য তার কয়েকমাস আগে থেকেই বিন্দু এমনটা শুরু করেছে— সেটা খেয়ালও করেছে সদু। সে জানত না সে-দিন গঙ্গায় বেড়াতে বেড়াতে বিন্দুর নবজন্ম হয়েছে। তবে বিন্দুর হাবেভাবে মনে হয়েছিল, কিছু তো একটা হয়েছে। ফিরে এসে অবধি চুপচাপ, রাতে ভালো করে খেল না পর্যন্ত বিন্দু।

বিন্দুর পাশেই শোয় সদু। অনেকক্ষণ সে বকবক করল সে-রাতে ঘুমোনোর আগে। ভেবেছিল তার কথার তোড়ে বিন্দুর পেট থেকেও বেরোবে কিছু কথা। সে গুড়ে বালি। প্রথমে অনিচ্ছাভরে কিছুক্ষণ হুঁ-হাঁ করলেও খানিক বাদেই বিন্দু চুপ। সদু বুঝতে পারছে ঘুমোয়নি বিন্দু, মটকা মেরে পড়ে আছে— যাতে কথা বলতে না হয়। হতাশ হয়ে সৌদামিনী পাশ ফিরে শুল। ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ একটা গুনগুন শব্দে তার চটকা ভেঙেছে। চোখ কচলে সৌদামিনী দেখল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বিন্দু গান গাইছে—

‘প্রাণনাথ ওগো, আমি যে মরেছি— তোমারই ও বাহুডোরে
তোমারই নয়নে নয়ন রাখিয়া ডুবেছি এ প্রেমঘোরে।
তোমার ও অধর সুধারসে মাখা, আমার ভ্রমর হৃদি
তোমার ও বক্ষে স্বর্গ আমার রচিয়া দিয়াছে বিধি।
তোমার সোহাগে টুটে আবরণ, নিলাজ বলেছে সবে
তব প্রেম মম বসন-ভূষণ, তুমি কি গো মোর হবে?’

বাইরে কচুবন আর পুটুসের ঝোপে ঝিঁঝি ডাকছে। জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকছে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। আর সেই জ্যোৎস্নায় ভর করে বিন্দুর গলা যেন রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে, এই মাঝরাতের নৈঃশব্দ্যে। সৌদামিনী দম বন্ধ

করে শুনছে। এ কেমন গান গাইছে তার সখী? এমন গান বিন্দুর মুখে শোনেনি সে কোনও দিন। এ গানের কলিতে কলিতে যেন জড়িয়ে আছে তীব্র প্রেমের আসঙ্গ। আজ ভক্ত হয়ে ভগবানকে নয়, চাতকিনি বিন্দু যেন কোনও অদেখা দয়িতকে ডাকছে গানে গানে, প্রেমপ্রার্থনা করছে মরমিয়া ঢঙে। সৌদামিনীর গা শিরশির করে উঠেছে কেমন। তাকিয়ায় মুখ গুঁজে সে অস্ফুটে বলে ওঠে, "পোড়ারমুখী বিন্দু, মরেছিস তুই এবার।" সৌদামিনীর চোখ ভিজে উঠেছে। আনন্দে। বিন্দুর অবশ্য কোনও দিকেই কোনও খেয়াল নেই। আজ সে প্রেমের আগুন ধারণ করেছে, স্নান করেছে নিবেদনের বারিধারায়। আজ বিন্দু সম্পূর্ণা।

* * *

এক বছর কেটে গেছে। এই একবছরে বিন্দু অনেক কিছুই রপ্ত করেছে। টপ্পা আর ধ্রুপদ ধামারের বিখ্যাত ওস্তাদ বিপ্রদাস দত্ত-র কাছে তালিম শুরু হয়েছে তার। সঙ্গে চলছে লেখাপড়া শেখার পালা। সেইটে অবিশ্যি রাতের বেলা গোপনে দরজা-জানালা বন্ধ করে খুব সন্তর্পণে করতে হয়— কে কখন দেখে ফেলে! মেয়েমানুষে লেখাপড়া শিখছে, তাও আবার কসবিপট্টি ঘুরে আসা নেড়ি— জানতে পারলে বরকন্দাজ পাঠিয়ে রামবসুর মাথা কাটবে কলকেতার বাবুভায়েরা।

শুধু গান নয়। বিন্দুর লেখাপড়া শেখার ক্ষমতা দেখেও তাক লেগে যায় রামের। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে বলে, "এমন করে এগোলে তো তুই-ই আমায় শেখাতে বসবি ক'বছরে, হ্যাঁ রে বিন্দু?" একবছরে রাম 'তুমি' থেকে 'তুই'-তে নেমেছে আর বিন্দু 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে। বিন্দু লজ্জা পায়, "তুমি আর তামাশা কোরোনি বাপু। তোমায় ঠিক ভগবান জুটিয়ে এনেছেন আমার কপালে। তাই তো পড়তে-লিখতে পাচ্ছি। এত সুখ আমার কপালে সইলে হয়।" পূর্ণদৃষ্টিতে রামের দিকে তাকায় বিন্দু। সে-দৃষ্টিতে সীমাহীন ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেই। রাম মশকরা করে বলে, "তা গুরুকে ফাঁকি দিচ্ছ যে বড়ো, গুরুদক্ষিণা কই?" বিন্দু অবাক হয়ে শুধোয়, "আমি কী দিতে পারি?" রাম চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল সে ঠিক কী চাইছে এখন। বিন্দু প্রথমে অপ্রস্তুত হয়ে যায়, তারপর "ধেৎ!" বলে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু রাম তার আঁচল চেপে ধরেছে— গুরুদক্ষিণা আদায় করেই ছাড়বে। ছাড়লও তাই শেষে।

তবে রামের কবিগানের দলে বিন্দুকে নেয়নি এখনও। রাম বলেছে, "আগে

কয়েকবছর পড়ালেখা, শাস্ত্রপাঠ, গান চালিয়ে যাও, মকশো করো হাজারবার— তারপর হবে সে-সব। আমার গুরু হরু ঠাকুর বলেন 'পাথর চমকায় নদীর জলে ঘষে/ কবিও শ্রেষ্ঠ হয় সহস্র অভ্যাসে।'" তা না-ই নিক দলে, লেখাপড়া আর গান নিয়ে থাকতে পেরেই বিন্দু খুশি। আর 'কত্তামশায়' তো রয়েইছে বিন্দুর মনপ্রাণ জুড়ে। তারা দু'জন এখনও বিকেলে নৌকো করে ঘোরে, কখনও পালকি ভাড়া নিয়ে চলে যায় চৌরঙ্গির দিকে। রাম অল্প ইংরেজি শিখেছিল কলকেতায় এসে। সে থেমে থেমে পড়ে সায়েবি দোকানগুলোর নাম আর বিন্দু হেসে লুটোপুটি খায়।

সে-দিনও এমন পালকিতে করে তারা এসেছিল গোলদিঘির ধারে হাওয়া খেতে। পালকি-বেয়ারাগুলোকে ছেড়ে দিয়ে দু'জনে দিঘির ধারে বসেছিল। ক'দিন আগেও এই দিঘিতে এঁদো পচা নোংরা ফেলে একেবারে নরককুণ্ড বানিয়ে রেখেছিল পাশের কলুটোলা আর সুরতিবাগানের লোকেরা। শেষে পটলডাঙার চৌধুরিবাবুরা পুকুরটা পরিষ্কার করায়। এখন এখানে বসে থাকতে বেশ ভালো লাগছে বিন্দুর।

রাম বেশ মন দিয়ে ধুয়া গানের[১৭] নানারকম ভাগ বোঝাচ্ছিল বিন্দুকে। বিন্দুর অবশ্য সে-দিকে বিশেষ খেয়াল ছিল না, সে মন দিয়ে দেখছিল দিঘির জলে শাপলার দামে বসা একটা মাছরাঙা মাছ ধরার চেষ্টা করছে মন দিয়ে। আজ অনেকদিন বাদে তার অষ্টপুরের কথা মনে পড়ল। কতদূরে চলে এসেছে সে, কেমন অদ্ভুত খাতে বইছে তার জীবন। এমন সময় রাস্তা থেকে বহুকণ্ঠের জোরালো একটা শব্দ ভেসে আসে। রামের বকবক বন্ধ হয়ে গেছে, বিন্দুরও সংবিৎ ফেরে।

দু'জনে উঠে একটু এগিয়ে দেখে। সং বেরিয়েছে নাকি? চড়কের তো দেরি আছে বেশ। চড়কের সঙের মতোই শোভাযাত্রা। সামনে একটা লোক একটা বলদে টানা গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কীসব বলছে, গাইছে। পিছনে হেঁটে আসা কতকগুলো লোক তার ধুয়ো ধরছে। ঢাক, ঢোল, কত্তাল নিয়ে পিছনে বাজাতে বাজাতে আসছে আরও কয়েকটা লোক।

গাড়িটা বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে এতক্ষণে। বিন্দু কান পেতে শুনল গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা গাইছে, 'ব্যাটা সুরাই মেলের কুল/ ব্যাটার বাড়ি খানাকুল/ ব্যাটা সর্বনাশের মূল/ ওঁ তৎ সৎ বলে ব্যাটা বানিয়েছে ইস্কুল/ ও সে, জেতের দফা করলে রফা/ মজালে তিন কুল।' গাইতে গাইতে লোকটা বিচিত্র অশ্লীল নানা অঙ্গভঙ্গি করছে, খেউড়ের মতোই। কিন্তু এই দিনমানে— রাস্তার উপর? রাস্তা ফাঁকা হলে বিন্দু রামকে শুধোয়, "হ্যাঁ গা, ব্যাপার কী?"

রাম অল্প হেসে উত্তর দেয়, "আর বলো কেন? কলকেতার বাবুদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই! সকলে মিলে রামমোহন রায়ের পিছনে পড়েছে আদাজল খেয়ে।"

"রামমোহন রায়? তিনি কে?"

"আরে হুগলির রাধানগরের রায়দের ছোটোতরফের ইনি। কলকেতায় বহুদিন সায়েবদের চাকরি করলেও এখেনে থাকতেন না। কয়েক বচ্ছর হল পাকাপাকি থাকতে এসেছেন, আর আসার পর থেকেই এসব হাঙ্গামা শুরু।"

"বাবুরা এঁর পিছনে পড়ছে কেন আদাজল খেয়ে?"

"আরে ইনি তো সায়েবদের সঙ্গে মিলে 'হিন্দু কালেজ' বসিয়েছেন চিৎপুরের ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়িতে[১৮]। সেখানে নাকি ইংরিজি শেখাবে সায়েবরা। বাবুদের ছেলেরা তবে উচ্ছন্নে যাবে না আরও? ধর্মনাশও হবে নাকি— কয়জন বাবু শোরগোল তুলেছেন।"

"মরণ আমার! উচ্ছন্নে যাওয়ার জন্য বাবুদের ছেলেদের বুঝি ইস্কুলে যেতে হবে?" হাসতে হাসতে বলে বিন্দু।

"আরও সব্বোনেশে ব্যাপার হল, রামমোহন একখান কেতাব লিখেছেন এই সে-দিন।[১৯] তাতে নাকি বলা আছে সতীদাহ অনুচিত কাজ খুব। শাস্ত্রে আসলে মানা করা আছে সতী করতে।"

কথার ঝোঁকে বিন্দুর দিকে তাকায়নি রাম। তাকালে সে দেখতে পেত বিন্দুর মুখ রক্তশূন্য। কাঁপছে সে থরথর করে, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে আছে রামের মুখের দিকে। কিন্তু আপনমনেই বলে যায় রাম, "আমি শুনেছি, ওঁর নাকি কোন বউদিকে জোর করে সতী করেছিল বাড়ির লোকে। তার পর থেকে উনি ঠিক করেছেন সতীদাহ বন্ধ উনি করবেনই। কে জানে? সায়েবদের সঙ্গে অবিশ্যি বেজায় দহরম-মহরম।"

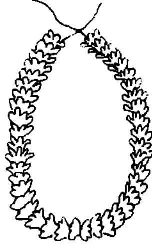
---

১৭. বাংলা লোকসংগীতের একটি শাখা। এ গানের এরূপ নামকরণ হওয়ার কারণ গানের সূচনাতে থাকা একটি স্থায়ী অংশ। এই বিশেষ অংশটি 'ধুয়া' (ধ্রুবধুয়া) নামে পরিচিত। অংশটি সংশ্লিষ্ট গানের মধ্যে ফিরে ফিরে গাওয়া হয়।

১৮. প্রেসিডেন্সি কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) ১৮১৭ সালে 'হিন্দু কলেজ' নামে গৌরদাস বসাকের গরানহাটার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছুদিন বাদে তা স্থানান্তরিত হয় চিৎপুর

রোডে কমল বসুর বাড়িতে। কমল বসু সে-কালের কলকাতার একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। পর্তুগিজ সাহেবদের কাছে চাকরি করায় এবং তাঁর ভারিক্কি মেজাজের জন্য তাঁর নাম হয় 'ফিরিঙ্গি' কমল বসু।

১৯. রামমোহন রায় ১৮১৮ সালে সতীদাহ প্রথাকে অশাস্ত্রীয় ও নীতিবিরোধী প্রমাণ করে 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' নাম একটি পুস্তক রচনা করেন।



আঠারো

প্রথমটায় বিন্দু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি। এমন মানুষ আছে তবে পৃথিবীতে? ইনি মানুষ না দেবতা? গোলদিঘি থেকে ফেরার পথে আর একটাও কথা বলতে পারেনি সে। রাম নানা কথা বলে চলেছে ক্রমাগত। তার কিছুই বিন্দুর কানে ঢুকছে না। বাইরে বেহারাগুলোর গলা থেকে বেরিয়ে আসছে দ্রুতছন্দের 'হুম হুম' শব্দ। সেই শব্দ তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল অষ্টপুরের সেই রাত, ঢাকের বাজনার তাল, জনতার বাঁধভাঙা উল্লাসের রোল। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল বিন্দু। তার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠেছে।

ঘুম হয়নি তার রাতে। রাম পাশে বিছানায় শুয়ে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। বিন্দু চুপি চুপি উঠল বিছানা থেকে। দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। মাথার উপর মেঘমুক্ত তারাভরা আকাশ। মুখ তুলে সে-দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করল বিন্দু। তার মনের মধ্যে কী চলছে সে নিজেও হয়তো বলতে পারবে না ঠিক করে। কত কী যে চলছে তার মাথার মধ্যে একসঙ্গে— এই উনিশ বছরের মনটা আর সামলাতে পারছে না সে-সব। হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে বিন্দু। কাঁদে সে অনেকক্ষণ, অবিশ্রান্ত। তারপর যখন বুকের ভেতরকার ব্যথা, সংশয়, ক্ষোভ চোখের জলে মিশে অনেকটা করে বয়ে-ঝরে পড়ে, মিশে যায় কলকেতার মাটিতে— বিন্দু আকাশের

দিকে তাকিয়ে কাকে যেন জোড় হাতে নমস্কার করল। তারপর ক্লান্ত পদক্ষেপে আবার ঢুকে গেল ঘরের ভিতরে।

তারপর কেটে গেছে তিন তিনটে বছর। তিনটে বছর বিন্দুর উচাটন হয়েই কেটেছে একরকম। তিনবছর আগের সেই দিনটায় সে শুনেছিল রামমোহন রায়ের নাম। কী করবে, কেমন করে করবে— ঠিক করতে পারেনি কিছুতেই। সে কি দেখা করবে গিয়ে রামমোহনের সঙ্গে? তাঁর পায়ে পড়ে বলবে কি, "ঠাকুর আপনি আমার ঈশ্বর, অভাগী মেয়েগুলোকে বাঁচান আপনি, আমাকেও সঙ্গে নিন আপনার, নেবেন?" সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, এই কবিগান, কবিয়ালের সঙ্গে এই সংসারের খেলা, সব পিছনে ফেলে রামমোহনের বাড়ির এক দাসী হয়ে থাকবে? কিন্তু অমন একজন বড়ো মনিষ্যি তাকে পাত্তাই বা দেবেন কেন? যদি দূরছাই করে তাড়িয়ে দেন তাকে। সামান্যি নেড়ির দলের গাওনাউলি সে, তার উপর আবার কসবিপাড়া ঘুরে আসা। সে কিনা গিয়ে কথা বলবে অমন বিদ্বান মান্যিগণ্যি একজনের সঙ্গে। না, সে আবার হয় নাকি? তবে কী করবে সে? জানে না বিন্দু।

উচাটন আর অস্থিরতাকে সঙ্গে নিয়েই বিন্দু গানে মন দিয়েছে, লেখাপড়া শেখায় পরিশ্রম দিচ্ছে দ্বিগুণ। লেখাপড়া তাকে ভালো করে শিখতেই হবে। তবেই সে রামমোহনের কোনও কাজে আসতে পারবে, তাঁর রামসেতু বাঁধায় বালিমুঠির যোগান দিতে পারবে হয়তো। রাম বসু এতশত জানে না। সে শুধু বিস্মিত হয়ে দেখে কি অস্বাভাবিক দ্রুততায় বিন্দু কণ্ঠস্থ করছে শাস্ত্র পুরাণাদি, কঠোর পরিশ্রম করছে নিজের গায়কিকে নিখুঁত করার জন্য। বিন্দুকে মুখে কিছু বলে না রাম, কিন্তু মনে মনে ভাবে— এবার বোধহয় মেয়েটাকে দলে নিতেই হবে। দিব্যি দোহার হবে, বাঁধনদারদেরও সাহায্য করতে পারবে। তবে রাম জানত না সে-দিনটা খুব তাড়াতাড়িই এসে পড়বে।

* * *

জানবাজারের 'মাড়' বাড়িতে গাওনা আছে। অবশ্য আজকাল 'মাড়' নয়, জানবাজারের বাবুরা 'দাস' পদবিতেই পরিচিত। বাবু রাজচন্দ্র দাস এই তো কয়েকবছর আগে জানবাজারের অত বড়ো পেল্লাই মহলখানা বানালেন। লোকে বলে নাকি পঁচিশটি লাখ টাকা খরচা হয়েছে। হতেই পারে, আশ্চয্যি কথা কিছু নয়। সে-বাড়িতে নাকি ঘরই আছে শয়ে শয়ে। ছয়খানা উঠোন, সাতখানা আলাদা মহল। ঠাকুরদালান, নাটমন্দির,

দেওয়ানখানা, কাছারিঘর, অতিথিশালা, কী নেই সেখানে! মায় একখান দিঘিও রয়েছে সেখানে। ছয় বিঘে জমি সব মিলিয়ে। ভাগ্যি করে এসেছিলেন বটে রাজচন্দ্রের বাবা প্রীতিরাম। না-হলে সামান্য বাঁশের কারবারি কৃষ্ণরাম মাড়ের ছেলে প্রীতিরাম সায়েবদের তল্পি ধরে লাখপতি হয়ে গেলেন? আবার প্রীতিরামের সুযোগ্য সন্তান রাজচন্দ্র এখন কলকেতার তাবড়ো তাবড়ো ধনীর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন পয়সার জোরে।

রাম এসে এসব কথা সাতকাহন করে বলছিল বিন্দুর কাছে। বিন্দু তখন মনসামঙ্গল পুঁথি নিয়ে ভারী ব্যস্ত। শুধু প্রথাগত বৈষ্ণব বা শাক্তগান নয়, মানুষের কাছে পৌঁছোতে গেলে লোককাহিনি, ব্রত, পাঁচালি আর মঙ্গলকাব্য কণ্ঠস্থ থাকা খুবই দরকার। অন্যমনস্ক ভাবে হুঁ-হাঁ করে রামের বকবকানিতে ঠেকনো দিচ্ছিল সে। কিন্তু রামের উৎসাহের কমতি নেই। এই গাওনাখান যে কত বড়ো, কত মান্যিগণ্যি মানুষ আসবেন সেখানে, রামের কথা আর শেষ হয় না।

প্রায় বিশ বচ্ছর ধরে মোকাম কলকেতার বুকে গান গাইছে কর্তা, খোদ বড়োলাটের বাড়িতে গিয়ে ভোলা ময়রার সঙ্গে লহর করে এসেছে, আজ সে হঠাৎ শতখান করে জানবাজারের দাসবাড়ির ব্যাখ্যান করছে কেন— ভাবে বিন্দু। পরমুহূর্তেই অবিশ্যি নিজের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যায় বিন্দু। রামের কথার তোড়ে বেরিয়ে এসেছে আসল ব্যাপারখানা। রাজচন্দ্রের বাড়িতে জন্ম নিয়েছে তাঁর চতুর্থ সন্তান, চতুর্থ কন্যা।

সকলে ভেবেছিল পুত্রসন্তান বঞ্চিত রাজচন্দ্রের কাছে এই আঘাত আসবে অসহনীয় হয়ে। আঁধার হয়ে যাবে দাসবাড়ি। কিন্তু তা হয়নি। রাজচন্দ্রের স্ত্রী স্বামীকে বুঝিয়েছেন, মেয়ে বলে কম কিছু নয় এই শিশু, বা অন্য তিন কন্যা। এরাই রাজচন্দ্রের উত্তরাধিকারী, এরাই দাস বাড়ির কুলপ্রদীপ। রাজচন্দ্র কলকেতার বড়োমানুষ হলেও অন্যসব বাবুদের মতো নন। শান্ত দৃঢ়চিত্তের এই মানুষটি নিজের স্ত্রীকে যথেষ্ট সম্মান করেন, তাঁর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্বও দিয়ে থাকেন।

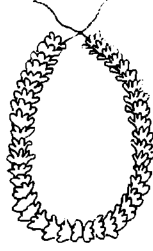
বিন্দু শুনেছে এঁর কথা, এই জানবাজারের রানিমার কথা। গরিব-দুঃখীকে অজস্র দান করেন। লোকে বলে রানি রাসমণি যেমন রূপেও জগন্মাতা, গুণেও তেমন। রানিমার উৎসাহেই নাকি বিশাল আয়োজন হয়েছে চতুর্থ কন্যার জন্মোৎসব পালনের জন্য। লোকে নানা কথা বলছে বটে আড়ালে-আবডালে, মেয়ে হওয়ার পরেই এত 'আদিখ্যেতা' গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে অনেকেরই, কিন্তু রাজচন্দ্র বা রাসমণি সে-সবে পাত্তাও দেননি। সেই উৎসবেই হবে বিশাল করে কবির লড়াই। রাম বসুকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন রাজচন্দ্রের নায়েবমশাই স্বয়ং। বিশাল নাটমন্দিরে লহর হবে। শহরের

মানিগন্যিরা সকলে আসবেন।

কিন্তু সেটা কথা নয়। আসল কথাটা এইবার ভেঙে বলল রাম। লড়াই হবে নীলু ঠাকুরের সঙ্গে। নীলু ঠাকুর, এই নামটা আজকাল শোনা যাচ্ছে বটে। কে সে? বিন্দুর প্রশ্নের উত্তরে রাম তাকে খুলে বলে সবটাই। নীলু ঠাকুর নতুন কবিয়াল বাজারে। একেবারেই ছোকরা বয়েস। কিন্তু এর মধ্যেই বেশ নাম করে বসেছে। হারু ঠাকুরের শিষ্য নীলু ঠাকুর আর তার ভাই রামপ্রসাদ। হারু ঠাকুরের বয়েস হয়েছে, দল চালানোর তাগদ নেই এখন আর তত। তাই গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে নীলু-রামপ্রসাদ নতুন দল খুলেছে।

রাম দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "গুরুমশায়ের ভীমরতি ধরেছে। আমি দল খোলার সময় কত অনেয্য কথা বলেছে আমায়। এক আনা সাহায্য তো করেইনি, উল্টে বাগড়া দিয়েছে কত। গুরুনিন্দে মহাপাপ, কিন্তু ওই ভোলা হারামজাদাকে সব গান দিয়ে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল বুড়ো। বাছা বাছা বাবুদের বাড়িতে আসরের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়েছে একসময়।" রামের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ, হতাশা, আক্ষেপ মিলে-মিশে গেছে। "তারপর এই সে-দিনের ছোকরা নীলু, সে-ও নাকি গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে দল খুলেছে, ঠাকুর আবার তাকে গানও লিখে দিচ্ছেন।" একমুহূর্ত থামে রাম। তারপর ফের বলে, "সব নেপোয় দই খেয়ে গেল হরু ঠাকুরের শিকে থেকে, বাদ পড়ল শুধু এই শর্মা।" রামের কণ্ঠস্বরে এবার ব্যঙ্গ ফুটে বেরোচ্ছে, তবে বিন্দুর কানে ধরা পড়ল শুধুই হাহাকার।

বিন্দু বুঝতে পেরেছে এই ছোকরা কবিয়ালের সঙ্গে লড়াইটা রামের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ কী কারণে। নীলু ঠাকুরকে হারিয়ে সে হারু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, সমস্ত কবিয়াল সমাজকে দেখিয়ে দিতে চায়— গুরুর সাহায্য বিনাই রাম বসু কলকেতার সেরা কবিয়াল। রাম বসু কারও মুখাপেক্ষী নয়, সে সম্পূর্ণ, তাই সে শ্রেষ্ঠ। বিন্দু ধীরে ধীরে হাতের পুঁথিখানি রেখে রামের পাশে এসে বসে, জড়িয়ে ধরে তার কাঁধ। রামও কী এক অদম্য আবেগে দু'হাতে আকর্ষণ করে বিন্দুকে, তার বুকে নিজের মুখ ডুবিয়ে দেয়।



উনিশ

কলকেতার বড়ো মেজো ছোটো সমস্ত বাবু এসে জানবাজার রাজবাড়ির বিশাল নাটমন্দিরে জেঁকে বসেছে। একজনও বাদ নেই বোধহয়। না, বিন্দু জানে একজন আসেননি। তিনি অবশ্য বাবু নন, তিনি এখন বিন্দুর ঈশ্বর। তিনি রামমোহন রায়। সমস্ত উৎসব আয়োজনের নিমন্ত্রণই যায় তাঁর কাছে, কিন্তু তিনি বেশিরভাগ জায়গাতেই যান না। তিন বছরে রামমোহন সম্পর্কে অনেক খোঁজখবরই নিয়েছে বিন্দু। যত সে জানতে পেরেছে, ততই শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে এসেছে তার মাথা।

একা একজন মানুষ লড়াই করে যাচ্ছেন সর্বশক্তিমান সমাজের বিরুদ্ধে, শত শত বছরের লোকাচারের বিরুদ্ধে। তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই, বিরুদ্ধতা করার লোক অসংখ্য। তিনি যাঁদের জন্য লড়ছেন অপবাদের ভয়, লোকলজ্জার ভয়, এমন কি জীবনের মায়া তুচ্ছ করে— তাঁকে কেমন করেই বা সাহায্য করবে বিন্দু? না, এখন সে কিছুই করতে পারবে না। তাকে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে হবে। তৈরি করতে হবে নিজেকে। সে নিজেকে তৈরি করছে এখন। আর একটা কাজও করেছে বিন্দু।

রামমোহন সকালে গঙ্গাস্নান করেন নিত্য। ভক্তিটক্তি নয়, অভ্যাস হয়ে গেছে। স্নান করে ন'টা নাগাদ ফিরে এসে বাড়িতে ঢোকার সময় মূল দরজার সামনে এক

মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তিনি মুখ আকাশের দিকে তুলে চোখ বন্ধ করেন। ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। নাকি পিতৃপুরুষকে। তারপর বাড়ির ভেতরে ঢুকে যান। ওই দাঁড়িয়ে থাকার মুহূর্তটিতে তাঁর ভিজে পোশাক থেকে জল গড়িয়ে মাটি ভিজিয়ে দেয়। রামমোহনের বাড়ি খুঁজতে গিয়ে একদিন সকালে বিন্দু এই দৃশ্যটি দেখে ফেলে। তখন থেকে বিন্দু তিন বছর ধরে রোজ সেই ভিজে মাটির এক দানা বিন্দু আনায় নিস্তারিণীকে দিয়ে। জিভে ঠেকায়, মাথায় রাখে। রাম কিন্তু বোঝেনি এমন অদ্ভুত ও নিরন্তর আরাধনা করে বিন্দুর কোন অর্জনটি ঘটে। তবে তেমন বাধাও দেয়নি। বোঝানোর চেষ্টা যে, বিন্দুও খুব কিছু করেছে তা নয়। রামমোহনের প্রতি তার এই আরাধনাটি একেবারেই তার নিজস্ব। সেখানে বিন্দুর আপন 'কত্তামশায়ের'ও প্রবেশাধিকার নেই।

আজ রাম তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে আসরে। সম্ভবত একটু স্নায়ুচাপে ভুগছে কবিয়াল। বিন্দুর তেমন কোনও কাজ নেই গাওনাতে, সে আসেও না বিশেষ। আজ রামের জোরাজুরিতে এসেছে। সে থাকলে রামের ভালো লাগবে। আজ রামের পিছনেই বসবে সে। উৎসাহ দেবে, তালি বাজাবে, রামকে জিতিয়েই ফিরবে সে।

নীলু ঠাকুরকে দেখে বিন্দু বেশ অবাকই হয়েছে। একেবারেই ছোকরা। বিন্দুর থেকেও বেশ কয়েক বছরের ছোটোই হবে। রোগাসোগা চেহারা। মুখে কেমন একটা অহংকারী ভাব। ঠোঁটটা যেন উল্টেই রেখেছে সবসময়। মুখটাই ব্যাঁকাপারা— বিন্দু ভাবল। নীলুর বাবরি চুলের গোছ ঘাড়ের কাছে এলিয়ে আছে। রংদার মেরজাই আর ধাক্কাপাড়ের মটকা ধুতিতে একেবারে ফুলবাবু সেজে এসেছে। মনে মনে হাসে বিন্দু। এই লক্কা পায়রাকে লাট খাওয়াতে কত্তামশায়ের বেশিক্ষণ লাগবে না।

ভুল ভেবেছিল বিন্দু। দেখা গেল বুড়ো হলেও হরু ঠাকুরের জহুরি চোখদুটো ধারালোই আছে এখনও। এ ছোঁড়ার এলেম আছে। আসরবন্দনার পর থেকে রাম বসুর সঙ্গে সমানে সমানে লড়ে যাচ্ছে, এক ইঞ্চি জমি ছাড়েনি। বেশ খানিকক্ষণ এভাবে চলার পর, কে জানে কেন— তরজা ছেড়ে সরাসরি খেউড়ে ঢুকতে গেল রাম। ঠিক খেউড় নয়। এত বাচ্চা একটা ছেলে— তার উপর হারু ঠাকুরের শিষ্য, রাম নীলু ঠাকুরকে সরাসরি আক্রমণ না করে নিজের সাফল্য আর নামযশের ফিরিস্তি দিতে থাকে গানের ছলে। ভাবখানা এমন যে, সেইসব শুনে অর্বাচীন নীলু ঠাকুর যেন ভয়-টয় পেয়ে হার মেনে নেবে।

বিন্দুর ঠিক ভালো লাগছে না ব্যাপারটা। তার চোখের সামনে যেন বহুদিন আগের সেই হরপ্রসাদ বনাম হরিদাস সাধুর লড়ায়ের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে রাম

বসুর আত্মবিশ্বাসে কমতি আছে খানিক আজ। বিন্দু প্রমাদ গুনল। ওই ব্যাটা নীলু ঠাকুর সেটা বুঝে ফেললেই মুশকিল। কিছুক্ষণ পরেই বিন্দু অবাক চোখে দেখল তার আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে।

রাম বসু যখন সভার মাঝে প্রবল বিক্রমে হাত-পা নেড়ে নিজের কীর্তির কথা শতমুখে বলছে, বিন্দু দেখল নীলু ঠাকুরের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, মুখে হাসি। মুখ নামিয়ে কথা বলছে বাঁধনদার কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। কৃষ্ণমোহন পুরোনো লোক। হারু ঠাকুরের দল থেকে ভোলা ময়রার দল ঘুরে এখন এই নীলু-রামপ্রসাদের কাছে এসে জুটেছে। দরের বাঁধনদার হিসেবে নাম আছে লোকটার, বিন্দু জানে। তার মনটা কু গেয়ে উঠল। কৃষ্ণমোহন ভালোই চেনে রামকে। সে নির্ঘাত তৈরি হয়ে এসেছে, তৈরি করে এনেছে এই ছোকরাকে।

তা তৈরি কৃষ্ণমোহন নীলু ঠাকুরকে ভালোমতোই করে এনেছিল। বিন্দু যেটা খেয়াল করেছিল, সেটা রাম বসু দেখেনি। তা হলে হয়তো সাবধান হত। কিন্তু সে আস্ফালনে এতই মত্ত ছিল যে, প্রতিপক্ষের দিকে নজর রাখার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সব কবিয়ালের মধ্যে তৈরি হয়— তা যেন আর কাজ করছিল না। নীলু ঠাকুর যখন উঠল, তখন রাম ক্লান্ত হয়ে বসেছে। নীলু ঠাকুর গান ধরল শান্ত ভাবেই। বেশ মিষ্টি করে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলছে গানের ভাষায়। রাম বসুও যে কবিয়াল, নীলু ঠাকুরও সে কবিয়াল। রাম বৃথাই নিজের আস্ফালন করছে, কবিয়ালের সকল অর্জন যে আসলে তার গুরুর অর্জন— এ যে না বোঝে তার কবিয়াল জন্মই বৃথা। গুরুই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। গুরু বিনা কিছু নেই। গুরুকৃপা অস্বীকার ঘোর পাতক। রাম বসুকে যে হরু ঠাকুর ত্যাগ করেছেন, তা বিনা কারণে নয়, রাম বসুর অকৃতজ্ঞতায়। আর এ জন্যই রাম বসুর পতন নিশ্চিত।

অবাক হয়ে দেখছে বিন্দু। ছোঁড়া ভারী চালাক। রাম বসুর আসল ব্যথা কোথায়, বুঝে নিয়েছে এর মধ্যেই। সঙ্গে ভট্‌চাজের লেখা গানও সঙ্গত করেছে সমানতালে। তবে বিন্দু দেখল 'উপস্থিতি'তে নীলু ঠাকুর দড়ো নয় তত। বারবার বাঁধনদারের সাহায্য নিতে হচ্ছে তাকে। একে উপস্থিতি দিয়েই ঘায়েল করতে হবে। এমন কোনও চাপান দিতে হবে, যার কাটান আগে থেকে আন্দাজ করে রাখেনি এরা। একেবারেই অন্যরকম চাপান দিলে এরা হতভম্ব হয়ে যাবে বিন্দু বেশ বুঝতে পারছে।

কিন্তু ওদিকে রাম বসু নিজেই যে হতভম্ব হয়ে বসে আছে। নীলু ঠাকুরের বাক্যবাণ ভীষণ গভীরে বিঁধেছে, জুতসই জবাব খুঁজে পাচ্ছে না সে। এদিকে দেরি দেখে নীলু

ঠাকুরের দলের লোকজন বুঝে নিয়েছে রাম বসু পড়েছে বেকায়দায়। তারা সব একসঙ্গে দুয়ো দিতে শুরু করেছে। প্রবল স্নায়ুচাপে রামের গেল মাথা বিগড়ে। এক কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম সে আসরের মাঝে চাপান না দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল নাটমন্দিরে পাতা জাজিমের উপর। নীলুঠাকুরের দল প্রবল উল্লাসে চিৎকার করে উঠেছে। কিন্তু তাদের মূল গায়েন চুপ করেই আছে। নীলু ঠাকুরের বিশ্বাস হচ্ছে না রাম বসু এত সহজে হার স্বীকার করে নেবে।

বিন্দু দেখল রাম তার ঠিক সামনেই বসে পড়েছে ধপ করে। তার কত্তামশায় হেরে যাবে? এত সহজে? বিন্দুবাসিনী হারতে শেখেনি। সে রাম বসুকেও হারতে দেবে না। রামেরপিঠে হাত রেখে সে ফিসফিসিয়ে বলে, "ওগো শুনছ, ওঠো। উঠে পড়ো।" রাম চমকে উঠে পিছন ফেরে। বিন্দুর মোলায়েম গলা যেন তাকে রোজকার মতোই তুলে দিচ্ছে ঘুম থেকে, বিন্দুর হাতের নরম ছোঁয়া যেন তার পিঠে জড়িয়ে রয়েছে ভোরবেলার আদরের মতো। যন্ত্রচালিতের মতো রাম ওঠে, বিন্দু ফিসফিস করে তার কানে বলে দিয়েছে নতুন চাপানের ধ্রুবপদখানি, 'কে কার গুরু? কে কার গুরু'।

রাম উঠে দাঁড়িয়ে এবার তীব্রকণ্ঠে ওই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে নীলু ঠাকুরের মুখের উপর, 'কে কার গুরু? কে কার গুরু।' তার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় পুরো আসর চমকে গেছে, থেমে গেছে প্রতিপক্ষের উল্লাস। কিন্তু বিন্দু জানে এই স্তব্ধতা সাময়িক। মরিয়া হয়ে রাম আসরের দখল নিয়েছে বটে নিজের ব্যক্তিত্ব আর অভিজ্ঞতার সবটুকু কাজে লাগিয়ে, তবে তার কাছে গান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো রসদ নেই। উপস্থিতির ওস্তাদ রাম বসু এখন অসহায়। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নেয় বিন্দু। ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে কাঁসর বাজাচ্ছিল বলরাম সাহা। তাকে হতবাক করে উঠে দাঁড়িয়ে চকিতে কাঁসর নিজের হাতে নিয়েছে বিন্দু। চাপা গলায় বলে উঠেছে, "তুমি এখন বোসো গে বলরামদাদা। এ জায়গাটা আমায় ছেড়ে দাও এট্টু।"

বলরাম দলের পুরোনো লোক। বহুবছর ধরে সে সর্দারের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁসর বাজায়। বিন্দুর কথা তার পছন্দ হয়নি, কিন্তু সর্দারের মাগকে সে আটকাতেও পারল না। বিন্দু কাঁসর হাতে নিয়ে রামের এক্কেবারে পাশটি ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। রামের কানে কানে বাতলে দিচ্ছে গানের কলি। রাম কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে এইবার। কোণঠাসা হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তবু সে কবিয়ালকেশরী। দ্রুত বুঝে নিয়েছে করণীয়। ঘুরে ঘুরে হাত-পা নেড়ে সে গাইতে লাগল বিন্দুর মুখে মুখে রচনা করা পদ। দু'কলি শেষ হয়, বিন্দুর সামনে এসে তাকে দু'হাত ছড়িয়ে আড়াল করে, ভাবটা এমন— যেন হাত

নেড়ে খুব উৎসাহ দিচ্ছে দোহার আর বাজিয়েদের। আর সেই সুযোগে বিন্দু তার কানে কানে বলে দেয় পরের দুই কলি।

'কে কার গুরু? কে কার গুরু?

শিষ্য ভজে গুরুর চরণ, গুরু ভজে কার?
দর্পহারী সবার গুরু, বৃথাই (গুরুর) অহংকার।
গুরু দেবেন বিদ্যা, সে বিদ্যা-আধার কে?
বিদ্যা যদি নিজের ভাবো, কর্ম সেরেছে।

কে কার গুরু? কে কার গুরু?'

নীলু ঠাকুর চুপ। রাম বসু খেলা ধরে নিয়েছে। দর্শকরাও উল্লসিত। রামের দিকে ঘুরে যাচ্ছে সমর্থন। অনেকে চিৎকার করে উঠেছে, "খাঁটি কথা, ঠিক কথা। বিদ্যা যদি নিজের ভাবো, কর্ম সেরেছে।" কৃষ্ণমোহন ভট্‌চাযের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

বিন্দু এই সুযোগে রামের কানে পৌঁছে দিয়েছে পরের কলিগুলো। রাম উৎসাহিত হয়ে বাবুদের দিকে ফিরে মাথা নুইয়ে একটি নমস্কার করে বলল, "বাবুরা অধমকে যদি অভয় দেন, তো আর ক'টা কথা বলতে চাই। গুরুর নাম নিয়ে তরজা যখন, গুরুদের কথাও জানতে হবে বই-কি? কী বলেন সুধীজনে?" বাবুরা সমস্বরে সম্মতিজ্ঞাপন করেছেন। আজ জানবাজারে আসা তাদের সার্থক হয়েছে। এমন নতুন ধরনের ভাবনা আজকাল কবিগানে হয় কোথায়? রাম বসু ওদিকে ফের ধরেছে গান—

'কে কার গুরু? কে কার গুরু?

গুরু যেমন নতি মাগেন, শিষ্য মাগে আশিস তাঁর
গুরু যদি ব্যর্থ হয়েন, সে দায় বলো তখন কার?
একলব্যের দ্রোণ গুরু, ভীষণ যে সেই গুরুর পাপ
পরশুরামও কর্ণগুরু, শিষ্যে দিলেন মারণ শাপ।

কে কার গুরু? কে কার গুরু?

ভাগ্য যেমন কর্ম তেমন, শিষ্য-গুরু কপালফের
কর্ম যদি সঠিক না হয়, কর্মী বলো কোন কাজের?
হরু ঠাকুর তোমার গুরু, দিলেন তোমায় গানের তোড়া
গান শেখাল জগৎ আমায়, আমার গুরু জগৎজোড়া।

কে কার গুরু? কে কার গুরু?'

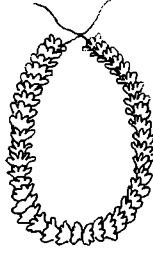
নীলু ঠাকুর আর কৃষ্ণমোহন একে অন্যের দিকে চাইছে দিশাহারা ভাবে। এই চাপানের কাটান তাদের মুখে যোগাচ্ছে না। জনতা গর্জন করে উঠেছে, "বলো নীলু ঠাকুর বলো, 'কে কার গুরু? কে কার গুরু?'" কৃষ্ণমোহন দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়ে। আশা নেই জেতার।

বিন্দুর বুকের ভিতর দামামা বাজছে। তার অনুমান সঠিক ছিল। কত্তামশায়কে সে হারতে দেয়নি। জিতে গেছে সে নিজেও। বাবুরা সব হাততালি দিচ্ছেন উঠে। রাম দলের লোকেদের সঙ্গে উল্লাসে মেতেছে। বিন্দু সে-দিকে গুটি গুটি পায়ে এগোনোয় দেখতে পেল না পিছন থেকে নীলু ঠাকুর দুই চোখে অপরিসীম মুগ্ধতা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বেশিরভাগ লোকে বুঝতে না পারলেও অল্পবয়সি এ তরুণটি জানে আসলে সে কার কাছে হেরেছে।

* * *

সে-দিন অনেক রাত অবধি নেশা করেছিল রাম। আনন্দে, উল্লাসে। বিন্দুকেও টেনে বসিয়েছিল। খুরিতে এক চুমুক দিয়ে বিন্দু মুখ বেঁকিয়েছিল। "জঘন্য!" উঠে চলে গিয়েছিল সে। রাম অবিশ্যি আরও অনেকটা খেয়ে ভরপেট নেশা করে তবেই শুতে এসেছিল। ক্লান্ত শরীরে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে বিন্দু। তাকে ধরে হঠাৎই চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে শুরু করেছে রাম। প্রথমটায় ঠেলে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল বিন্দু, "না বাবু, বড্ড গন্ধ। কী যে ছাইপাঁশ খাও!" কিন্তু রাম নাছোড়বান্দা। তার সোহাগে বিন্দুও আস্তে আস্তে বিবশ হয়ে পড়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রামের ঘামে ভেজা বুকের উপর মাথা রেখে বিন্দু আদুরে গলায় বলল, "আমার একটা কথা রাখবে গো? রামমোহন ঠাকুরের কাছে একবার নিয়ে যাবে আমায়? আমি শুধু একটিবার ওনাকে পেন্নাম করব খালি।" রাম একটু নড়েচড়ে ওঠে। বিন্দুর চোখের জলের ভিজে স্পর্শ তার বুকে। সে তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বলে, "সে হবে'খন। এখন ঘুমো দিকি।" রাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেও আনন্দের চোটে সে-রাতে আর বিন্দুর ঘুম এল না।



কুড়ি

"বলি ও নিস্তারিণী, কেল্লা থেকে ন'টার তোপ পড়ে গেল রে পোড়ারমুখী। রায়মশায়ের এবার ফিরে আসার সময় হয়ে গেল। কখন যাবি তুই আর মাটি নিতে? যা যা জলদি যা!" বলতে বলতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিন্দুবাসিনী। এখন আর সে অপক্ক তরুণী নয়, আঠাশের পূর্ণ যৌবন তার সমস্ত অবয়বে একটা লক্ষ্মীশ্রী এনে দিয়েছে।

বাইরের ঘরের মাটিতে বসে রাম একখানা কাগজে কীসব লিখছে— বোধকরি নতুন গানের কোনও কলি। বেশ কিছুদিন হল রাম তেড়ে উঠে আবার গান লিখতে শুরু করেছে, না-হলে এই সে-দিন পর্যন্ত গান লেখার ভার ছিল বিন্দুর ওপর। না বিন্দু তো নয়, যজ্ঞেশ্বরীর উপর। পুরো কলকেতা এখন চেনে বাঁধনদার যজ্ঞেশ্বরীকে। ওই একটিই তো মেয়েমানুষ আছে যে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান বাঁধে, আসরে সেই গান গায় রাম বসু। 'উপস্থিতি' নেহাত মূল গায়েন গাইবে এমনটাই রীতি, নইলে সেটাও যজ্ঞেশ্বরী অনেকের থেকে ভালো গাইত— এমনটাও বলে রসিক জনে।

জানবাজারের রাজবাড়ির সেই গাওনার পর বিন্দুর জায়গা আপনা থেকেই পাকা হয়েছে দলে। দলের নিয়ম মেনে জন্মাষ্টমীর পুজোর দিন বিন্দু শুদ্ধাচারে পুজো দিয়ে, দলের সর্দারের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে, ঠাকুর ঘরে রাখা তালপাত আর খাগের কলমে মাথা ছুঁইয়ে দলের একজন হয়ে উঠল। বাঁধনদার হবে বিন্দু। নিজের একটা নাম ঠিক

করেছে সে। এ নামেই সে পদ লিখবে। যজ্ঞেশ্বরী। যজ্ঞাগ্নির অধীশ্বরী, কর্ত্রী। দাবানল কোনও জলসিঞ্চনে নেভে না। তার জন্য আগুনের দরকার হয়। চিতার আগুন শুদ্ধ করতে পারে কেবল যজ্ঞপাবক। নিজের লেখায়, সুরে-তালে, ছন্দে বিন্দু আনবে সেই আগুন। বিধাতার বিরুদ্ধে লড়বে সে দরকারে, তবে বিন্দুবাসিনী হয়ে নয়, যজ্ঞেশ্বরী হয়ে। আর তা ছাড়াও রাধার আর-এক নামও যজ্ঞেশ্বরী। তাই এর থেকে উপযুক্ত নাম আর বিন্দুর মাথায় এল না।

বলতে নেই, তারপর থেকে যতবার বিন্দুর বাঁধা গানে গাওনা হয়েছে, রাম বসুর দল হেরে ফেরেনি। প্রথমবার বিন্দুর বাঁধা গান যখন গেয়েছিল রাম সিংহিবাবুদের বাড়ির দুর্গাপুজোয়— ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল। গাওনার শেষে তারপর রাম দর্শকদের উদ্দেশ করে যখন বলল, "আজকের আসরের আমাদের দলের সমস্ত গান লিখেছে আমাদের নতুন বাঁধনদার— যজ্ঞেশ্বরী দাসী।" তখন অত ভিড়ের আসরটা একেবারে চুপ মেরে গিয়েছিল।

এমন কাণ্ড কেউ কক্ষনো দেখেনি এ বাংলায়। নেড়িগান ঠিক আছে, তাই বলে একেবারে কবিয়ালের দলের বাঁধনদার? তাও আবার রাম বসুর মতো নামডাকের কবিয়ালের দলে। বিন্দুর মনে আশঙ্কা, কী হবে এবার? সকলে যদি ছি-ছিক্কার করে, দুয়ো দেয়? তারপর কী তাকে আর দলে রাখবে না রাম? পরমুহূর্তেরই তার সমস্ত আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ করে উপস্থিত জনতা উল্লাসধ্বনি করে উঠেছিল। আনন্দে আপ্লুত বিন্দু করজোড়ে মাথা নুইয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল আসরের মাঝখানে। তাকে দেখে সেই উল্লাস হয়েছিল তীব্রতর। মোকাম কলকেতার কবিগানের দুনিয়ায় সেই যে পা জমিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল যজ্ঞেশ্বরী দাসী, তারপর থেকে ওই নামটাই রয়ে গেছে, বিন্দু বোষ্টমের নামটা মুছে গেছে লোকের মন থেকে। তবে ঘরে ফিরে, রাম বসুর বাহুবন্ধনে আজও যজ্ঞেশ্বরী নয়, বিন্দু হয়ে থাকতেই ভালোবাসে মোকাম কলকেতার একমাত্র মেয়ে বাঁধনদার।

বিন্দুর হাঁকে দাওয়া থেকে মুখ বাড়ায় নিস্তারিণী, "যাচ্চি গো দিদি যাচ্চি। এতগুলো বচ্ছর ধরে রায়মশায়ের পায়ের মাটি এনেচি, কোনওদিন চুক হয়েছে? তোমার সবতাতেই ভারী হুড়োতাড়া।" গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায় নিস্তারিণী। রাম কাগজের থেকে একবার মুখ তুলে বলে, "তোর পুণ্যের ঘড়া এখনও ভরল না বিন্দু? এতকাল ধরে রামমোহনের পায়ের মাটি ঠেকাচ্ছিস মাথায়— তোকে দেখলে কি তিনি চিনবেন? কী লাভ এসব করে?" বিন্দুকে কখনও বাধা দেয়নি রাম, কিন্তু আজ

কেন কে জানে সে একবার প্রশ্নটা করেই বসল। বিন্দু মলিন হাসি হেসে উত্তর দিল, "তোমার কোনও কথা তো কখনও ফেলিনি কত্তা, তুমি আমার একটা কথাই না-হয় রাখো। তিনি চিনুন না-চিনুন, আমার এ পুজোয় তুমি বাধা দিয়ো না।" অপ্রস্তুত হয়ে রাম চুপ করে যায়।

রামের অপ্রস্তুত হওয়ার কারণ রয়েছে যথেষ্ট। জানবাজারে সেই সে-বার বিন্দু বাঁচিয়ে দিয়েছিল তাকে। বিন্দুর গানের জোরেই সে-দিন রাম নীলু ঠাকুরকে হারিয়ে দিয়েছিল। সে-রাতে নেশার ঘোরে বিন্দুর অনুরোধে সম্মতি দিলেও পরে আর সে-বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্যই করেনি। বিন্দু অবশ্য কত্তামশায়ের ওপর বিশ্বাস হারায়নি প্রথমে। সে অপেক্ষা করেছে। অপেক্ষার প্রহর গড়িয়ে গেছে দিন থেকে সপ্তাহে, সপ্তাহ থেকে মাসে, মাস থেকে বছরে। কিন্তু রাম আর ফিরে সে-কথা তোলেনি একবারও। সিংহিবাড়ির আসরে জনতার সোল্লাস জয়ধ্বনিতে যজ্ঞেশ্বরীর অভিষেকের সেই রাতে বাড়ি ফিরে বিন্দু বিছানায় ফের ঘন হয়ে এসেছিল রামের কাছে। কিছুক্ষণ আদর-সোহাগের পর সে তৃপ্ত রামের চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলেছিল, "হ্যাঁগা, আমাদের তো সেই রায়ঠাকুরের কাছে আর যাওয়া হলই না।" বিন্দুর গলায় আদুরে টান।

রাম অসোয়াস্তি বোধ করে। সে-দিন নেশার ঘোরে সে কী বলেছিল, তার নিজেরই খেয়াল নেই। তবে বিন্দুর পরের কথাটা তাকে কিছুটা স্বস্তি দেয়, "এখন আর যেতে হয় না, তার চেয়ে আর-একটা কথা বলি শোনো।" রাম অপেক্ষা করতে থাকে বিন্দুর কথা শোনার জন্য। কিন্তু সেই কথা শুনে তো তার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। ছিটকে সরে আসে সে বিন্দুর পাশ থেকে।

"তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে নাকি রে বিন্দু? রামমোহন রায়ের নাম গান বাঁধবি? আমি গাইব?"

"গাইবে না? এত বড়ো কাজ করছেন উনি, মানুষ নন, উনি দেবতা। তাঁর কথা গান বেঁধে ছড়িয়ে দিলে আমাদের পুণ্য হবে।"

"রামমোহন রায়ের পিছনে মোছলমান গুন্ডা লাগিয়েছে জানিস মুচিবাজারের নিয়োগীরা? কলকেতার প্রায় সব বাবু রামমোহনের নামে খাপ্পা। আমরা সেই লোককে নিয়ে গান বাঁধলে আমাদের ঘাড়ে মাথা থাকবে? ওই গুন্ডা আমাদের পিছনে লেলিয়ে দিতে কতক্ষণ?"

"ভয় পেয়ে গান গাইব না? তুমি যে বলো কত্তা, গানই আমাদের পুজো, অন্তরের

কথা গানে গানেই ভগবানকে নিবেদন করতে হয়। আজ ভয় পেয়ে ভগবানকে পুজো দেব না, এ কেমনধারা কথা তোমার?" বিন্দুর গলায় অবিশ্বাসের সুর। সে যেন চিনতে পারছে না রাম বসুকে।

"শুধু পুজোয় তো আর পেট ভরবে না বিন্দু, তার জন্য পয়সার জোগাড় লাগে। আমাদের কথা ছাড়। গানের দলে এতগুলো বাজিয়ে-বাঁধনদার-দোহার। আমাদের যদি বাবুরা কেউ গাওনায় না ডাকে, এতগুলো লোকের পেট চলবে কীভাবে? তাদের তুই কী জবাব দিবি? আমরা সামান্য কবিয়াল বিন্দু, কাজ কী আমাদের রাজাগজার কথায়?" রামের স্বরে মিশেছে বিরক্তি আর সতর্কতা। বিরক্তিটা বিন্দুর উপরেই। বিন্দুর এই রামমোহন রায়কে নিয়ে বাড়াবাড়িটা তার ভালো লাগছে না।

তবে রামের কথারও কোনও জবাব ছিল না বিন্দুর কাছে। সে চুপ করে গিয়েছিল। আজ এতগুলো বছর ধরে সে চুপ করেই আছে। নিজেকে ডুবিয়েছে লেখাপড়ায় আর গানের মধ্যে। রামের সঙ্গেও তার দূরত্ব বেড়েছে কি? জানে না বিন্দু। শুধু মাঝে মাঝে ভাবে, গান ছাড়া বোধহয় আর তার কাছে কিছু নেই। একা লাগে তার। রাম হয়তো বুঝতে পারে কিছুটা। তাই মাঝে একবার প্রস্তাবও দিয়েছিল বিন্দুকে— বোষ্টম হবে সে, কণ্ঠি বদল করে বে করবে বিন্দুকে। সত্যিকারের সংসার হবে, সন্তান হবে। বিন্দুই রাজি হয়নি। রাম বিশ্বাস করতে পারছিল না নিজের কানকে, "বে বসবি না? ঘর-সংসার করবি না তুই?"

না ঘর সংসারের কথা বিন্দু ভাবতেও পারে না এখন। ঈশ্বরের অসীম করুণা, বিন্দু বাঁজা। সন্তান হলে সর্বনাশ হয়ে যেত তার। এখন গান আর পড়ালেখা তার সমগ্র অস্তিত্বটিকেই অধিকার করে রয়েছে। তবে রাম আর বিন্দু স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকে। শুধু বিয়েটাই হয়নি। সুখেই আছে বিন্দু। সুখে না থাকলেও স্বস্তিতেই আছে। গান নিয়ে আছে, গান বাঁধছে, সেই গান শুনছে দশজন। শুধু আজও তার রামমোহন রায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে বলতে, 'দেবতা আমি আপনাকে নিয়ে গান বেঁধে ছড়িয়ে দেব চারদিকে, আপনি হাজার বছর বাঁচুন, আমাদের বাঁচান।'

যজ্ঞেশ্বরীর 'আত্মপ্রকাশ' নিয়ে কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছিল তখন। মেয়েমানুষে কবিয়ালের দলে গান বাঁধছে— এ জিনিস হজম হতে লোকের বেশ সময় লেগেছিল। গোঁড়ারা যেমন গাল দিয়েছিল বেশ, আবার 'সম্বাদ কৌমুদী'[১৯] নামের কাগজখানা খুব প্রশংসাও করেছিল। রাম দাওয়ার খুঁটিতে পিঠ দিয়ে জোরে জোরে পড়ছিল কাগজটা থেকে।

'সম্প্রতি জানবাজারের বাবু রাজচন্দ্র দাসের চতুর্থ কন্যার জন্মোৎসব উপলক্ষে উঁহার জানবাজারস্থ বাটীতে যে কবিগানের আসর বসিয়াছিল তাহা অতি চমৎকার। মূল গায়েন রাম বসুর কণ্ঠমাধুর্যে নাটমন্দিরে উপবিষ্ট সকলেই মোহিত হইয়া করতালি প্রদানে আসর পরিপূর্ণ করেন। তবে সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই অপূর্ব গানগুলির বাঁধনদার যজ্ঞেশ্বরীর আত্মপ্রকাশ। কলিকাতা তো দূরস্থান, সমগ্র বঙ্গে কোনও কবিয়াল দলে নারী বাঁধনদার যে নিতান্ত অদৃষ্টপূর্ব এক ঘটনা, তা বোধকরি আমাদিগের সকল পাঠকই মানিবেন। বঙ্গের এই নবজাগরণের কালে বঙ্গনারীর এই আশ্চর্য কৃতিত্বদৃষ্টে কার না আহ্লাদ হয়? সর্বশক্তিমানের নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা— বঙ্গনারীর এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্জন সমাজের সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশিত হউক এবং তাহার পথপ্রদর্শক হইয়া থাকুক যজ্ঞেশ্বরী দাসীর এই অসামান্য কৃতিত্ব।'

বিন্দু লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল, রামের মুখে মিটিমিটি হাসি— সে কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখছিল আরও কিছু লেখা আছে নাকি। কুণ্ঠাভরে ভিতরবাড়িতেই চলে যাচ্ছিল বিন্দু, পিছন থেকে ডাকল রাম, "ওরে এই কাগজখানার মালিক শুনিছি তোর রামমোহন রায় ঠাকুর। উনিই লিখেছেন নাকি তোকে নিয়ে? নাম লেখা নেই যদিও, তবু উনি নাকি লেখেন এখানে নিয়ম করে। ভগবান তা হলে ভক্তও হন, কী বলিস বিন্দু?" রামের গলার আওয়াজে কি ব্যঙ্গ? বিদ্রুপ? বিন্দু খেয়াল করেনি। তার মনে হয়েছিল তার বুকের ধুকপুক থেমে গেছে এক পলকের জন্য। গোটা দুনিয়াটা ঝাপসা হয়ে আসছে। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে একরকম কেড়ে নিয়েছিল সে কাগজখানা। সে-খানা বুকে জড়িয়ে চলে গেল সে ঘরের ভিতর। খুব সাবধানে নিতে হল কাগজটা, কাপড়ের ভিতরে— বুকের কাছে, নইলে চোখের জলে ভিজে যাবে সেটা। বিন্দু লক্ষ করেনি, দাওয়ায় বসা রামের মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে ক্রোধে ও ঈর্ষায়।

তার পরেও কেটে গেছে আরও ছ'-ছ'টা বছর। এই ছয় বছরে পাল্টে গেছে অনেক কিছু। যজ্ঞেশ্বরী বাঁধনদারের নাম কলকেতা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে শ্রীরামপুর, বারাসাত, জাগুলিয়ায়। লোকে বায়না দিতে এসে জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁ মশায় বসুজা, বলি যজ্ঞেশ্বরীর গান থাকবে তো?" সেটা যে আজকাল রামকে বিশেষ খুশি করে না, সেটা বিন্দুও অল্প অল্প বুঝতে পারে।

ওদিকে রামমোহনও সনাতন ধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্ম ধর্ম পত্তন করেছেন। কলকেতার বাবুরা এখন তাঁর নামে আরও বেশি ছি-ছিক্কার করে থাকেন। কিন্তু রামমোহন আপন

লক্ষ্যে অটল, সতীদাহ বন্ধ করতে তিনি লড়াই আরও জোর করেছেন। বড়োলাট[২০] নাকি তাঁর কথা খুব মানেন, সায়েবেরও ইচ্ছে সতীদাহ বন্ধ হোক একেবারে। বিলেতের রাজার দরবারেও নাকি কথাটা গেছে— জোর চিঠিচাপাটি চলছে, বিন্দু শুনেছে। কলকেতায় এখন বাংলা কাগজ বেরোচ্ছে বেশ। তারা আবার দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে বাবুদের মতোই। 'সম্বাদ কৌমুদী' ছাড়াও 'সমাচার দর্পণ'[২১] সতীদাহের বিরুদ্ধে, আবার ওদিকে 'সমাচার চন্দ্রিকা'[২২] সতীদাহের পক্ষে।

রামের এসবে কোনও নজর নেই। সে দল নিয়ে মহা আতান্তরে আছে। গত বেশ কিছু মাস ধরে বিন্দু আর আসরে আসে না। প্রথমদিকে সেই যে নামডাক হতে শুরু করেছিল বিন্দুর, রামের ভালো লাগেনি বিষয়টা। ভুরু কুঁচকে উঠেছিল তার। স্বাভাবিক। সে রাম বসু, কবিকুলচূড়ামণি— আর লোকে তার কাছেই খোঁজ নিচ্ছে দু'দিন আসরে আসা যজ্ঞেশ্বরীর। কিন্তু লোকজনের উৎসাহের কমতি নেই। যজ্ঞেশ্বরীর বাঁধা গান গাওয়া হবে এমন কথাবার্তা কয়ে তবেই তারা বায়নার টাকা দাখিল করে। দল চালাতে হয়, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে-সব শর্তে রামকে রাজি হতে হয়। আশ্চর্য মানুষের মন, রাম ভাবে, নতুন বিস্ময়ের দিকে কত উল্লাসে ধাওয়া করে— আর কত সহজেই ভুলে যায় পুরোনো যাপনগুলি।

বিন্দুর কলমের কামালে পরপর জিতেছে দল, তবুও রামের মন ব্যাজার— মেজাজ খিটখিটে। বিন্দুর সঙ্গে ভালো করে কথা কওয়া বন্ধ করেছিল, মদের মাত্রা দিয়েছিল বাড়িয়ে। বিন্দু বুদ্ধিমতী মেয়ে, তার উপর কলকেতার বুকে পা রাখার পর থেকে ভাগ্য তার ঘাড় ধরে চিনিয়েছে দুনিয়ার আসল রং, মানুষের মনের আসল রূপ। সে বুঝতে পেরেছিল রামের অসন্তোষ।

পড়াশোনা আর রেওয়াজের ক্ষতির অজুহাত দেখিয়ে আস্তে আস্তে সে নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকে দলের থেকে। রাম বাধা তো দেয়ইনি, উল্টে বেশ খুশিই হয়েছে। বিন্দু হেসেছে মনে মনে, তার বলতে ইচ্ছে হয়েছে— 'কত্তামশাই, 'পুরুষমানুষ' শব্দটায় 'মানুষ'কে ছাপিয়ে 'পুরুষ' এর জয় হল তো শেষ অবধি?' তবে বলেনি সে কিছুই, নিশ্চুপেই থেকেছে। এখন সে আবার নিজেকে ডুবিয়েছে গানে, পড়াশোনাতে। গান সে এখনও লেখা, তবে নিভৃতে— একান্তে। লিখে যত্ন করে তুলে রেখে দেয় হাতবাক্সে।

রামের আনন্দ অবশ্য বেশিদিন থাকেনি। বিন্দু দলের থেকে সরে আসার পরপরই যেন তার লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে। পর পর হেরেছে সে লহরে। লোকে বলাবলি শুরু

করেছে— রাম বসুর গানে আর সে-জিনিস নেই। রাম বহু চেষ্টা করেছে হারানো নামযশ ফিরে পাওয়ার— দলের খোল নলচে বদলেছে, নতুন লোক আমদানি করেছে, গাওনা ধরতে দালালদের পিছনে খরচা করেছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।

কিছুতেই কিছু হয়নি। ভোলা ময়রা অনেকদিনই তাকে ছাপিয়ে কবিয়ালদের নামের ফর্দের মগডালে উঠে বসে আছে, তার উপরে সে-দিনের ছোকরা নীলু ঠাকুরের বাজারও এখন রাম বসুর চেয়ে ভালো। সময় পাল্টাচ্ছে দ্রুত, নীলমণি পাটুনী, গোরক্ষনাথ, সতীনাথ— নতুন নতুন কবিয়ালেরা এসে বাজার মাত করছে। আর রাম এদিকে নিজের দলের লোকজনকেই সামলাতে পারছে না। অনেকেরই বেশ কিছুদিনের মায়না বাকি পড়েছে। গুজগুজ ফুসফুস চলেছে দলের ভিতর— সে-সব রামের অজানা নেই।

মুখে স্বীকার করে না, তবে পাল্টেছে রামও। সখীসংবাদ, আগমনী ছেড়ে আজকাল তার উৎসাহটা খেউড়ের দিকে কিঞ্চিৎ বেশি দেখা যাচ্ছে। রাম বসু বিন্দুকে বলেছিল খেউড় নয়— আগমনী, বিরহ, সখীসংবাদ, শাক্তপদ রচনাতেই কবির আসল পরীক্ষা, আসল তৃপ্তি। সেই রাম বসুই এখন খেউড় বাদে বাকি গান ক্বচিৎ-কদাচিৎ করে। বিন্দু একবার বলতে গিয়েছিল রামকে, "কত্তা খেউড় তো থাকবেই— তবে আমাদের ভোলা ময়রা কিন্তু খেউড় করে নাম কামায়নি। ঠাকুর-দেবতার গানের মিঠে বোলেই ময়রার এত দবদবা।" ভোলা ময়রার নাম শুনে রাম তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল, বিন্দু বেগতিক দেখে আর ঘাঁটায়নি। সেও আজ হয়ে গেল দু'-তিন মাস। বিন্দু জানে, এই দু'-তিন মাস রাম ঘরে বসেই রয়েছে, গাওনা হয়নি কোনও।

আজ হঠাৎ তা হলে সকাল সকাল উঠে কত্তা কাগজ কলম নিয়ে পদ লিখতে বসেছে কেন? নির্ঘাত কেউ বায়না করে গেছে। বিন্দু আস্তে গিয়ে রামের পাশে বসে। জিজ্ঞাসা করে, "কী গো কত্তা, বায়না হয়েছে বুঝি নতুন?" কিন্তু সে কথার উত্তরে সামান্য অপ্রতিভভাবে রাম যা বলল— সে শুনে বিন্দু চোখে আঁধার দেখল। রামমোহনের নামে খেউড় গাইতে হবে? আগমনী, সখীসংবাদ, বিরহ— কিচ্ছু নয়, কবিয়ালের তরজা গান নয়, শুধু খেউড় গাওয়ার জন্য রাম বসুর দলকে ভাড়া করতে চায় জোড়াবাগানের বাবুরা।

"কক্ষনো না।" তড়াক করে ছিটকে উঠে দাঁড়াল বিন্দু।

"গোঁয়ারতুমি করিসনি বিন্দু, তিনমাসে একটাও বায়না নেই, এরপর না খেতে পেয়ে মরব যে সবাই।" রাম মুখ তুলে বলে।

"মরি মরব, তবু এই পাপ কাজ আমা হতে হবে না।"

প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে রাম চেঁচিয়ে ওঠে, "হারামজাদি, তোর জন্যেই তো আজ এই অবস্থা। কী কুক্ষণে তোকে দলে ঢুকিয়েছিলাম। একেই দলে মেয়েছেলে বাঁধনদার বলে দুর্নাম রটেছে, তার উপর ওই নীলু ঠাকুরের ভাই রামপ্রসাদ রটিয়ে বেড়াচ্ছে, রাম বোসের পৌরুষ চলে গেছে— মাগের ভেড়ুয়া হয়ে বসে আছে রাম বোস। কোনও শালার বাবু এখন বায়না করতে রাম বোসের কাছে আসে না। আবার দলের লোকেরা বলছে দিদিকে গায়েন করিয়ে দ্যাখেন না কেনে?" শেষ কথাটা বেশ ভেংচে বলল রাম।

আকস্মিক এই আঘাতে অসাড় হয়ে গেল বিন্দু। তবে এখন আর সে সেই সপ্তদশী তরুণী নয়, উত্তর সে-ও দিতে পারে। বেশ বিঁধিয়ে বিঁধিয়েই সে বলল, "তাই করে দাও না কেন? অন্তত দলের লোকের কাছে মান থাকে।" এইবার রামের মাথা গেল খারাপ হয়ে, অত্যন্ত কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে সে বলল, "তা আর করব না। নইলে বাবুদের গতর দেখাবি, ছেনালি করবি কী করে? শালা ময়লা যায় না কয়লা ধুলে, কসবি মাগি কী আর ঘরের বউ হবে? ভাগ্যিস বে বসিনি।" দুমদুম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল রাম। বিন্দু তখন পাথরের মূর্তির মতো দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে।

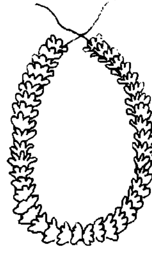
---

১৯. কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয়। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামমোহন রায়। তারাচাঁদ দত্ত ছিলেন প্রকাশক। সম্পাদক হিসেবে ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটি প্রথম সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার শুরু করে।

২০. লর্ড বেন্টিঙ্ক। ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল (১৮২৮-১৮৩৪), ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রদের পিছনে তাঁর উদ্যোগ ছিল স্মরণীয়।

২১. বাংলায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

২২. ১৮২২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র। সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিই রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদক ছিলেন। পরে মনান্তরের কারণে সেখান থেকে সরে আসেন। এই পত্রিকাটি রক্ষণশীল মতের এবং সতীদাহ প্রথার সমর্থক ছিল।



একুশ

সে-দিন দুপুরেই ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল বিন্দু। হাতে একটা পয়সা নেই, কোথায় যাবে কী করবে বুঝতে না পেরে হরিবল্লভীর আখড়ার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ফের। গুরুমা বুড়ো হয়ে পড়েছে একেবারেই। সৌদামিনীই সব সামলাচ্ছে। বিন্দুর কাছে সব শুনে সে বলল, "তুমি কোনও চিন্তা কোরোনি বিন্দুদিদি, আমি যখন আছি— সব ঠিক হয়ে যাবে।" সৌদামিনীর ভরসাতেই সে কয়েকদিন কাটিয়ে দেয় পুরোনো ডেরায়।

বিন্দু ভেবেছিল রাম আসবে। আসেনি। কোনও খোঁজখবর করার প্রয়োজনই বোধ করেনি। পরে নিস্তারিণীর কাছে শুনল জোড়াবাগানে খেউড় ভালোই জমেছিল। শুধু রাম বসুই নয়, আরও দু'-তিনটে দল ভাড়া করেছিল বাবুরা। তারপর রাত তিনটের সময় মদে চুর হয়ে সবক'টা দলকে নিয়ে রামমোহনের বাড়ির সামনে গিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে হাঙ্গামা করেছে। বিন্দু শিউরে উঠে কানে হাত দিয়েছিল।

সে-দিন সারাদিন ধরে সে ঠাকুরকে ডাকল অনেক করে। তারপর সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে সৌদামিনীকে গিয়ে বলল, "সদু, আমি ঠিক করেছি গানের

দল খুলব।” সৌদামিনী ভারী খুশি হয়ে বলল, “তা তো খুব ভালো কথা। জুটে যাও আমাদের সঙ্গে। একসঙ্গে গাইব— যেমন গাইতাম আগে।” বিন্দু মাথা নেড়ে বলে, “তেমন গান নয় রে সদু, নেড়ি গানের ব্যাপার নয়— সবরকমের গান। আমি কবিয়াল হব, আমার নিজের দল হবে। হরু ঠাকুরের মতো, ভোলা ময়রার মতো। আগমনী-সখীসংবাদ-বিরহ-তরজা-খেউড় সব করব।”

সদু ভারী অবাক হয়ে বলে, “মেয়েমানুষ কবিয়াল? বাপের জন্মে এমন কথা শুনিনি ভাই। তবে হবে না কেন? তোর উপর মা সরস্বতীর আশীর্বাদ আছে। সেই সে-বার তোর কত্তামশায়কে যা ঘোল খাইয়েছিলি শ্যামনগরে!” পুরোনো কথা মনে করে বিষণ্ণ হয় বিন্দু। সেটা সৌদামিনী খেয়াল করেছে। তড়িঘড়ি কথা ঘুরিয়ে সে বলে ওঠে, “আর তা ছাড়া এত বছর ধরে নাম তো আর কম করিসনি তুই, বিন্দুদিদি। বরানগর থেকে বউবাজার— যজ্ঞেশ্বরীর নাম এখন সবাই জানে।” মলিন হেসে বিন্দু বলে “ওই নামটুকুই সার রে সদু, নামটুকুই সার। হাতে পয়সা কিছু নেই, এদিকে দল করতে অনেক টাকা লাগবে। বাজনদার-দোহারওয়ালাদের মায়না, দলের ঘর তোলার খরচ। এতসব কোথায় পাই এখন?”

তবে দল হয়েছিল। সৌদামিনী বোধহয় আর-জন্মে মায়ের পেটের বোন ছিল। মানদাসুন্দরী মারা গেছে বেশ কিছুদিন আগে। মিত্তিরবাবুর কল্যাণে তার টাকাপয়সার অভাব তো ছিলই না, অনেকটা সঞ্চয় রেখেও গিয়েছিল সৌদামিনীর জন্য। আর ছিল বাড়িখানা। সেই বাড়ি বেচেও বেশ কিছু টাকা এসেছিল সৌদামিনীর হাতে। সেইসব জড়ো করে সে এনে তুলে দিল বিন্দুকে। বিন্দু কী বলবে ভেবে না পেয়ে কেঁদেই ফেলল। সদু হেসে বলল, “কাঁদলে চলবে কেন কবিয়াল? তোমার সঙ্গে যারা লড়তে আসবে— তাদের কাঁদাও।”

কলকেতায় টাকা ফেললে কী না হয়। বাজনদার জুটল, বাঁধনদার জুটল। দোহার দেওয়ার লোকও জুটে গেল ঠিক। খেটে খাওয়া মানুষ সব— মেয়েমানুষ নিয়ে অত ছুঁতমার্গ নেই। কিন্তু মুশকিল হল বায়না পাওয়া নিয়ে। বাবুরা মেয়ে কবিয়াল ডেকে সমাজের চোখে ছোটো হতে চান না, আর অন্য কবিয়ালরাও মেয়েমানুষের সঙ্গে লড়াই করে বাকিদের হাসির পাত্র হতে বিলকুল নারাজ। বিন্দু ভাবে, লোকে এত কদর করে তার গানের, তবু কবিয়াল হয়ে তার ঠাঁই মিলবে না আসরে?

অবশ্য সাধারণ মনিষ্যির পছন্দ-অপছন্দের কথা কবেই বা ভেবেছে মোড়লের দল। যজ্ঞেশ্বরী দাসীর গানে কলকেতা মাত হলেও, তাকে আসরে গাইতে কেউ দেবে

না। মনোহর তাম্বুলী বাবুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দু'জোড়া চটি ক্ষইয়ে ফেলল, তবু বিশেষ সুরাহা কিছু হল না। একেবারেই কি আর বায়না হয়নি? হয়েছে। ছ'মাসে চুঁচড়োয় একখানা, ব্যারাকপুরে একটা আর আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের মেলায় একটা। তবে সে-সব বিশেষ জুতের নয়— কলকেতার মতো পয়সা পাওয়া যায় না, বুঝদার শুনিয়েরও বেজায় অভাব। পেট ভরে না। মন ভরে না।

ছ'মাস কেটে যাওয়ার পর বিন্দু দেখল হাতে একটাও নতুন গাওনার বায়না নেই। বাজনদার-দোহারেরা এক এক করে দল ছেড়ে যেতে শুরু করেছে। তাদেরও দোষ নেই কিছু। গরিবগুর্বো মানুষ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে জীবন ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। লোক তারা খারাপ নয়, যাওয়ার সময় সকলেই বিন্দুকে বলে গেছে, "কিচু যেন মনে কোরোনি বিন্দুদিদি। ফের গাওনা হলে খপর দিয়ো যেন।" বিন্দু ঘাড় নেড়ে হাসিমুখেই বিদায় দিয়েছে তাদের। তবে গাওনা আর হবে কি? বিন্দুর মনে হচ্ছে, আর হবে না। সে নিজেই বা এভাবে আর কতদিন সৌদামিনীর ঘরে বসে থাকবে নিষ্কর্মার মতো? নাঃ, তার কপালে ভগবান কবিয়ালের সম্মান লেখেননি মনে হয়। বিন্দু ঠিক করে ফেলেছে, নেড়ির দলেই সে জুটে যাবে আবার।

সকালবেলা সে আর সদু এখন একসঙ্গেই ঠাকুরঘরে নামগান করে। একদিন গান শেষ হলে সে সদুকে বলতে যাবে নিজের সিদ্ধান্তের কথা, এমন সময় নেড়ির দলের চাকর ভজহরি এসে খবর দিল— একটা লোক এসে নাকি যজ্ঞেশ্বরী দাসীকে খুঁজছে। অবাক হয়ে বিন্দু বেরিয়ে এল দাওয়ায়, তাকে কে খোঁজে? লোকটাকে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ যে সেই ছোকরা কবিয়াল। নীলু ঠাকুর। একেবারে সুবোধ বালক সেজে এসেছে। সাধারণ ফতুয়া আর ধুতি পরনে। চুলের বাহারও যেন অনেকটা কম। মুখে সেই তাচ্ছিল্যের ভাবটাও নেই— দেখল বিন্দু। সদুও পিছন পিছন বেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে। ছোকরাকে দেখে সে বেশ খেঁকিয়ে উঠেই বলল, "কী চাই এখানে সকাল সকাল?"

বিন্দু হাত তুলে থামিয়েছে সদুকে। সৌদামিনীর দোষ নেই অবশ্য। একেই তাদের আখড়াটা সিমলাপাড়ার কসবিপট্টির ধার ঘেঁষে। তার উপর নেড়ির দলের সব মেয়ে একসঙ্গে থাকে— দিনদুপুরে ইয়ার্কি দিতে আসার লোকের অভাব নেই। বিন্দু নীলু ঠাকুরের চোখে চোখ রেখে কিন্তু সদুর কথাগুলোই আর-একবার উচ্চারণ করল। "কী চাই এখানে সকাল সকাল?" তবে তার গলায় খ্যাঁকানি নেই, বরং একটা ভারী গাম্ভীর্য রয়েছে। ছোকরা একটু ঘাবড়েই গেছে বোধহয়। ফস করে হাত জোড় করে

ফেলেছে। মাথা নুইয়ে ভারী নরম গলায় বলল, “আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে একটু কথা হতে পারে?”

* * *

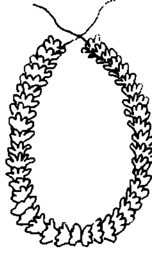
নীলু ঠাকুর চলে গেছে একটু আগে। বেলা হয়েছে অনেক। নাওয়া-খাওয়া কিছুই হয়নি বিন্দু-সদুর। অবিশ্যি নীলু ঠাকুরের কথা শুনে নাওয়া-খাওয়ার মনও নেই ওদের। যজ্ঞেশ্বরীকে দলের পাকা বাঁধনদার হিসেবে রাখতে চায় সে। মাস-মায়না ছাড়াও প্রতি আসরের জন্য কিছু উপরি পাবে বিন্দু। “আমার ‘উপস্থিতি’ ভালো নয়। কিন্তু সে-দিন জানবাজারে আমি বসুজাকে হারিয়েই দিতাম, যদি না...,” বিন্দুর চোখে চোখ রেখে নীলু থেমে যায়। বিন্দু আশ্চর্যই হয়েছে বেশ। এ ছেলের চোখ তো সাংঘাতিক। নীলু ঠাকুরের ঝকঝকে চোখে অবশ্য আরও কী যেন একটা আছে, ঠিক ধরতে পারছে না বিন্দু। তরুণ কবিয়ালের কটা রঙের মণি স্থির হয়ে চেয়ে রয়েছে বিন্দুর কৃষ্ণ-আঁখির দিকে। পুরুষের দৃষ্টি বিন্দুর কাছে নতুন নয়, কিন্তু এই দুটো চোখ একেবারেই অন্যরকম। দামাল, সহজ, বাঁধনছেঁড়া। কেমন একটা নেশা ধরিয়ে দেয়।

বিন্দু চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। অন্যদিকে তাকিয়ে বলেছিল, “আপনি তো জানেন আমি আগে অন্য দলে গান বাঁধতাম...।” বিন্দুর কথায় বাধা দিয়ে নীলু বলে উঠল, “আমি জানি, আপনি ছিলেন রাম বসুর...।” বিন্দুর বুক ধুকপুক করে উঠেছে কথার মাঝেই। এখুনি না জানি কী বলে বসবে অবিবেচক এই তরুণ। কিন্তু বিন্দুকে স্বস্তি দিয়ে কথা শেষ করে নীলু, “আমি জানি আপনি ছিলেন রাম বসুর দলের পয়লা নম্বরের বাঁধনদার। কিন্তু এ-ও জানি, আপনি সে-দল ছেড়ে দিয়েছেন। তাই অনেক খোঁজ করে আমি এসেছি আজকে।” বিন্দু রাজি হবে কি না বুঝে উঠতে পারছিল না। আবার নতুন করে কারও অধীনে কাজ করতে মন চাইছে না তার।

আশ্চর্য, কীভাবে যেন বিন্দুর মনের কথা বুঝে নিয়েছে নীলু ঠাকুর। খুব ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে বলেছে, “তবে একটা কথা, আমাদের দলে গায়েন, দোহার, বাঁধনদার, বাজিয়ে— সকলের সমান স্থান, সমান সম্মান। কর্মভাগ থাকলেও বর্ণভাগ নেই। আপনার অসুবিধা হবে না তো?” শেষ কথাটা বলে মিটিমিটি হাসল সে। বিন্দু এবার কৃতজ্ঞ চোখে চাইল নীলুর দিকে। নীলু একইরকমভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে, যেন দেখে নিতে চায় বিন্দুর ভিতরটা অবধি। বিন্দুর গাল এবার লাল হয়ে উঠছে,

পাশে বসা সৌদামিনী খেয়াল করেছে তা। বিন্দুকে এই অস্বস্তি থেকে রেহাই দিতে সে তড়িঘড়ি বলে ওঠে, "তা সে-সব এখন বলা যাবেনে। বেলা গড়িয়ে যায়, আপনি এখন আসুন গে, আমরা এট্টু ভেবে দেখি।"

নীলু ঠাকুর চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ দাওয়ায় পাশাপাশি বসেছিল দুই সই। শেষে নীরবতা ভেঙে সৌদামিনীই বলে উঠল, "কী করবি? হ্যাঁরে বিন্দুদিদি?" বিন্দু উত্তর দিল না, কি যেন ভাবছে সে অন্যমনস্ক হয়ে।



বাইশ

অনেক ভেবেচিন্তে নীলু ঠাকুরের প্রস্তাবে রাজিই হয়েছিল বিন্দু। নিস্তারিণীকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল। নিস্তারিণী ফিরে এসে বলল, “ওরে বাবা, সে-ছোঁড়া যে কী খুশি— আর কী খুশি, সে আর তোমায় কী বলব গো বিন্দুদিদি। খবরটা শুনে অবধি একেবারে তুড়ুক লাফ মারছে যে গো। আহ্লাদের চোটে আমায় একটা আধুলি অব্দি বকশিশ করেছে এই দেখো সে।” চকচকে আধুলিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল সে। বিন্দু হেসে বলল, “তবে আর কী? ওই দিয়ে ফুর্তি করগে যা।” হাসছে বটে, কিন্তু বিন্দুর মন এখনও সংশয়ে আকুল, কাজটা কি ঠিক করল সে?

বিন্দুর সংশয় অবশ্য দূর করে দিয়েছিল নীলু ঠাকুর। কথা সত্যিই বলেছিল সে। দলের মধ্যে গায়েন-দোহার-বাঁধনদার-বাজনদারের ভেদাভেদ নেই। সকলে যে যার কাজ করে, যোগ্যতামতো পয়সা পায়। একসঙ্গেই তাদের খাওয়াদাওয়া আড্ডা-তামাশা। রেষারেষি লাগানি-ভাঙানি নেই। বিন্দু ভেবেছিল, একে সে নতুন লোক, তার উপরে মেয়েমানুষ, দলের লোকেরা মেনে নেবে না তাকে সহজে। আবার বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো ‘রাম বসুর মাগ’ পরিচয়টাও লেপ্টে রয়েছে তার সঙ্গে। ঝামেলা তো কিছু হবেই। মন কঠিন করেই বিন্দু পা রেখেছিল নীলু ঠাকুরের আখড়ায়।

আখড়ায় এসে অবিশ্যি দেখল মিছামিছিই সে ভয় পাচ্ছিল। তাকে সবার সঙ্গে

আলাপ করিয়ে দিল নীলুর ভাই রামপ্রসাদ। নীলুর চেয়েও সে বয়েসে ছোটো। হাসিখুশি ছেলেটা প্রথম থেকেই 'দিদি দিদি' করে বিন্দুকে আপন করে নিয়েছে। দলের বাকিদেরও বয়েস বেশি না। কিছুক্ষণেই বিন্দু সবার 'যজ্ঞিদিদি' হয়ে বসেছে।

একটু সন্দেহ ছিল কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্যকে নিয়ে। সেই একমাত্র বয়স্ক লোক এখানে। বহুঘাটের জল খাওয়া পাকা লোক। কিন্তু দেখা গেল সে-ও মিষ্টি হেসে বিন্দুকে বলছে, "ভালোই হয়েছে তুই এসে গেছিস মা। বুড়ো হয়েছি, একা এত গান লিখে সামলে উঠতে পারি না। তুই এবার সব দেখে বুঝে নে।" একটু দূরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিল নীলু। বয়স অল্প হলেও প্রখর বুদ্ধি তার। বিন্দুকে নিজের মতো করে দেখেশুনে মিশে যেতে দিয়েছে সে। বিন্দু কৃতজ্ঞ চোখে তাকায় তার দিকে। ছেলেটা বেশ ভালো, বেশ অন্যরকম।

বিন্দু দলে আসার পর থেকে দলের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। এখন গাওনায় তাদের তরজা গানগুলো আরও ক্ষুরধার, আরও মোক্ষম হয়েছে। সখীসংবাদের গানে কৃষ্ণমোহন বরাবরই একটু কাঁচা। হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রার দলে মূল গায়েন সে খামতিটা ঢেকে দিত নিজেরাই। কিন্তু নীলু ঠাকুরের দলে সেই কমজোরিটা বড়ো চোখে পড়ত এতদিন। কিন্তু বিন্দু এসে অনেকটাই শুধরে দিয়েছে সেইটে।

আরও একটা কাজ করেছে সে— নীলু ঠাকুরকে উপস্থিতির তালিম দিয়েছে জোরদার। প্রতিপক্ষের শরীরী ভাষা দেখে কেমন করে তৈরি করতে হবে তরজার অভিমুখ, দর্শকের মন বুঝে কোথায় আনতে হবে তরল উচ্ছ্বাস— কোথায়-ই বা গানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে আবেগী মনখারাপের সুর— হাতে ধরে বিন্দু শিখিয়েছে নীলুকে। নীলু বাধ্য ছাত্রের মতো রপ্ত করেছে সেইসব কৌশল। তার সুফলও পাওয়া গেছে দ্রুত। আজকাল অনেক আসরেই বাঁধনদারের উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে না নীলু ঠাকুরকে।

এদিকে বিন্দু কয়েকদিনে একরকমের কর্ত্রীই হয়ে বসেছে দলের। দলের সকলের সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা, খাওয়াদাওয়ার জোগাড় সে দায়িত্ব নিয়েই করে। কাড়াদার ভজগোপালের সর্দি হয়েছে— যজ্ঞিদিদির হাতে তৈরি ক্বাথ চাই তার। একাদশীর দিন শাক্তবাড়িতে গাওনায় ডেকে এনে আমিষ খাবারের বন্দোবস্ত করে ফেলেছে বায়নাদারেরা ভুল করে— বিন্দু কোমর বেঁধে বসে গেল তোলা উনুনে খিচুড়ি রাঁধতে। নতুন দুই ছোঁড়া শিক্ষানবিশ হয়ে ঢুকেছে দলে— শংকর আর বৃন্দাবন,

কাজে তুমুল ফাঁকি মারে আর থেকে থেকে ঝগড়া করে এ ওর সঙ্গে। বিন্দুর কাজ হল দুটোর ঘেঁটি ধরে এনে আচ্ছা করে কড়কে দিয়ে কাজে জুতে দেওয়া। ভট্‌চাজমশায়ের থেলো হুঁকো খুঁজে পাচ্ছেন না, অথচ কলমে হাত দেওয়ার আগে নিজের হুঁকোয় একবার গুড়ুক না টানলে তাঁর কলম সরে না। বিন্দু ছাড়া আর কে-ই বা বাতা থেকে বার করবে গুঁজে রাখা হুঁকো। মোদ্দা কথা যজ্ঞিদিদি ছাড়া দল এখন অচল একেবারে।

আসরেও তাই তাকে যেতে হয় নিয়মিত। সে থাকলে দলটা যেন চাঙ্গা হয়ে থাকে। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু বিন্দু আসরে থাকলে নীলু ঠাকুরের উৎসাহ প্রবল পরিমাণে বেড়ে যায়— বিন্দু লক্ষ করেছে। তখন কবিয়াল নীলু ঠাকুর অপ্রতিরোধ্য। প্রতিপক্ষকে গানের লড়াইয়ে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে এক কোণে বসে বিন্দুর দিকে মিটিমিটি চায় আর হাসে। বিন্দুও হাসে মনে মনে— পাগল ছেলে একটা!

ক্রমে মাস-দুয়েক কেটে গেছে, বর্ষার শেষ দিক এখন। সেই ভোরবেলা থেকে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়ে এই ধরেছে একটু। বিন্দু কাদা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আখড়ার দাওয়ায় উঠে দেখল দলের লোকজন সব গোল হয়ে মুখ আঁধার করে বসে রয়েছে।

একটু দূরে সরে সামনে জলচৌকির উপর কাগজকলম নিয়ে বসে আছে নীলু। তার মুখচোখও থমথম করছে। কেমন একটা দমচাপা পরিবেশ। বিন্দু বোঝেনি কিছু। কলবল করে সে জিজ্ঞাসা করেছে, "কী গো ভালোমানুষের পো-রা, সক্কলে এমন থুম মেরে বসে রয়েছ কেন?" কৃষ্ণমোহন নীরবে তামাক টানছিল। বিন্দুর প্রশ্নের উত্তরে মুখ থেকে হুঁকো সরিয়ে সে শুধু বলল, "গাওনার বায়না এসেছে সকালবেলা।" বিন্দু মহা উৎসাহে বলে উঠেছে, "এ তো ভালো কথা। তা তোমরা সকলে এমন ভ্যাবলা হয়ে আছ কী কারণে?" কৃষ্ণমোহন কী একটা বলতে যাচ্ছিল, নীলু হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়েছে। তারপর তার ইশারাতেই সকলে এক-এক করে উঠে চলে গেছে ভিতরবাড়িতে। এইবার বিন্দু বুঝেছে ব্যাপার কিছু গুরুতর। সে উঠে এসে বসেছে নীলুর মুখোমুখি। নরম গলায় জিজ্ঞাসা করেছে, "কী হয়েছে? খারাপ কিছু?"

খারাপ কিছুই হয়েছে বটে। ভূকৈলাশ রাজবাড়ি থেকে গাওনার বায়না করে গেছে ছোটো নায়েব। পঞ্চাশটি টাকা আগাম, গাওনার শেষে আরও পঞ্চাশ। জিতলে রাজামশাই নিজে পুরস্কার দেবেন তিনশো টাকা। কিন্তু এর মধ্যে মস্ত বড়ো একটা 'কিন্তু' রয়েছে। লড়াই হবে রাম বসুর সঙ্গে। বিন্দু হাঁ হয়ে গেছে। সে এ দলে আসার পরে আর নীলু ঠাকুরের সঙ্গে রাম বসুর লহর হয়নি। বিষয়টা নিতান্তই স্পর্শকাতর— তাই সকলেই এড়িয়ে যেত। সুযোগ যে আসেনি, তা নয়— কিন্তু নীলু ঠাকুর রাজি

হয়নি সেই বায়নাগুলোয়। তবে আজ কেন রাজি হয়ে গেল সে, বিন্দু অবাক হয়ে ভাবে, পয়সার জন্য?

"টাকা-পয়সার জন্য নয় গো যজ্ঞেশ্বরী, টাকা-পয়সার জন্য নয়।" বিন্দুর মনের কথা যেন শুনতে পেয়েই তাকে আশ্বস্ত করে নীলু। পুরো দলে সকলেই বিন্দুকে 'দিদি' বলেই ডাকে, নীলু ঠাকুর ছাড়া। বিন্দু আপত্তি করেনি, বরং মনের কোণে একটু ভালোলাগাই যেন ছিল তার। নীলু 'যজ্ঞেশ্বরী' বলেই ডাকে বিন্দুকে। নীলুর কথা শুনে আরও অবাক হয় বিন্দু। টাকাপয়সা নয়, তবে কী কারণ? নীলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে, গলা নামিয়ে বিন্দুকে খুলে বলে ব্যাপারখানা।

বিন্দু যে রাম বসুর দল ছেড়ে নীলু ঠাকুরের দলে ভিড়েছে, সেইটে এখন কলকেতার রসালো খবর। চতুর্দিকে কেচ্ছা ছড়াচ্ছে প্রচুর। লোকে রাস্তাঘাটে রসালো ছড়া কেটে গাইছে। এমন জানদার কেচ্ছাখানা ভূকৈলাশের রাজবাড়িতেও পৌঁছেছে গিয়ে। অতি উৎসাহী কে আবার একজন গিয়ে রাজামশায়ের কানে বুদ্ধি দিয়েছে, দুই দলকে লড়িয়ে দিলে খাসা হয়। আসরের মাঝে ওই মেয়েছেলেটা বসে থাকবে, আর নীলু ঠাকুর, রাম বসু ষাঁড়ের মতো লড়বে। এমন তামাশা বহুদিন হয়নি। টাকা তো দিচ্ছেনই রাজাবাহাদুর, কিন্তু সঙ্গে কড়া হুকুমও পাঠিয়েছেন। এ আসরে না বলা যাবে না। আর ভূকৈলাশের রাজার সঙ্গে শত্রুতা করলে কোনও কবিয়াল বাজারে টিকতে পারবে না, এ কোলের খোকাটাও জানে।

অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসেছিল বিন্দু। এই তবে কবিয়ালদের আসল জায়গা? বড়োমানুষের বিকৃত উল্লাসের তালে তালে বাঁদরনাচ নাচাই তবে তাদের ভবিতব্য? এই তবে সমাজে কবির সম্মান? বিন্দুর হাসি পায়। কোন বিভ্রমের মায়ায় চোখে ঠুলি বেঁধে বসে রয়েছে তারা? নীলু চুপচাপ তাকিয়ে রয়েছে বিন্দুর দিকে। সে-চোখের ঔজ্জ্বল্য আজ ম্লান। ভূকৈলাশের রাজবাড়িতে যজ্ঞেশ্বরীর বস্ত্রহরণ হবে, সোল্লাসে দেখবেন কলকেতার মান্যিগণ্যি মানুষ সব। বিন্দুকে ঠিক কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, জানে না নীলু।

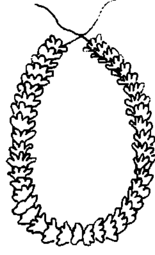
হঠাৎই চোখ তুলে তাকিয়েছে বিন্দু। "যাব। আমরা যাব গান করতে।" তার কণ্ঠস্বর শাণিত কঠিন। চমকে উঠেছে নীলু। বিন্দুর চোখ জ্বলছে কী এক আশ্চর্য প্রতিজ্ঞায়। নীলু ঠাকুর যেন মোহগ্রস্তের মতোই প্রশ্ন করেছে, "আমরা যাব গান করতে?"

"হ্যাঁ, আমরা যাব। যেতে আমাদের হবেই।" বিন্দু ফের বলেছে, "মাথা উঁচু করে লড়ব, পালাব না।" বিন্দুর চোখে কী দেখল নীলু— তা শুধু সেই জানে। একটু থেমে

সে বলল, "বেশ। কিন্তু এক শর্তে। তুমি যাবে না।" এবার অবাক হওয়ার পালা বিন্দুর। "আমি যাব না?"

"না, তুমি যাবে না। ভরা আসরে তোমার অপমান আমি সইতে পারব না। না, সে আমি হতে দেব না কিছুতেই।" নীলু ঠাকুরের ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কোন এক অজানা আবেগে। খপ করে সে বিন্দুর হাত দু'খানি নিজের হাতে নিয়ে উত্তেজিতভাবে বলল, "আমায় কথা দাও তুমি, কথা দাও, যাওয়ার জন্য জোর করবে না। তুমি বললে সে-কথা আমি ফেলতে পারব না যে।"

বিন্দু হাসল। বড়ো দুঃখের সে হাসি। মরেছে নীলু ঠাকুর। এই তরুণ বয়েসেই নিজের হৃদয়ের মালিকানা হারিয়েছে সে। হারিয়েছিল বিন্দুও একদিন। তাই সে জানে— মন হারানোয় কত জ্বালা। কিন্তু সে নীলুর হাত থেকে হাত সরিয়ে নিল না। শুধু বলল, "বেশ। আমি যাব না। কিন্তু কথা দাও তুমি জিতে ফিরবে।"



তেইশ

কথা দিয়েছিল, কিন্তু কথা রাখতে পারেনি নীলু ঠাকুর। গাওনা চলার কথা ভোর রাত অবধি। বিন্দু নিজের ঘরে সারারাত এপাশ-ওপাশ করেছে, অসহ্য উৎকণ্ঠায় ঘুম আসেনি তার। ভোর হতে না হতেই একরকম দৌড়ে দৌড়েই গেছে সে আখড়ার দিকে। ঘরগুলো খাঁ-খাঁ করছে। এতগুলো লোক গেল কোথায়? নীলু ঠাকুর-ই বা কই? এখনও গাওনা শেষ হয়নি নাকি? এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বিন্দুর চোখ পড়ল কৃষ্ণমোহন ভট্চাযের দিকে। ভট্চাজমশাই কুয়োতলা থেকে দাঁতন করে ফিরছে। বিন্দুকে দেখেই তার মুখ আঁধার হয়ে গেল। বিন্দুকে ইশারায় দাওয়ায় বসতে বলে সে নিজেও বসল তার পাশে এসে মাথা নিচু করে।

গাওনা ভোর রাত কেন, রাত দুপুর পর্যন্তও গড়ায়নি। হেরে গেছে নীলু ঠাকুর। হেরে গেছে, বা বলা ভালো হার মেনে নিয়েছে। বিন্দু লাফিয়ে উঠেছে, "কী বলছেন কী, ভট্চাজ মশায়?" ভট্চাজ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে, তারপর বিস্তারে বলতে শুরু করে গত রাত্রের ঘটনা।

বিন্দু যায়নি দেখে বাবুরা একটু হতাশই হয়েছিল। সবাই যেন ধরেই নিয়েছিল বাঁধনদার যজ্ঞেশ্বরী ছাড়া কি আর নীলু ঠাকুর একা একা গাইতে আসার সাহস করবে? রাজাবাহাদুর অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছু বলার জো নেই— বায়নার সময় এমন কিছু

আলাদা করে বলে আসা হয়নি। দলের কথাই বলা হয়েছিল, নীলু ঠাকুর দল নিয়ে হাজির— বলার কিছু নেই আর।

বিন্দুকে না দেখে রাম বসু হতাশ হয়েছিল, নাকি স্বস্তি পেয়েছিল— সেটা অবশ্য তাকে দেখে বোঝা যায়নি। তবে তরজা শুরু করেছিল সে হিংস্রভাবে। আসর বন্দনার পরেই সরাসরি খেউড়ে ঢুকে যায় রাম বসু। নীলু ঠাকুর সরাসরি এত তীব্র আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে একটু হকচকিয়ে যায়। রাম বসু কুৎসিততম গালাগালি মিশিয়ে দিচ্ছে গানের কলিতে।

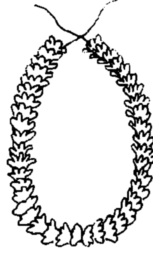
একটু সামলে নিয়ে নীলু প্রত্যুত্তর দিতে যাবে, রাম হানল প্রচণ্ড আঘাত। নীলুকে সে পরস্ত্রী-অপহারক রাবণ বলে গাল দিয়েছে। ইঙ্গিতটা বিন্দুর দিকেই। নীলু স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাবুদের উল্লাসের সীমা নেই। মেয়েছেলেটা থাকলে মজা আরও জমত বটে, তবে এখনও কিছু কম হচ্ছে না তামাশা। বাবুদের ফুর্তি দেখে রাম বসুও দ্বিগুন উৎসাহে ফুটছে টগবগ করে। তাতে ইন্ধন দিয়েছে বিন্দুর উপর তার ক্রোধ আর নীলু ঠাকুরের প্রতি ঘৃণা।

রাম রাজাবাহাদুরের দিকে ফিরে নমস্কার করে বলল, "রাজামশায়ের অনুমতি নিয়ে বলি— একটুখানি ভুল করেছি। নীলু ঠাকুরকে রাবণ বলাটা আমার উচিত হয়নি। রাবণ তো সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিলেন, শূর্পণখাকে নয়। গন্ডগোল আমারই, শূর্পণখাকে সীতা বলে ভুল করেছি আমি। সুতরাং নীলু ঠাকুরকে ভর্ৎসনা নয়, প্রশংসা করা উচিত। শূর্পণখা অপহরণ করে তিনি সমাজের প্রভূত উপকার করেছেন।"

রাম বসুর তীব্র তীক্ষ্ণ কদর্য শ্লেষে জনতা তীব্র অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। হো-হো করে হাসছেন রাজামশায়ও। ক্রোধে, অপমানে দু'চোখ ফেটে জল আসছে নীলু ঠাকুরের। কিন্তু সে কী করে উত্তর দেবে এর? রাম বসু আজ তৈরি হয়ে এসেছে যজ্ঞেশ্বরীকে কদর্য অপমান করার জন্য। নীলু ঠাকুর কিছু বললেই সে সরাসরি যজ্ঞেশ্বরীর নাম নিয়ে খেউড় করবে এবার— সেটা ভালোই বোঝা যাচ্ছে। না, নীলু তা হতে দিতে পারে না। নিষ্ঠুর এই সভায় যজ্ঞেশ্বরীর আর অপমান হতে দেবে না সে। তার থেকে তার নিজের হারও অনেক ভালো। নীলু ঠাকুর রামের কথার উত্তর না দিয়ে বসে পড়ল নীচে। রাম বসুর দলের সহর্ষ চিৎকার, জনতার উচ্ছ্বাস আর বাবুদের হাততালির মধ্যে মাথা নিচু করে বসেই রইল সে।

"গান শেষ হতেই সে কোথায় যেন চলে গেছে, দলের সঙ্গে এল না। দেখো গে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হয়। আসার আগে আবার রাজাবাহাদুরের

নায়েবের হাতে বায়নার পুরো টাকাটাই ফেরত দিয়ে এসেছে সে-ছোঁড়া।" মুখ নামিয়েই কথা শেষ করল ভট্‌চাজ। বিন্দু এতক্ষণ নিশ্চুপেই সব শুনছিল। তার দৃষ্টি দূরে আকাশের দিকে নিবদ্ধ। শুনতে শুনতে কখন যেন তার চোখ উপচে জল এসেছে, সে টের পায়নি। এখনও সে সেই অশ্রুধারা রোধ করার কোনও চেষ্টাই করল না।



চব্বিশ

নীলু ঠাকুরের আখড়ায় আর যায়নি বিন্দু। সৌদামিনী অবাক হয়েছে, সামান্য খুঁচিয়েছে, এমনকি কিছুটা বকাবকিও করেছে। কিন্তু বিন্দু অটল। নীরবেই মাথা নেড়েছে সে। সৌদামিনী শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ভট্‌চাজ এসেছিল আখড়া থেকে, অনেক সাধ্যসাধনাও করেছে। লাভ হয়নি। বিন্দু আর যাবে না ওখানে। যেতে পারবে না সে। মাঝে মাঝে মনে হয় যোগমায়াই কী ঠিক বলেছিল? ঠিক বলেছিলেন মোক্ষদাঠাকুমাও? সে কি সত্যিই মূর্তিমান অলক্ষ্মী? সে তো কারও জীবনে শান্তি এনে দিতে পারে না— শুধুই সর্বনাশ।

বাবা মা তো ছেড়ে চলে গেছেন কবেই, দিদি কত আদর করত, সেই দিদিও তো শেষে... নিতান্ত কপালপোড়া না হলে এমন হয় কখনও? তারপর অষ্টপুরের ঠাকুরমশায়, তিনিও তো হুট করেই চলে গেলেন। বিধুদিদি তাকে টেনে নিতে চেয়েছিল কাছে। বিধুদিদিও চলে গেল সব টান ছাড়িয়ে। আর ওই রাম বসু, তার কত্তামশায়— তার সঙ্গে-ই বা সম্পর্ক টিকল কই? আর আজ এই নীলু ঠাকুর। তার জীবনটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিন্দুর কাছে এসে। বিন্দু যদি এরপরেও জড়িয়ে থাকে নীলুর জীবনের সঙ্গে, দলের সঙ্গে— তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু। না, না, সে হয় না— সে হতে পারে না। বিন্দু থরথর করে কেঁপে ওঠে। ভয়ে, আশঙ্কায়, তীব্র হৃদয়বেদনায়।

নীলু ঠাকুর নিজে এসেছিল শেষে। বিন্দু কাউকে কিছু না বলেই চলে এসেছে, গত মাসের পাওনা টাকা পর্যন্ত নেয়নি। সেই টাকা দিতে আসার অছিলায় একদিন বিকেলে এসে দাঁড়িয়েছিল সে উৎসুক মুখে। সৌদামিনী দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল নীলুর ডাক শুনে। সৌদামিনীর সঙ্গে কথা বলছিল বটে নীলু, কিন্তু তার বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল ভিতরবাড়ির দিকে। যার জন্য নীলু ঠাকুর এতদূর উজিয়ে এল, সে কোথায়? বিন্দু বাইরে বেরোয়নি। নীলু ঠাকুর এসেছে সে জানে। না, ও ছেলের সামনাসামনি হওয়ার সাহস নেই তার। উজ্জ্বল দুই চোখ মেলে ও ঠিক পড়ে নেবে বিন্দুর ভিতরটা। বিন্দুর সম্মান বাঁচাতে নিজের মান ধুলোয় লুটিয়ে দিতে দুইবার ভাবেনি ও ছেলে। বিন্দু কিছুতেই তাকে আরও সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে পারবে না।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। কতক্ষণ, বিন্দু জানে না। ঘরের ভিতর থেকে সে শুনছে— নীলু তর্কাতর্কি করছে সদুর সঙ্গে। যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে সে দেখা করবেই। সৌদামিনীও কড়া জবাব দিচ্ছে তার। হঠাৎই বাইরেটা চুপচাপ হয়ে গেল। টিপটিপ বুকে বিন্দু জানালা অল্প ফাঁক করে দেখল নীলু ঠাকুর মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে পিছন ফিরে। বিন্দু একদৃষ্টে সে-দিকে তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ না অঝোরধারে নেমে আসা অশ্রুধারায় তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

* * *

এখন কী করবে সত্যিই জানে না বিন্দু। ঈশ্বর তাকে নিয়ে কী যে খেলা খেলছেন— সে ভেবে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ক'দিন ধরে সে শুধুই কাঁদল। তারপর যখন সে একটু ধাতস্থ হয়ে ভাবছে এইবার সদুকে বলে ফের নেড়ির দলেই ফিরবে, তখনই সবক'টা দাঁত বার করে হাজির মনোহর তাম্বুলী। গাওনার খবর এনেছে সে। অবাক হয়ে গেছে বিন্দু, তাকেই নাকি গাওনায় চাইছে বরানগরের এক বাবুর বাড়িতে। মনোহর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার পর তার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না।

ঘাবড়ে গিয়ে সে বলল, "সায়েব? বলো কী মনোহরদাদা।"

"তবে আর বলচি কী?" মনোহর হেসে বলল, "সায়েবের বাসনা কবিয়াল হবে। ভোলা ময়রার কাচে গেসলো তালিম নেবে বলে। ভোলা হাঁকিয়ে দিয়েচে। তারপর কোত্থেকে না জানি গান শিখেচে, এখন লহরে নামতে চায়।"

"গান শিখেছে? তুমি দেখেছ সে সায়েবকে? "

"তা আর দেখিনি? এই লম্বা, ধপধপ করচে ফরসা। সোনালি চুল, আবার চূড়ো করে বেঁধেছে। কেরেস্তানের সঙ্গে কেউ আসরবন্দনা করে নামতে চাইচে না লড়াইতে। ইদিকে সায়েবও গাওনা গেয়েই ছাড়বে। বরানগরে একখান মেজোগোচের বাবু রয়েচে, শেষে তাকে যে ধরেচে সায়েব। সায়েবের গান শুনতে বাবুর ভারী শখ। তা সায়েবকে বলেচে, 'তোমার সঙ্গে কে লড়বে ঠিক করে আনো সে, আমার কোনও আপত্তি নেইকো।'"

"আমার সঙ্গে সায়েব লড়বে?" সামান্য দ্বিধাভরে বলল বিন্দু।

"আরে দিব্যি লড়বে। তোমার কোনও আপত্তি থাকলে বলো বিন্দুদিদি।"

বিন্দু হাসে, "আমার আর কী আপত্তি থাকবে বলো মনোহরদাদা? ছিলুম বামুনের মেয়ে, কসবিপট্টি ঘুরে এসে হলুম বোষ্টম। তারপরে যার সঙ্গে এতগুলো বচ্ছর কাটালাম, সে বলল আমি বেশ্যা। আর এখন কলকেতার সবাই আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমি আসলে একটা নষ্ট মেয়েমানুষ, বেহায়া শূর্পণখা। আমার কী আপত্তি থাকতে পারে বলো?" তার পরে একটু থেমে বলেছিল, "কিন্তু এদিকে তো দলের কোনও ব্যবস্থা নেই। লোকজনই নেই, তায় দল! কী করে কী হবে?"

সে-ব্যবস্থাও হয়েছিল। ক'দিনের মধ্যেই তার কাছে এসে ভিড় জমাল ভজগোপাল, বৃন্দাবন, শংকর, নীলু ঠাকুরের দলের অনেকেই। থেলো হুঁকো হাতে ভট্‌চাযমশায়ও এসে হাজির। বিন্দুর যেন আর অবাক হওয়ারও ক্ষমতা নেই। সৌদামিনী ওদিকে আহ্লাদে আটখানা। প্রবল ব্যস্ত হয়ে সে সকলের থাকা-খাওয়ার আয়োজন করতে লেগে গেল সোৎসাহে। বিন্দু মনোহরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "এসব কী কাণ্ড মনোহরদাদা?" ভট্‌চাজ এগিয়ে এসে বলল, "আরে ও তাম্বুলীর পো কী বলবে তোমায়? আমি বলছি ব্যাপারখানা।" ব্যাপার শুনে চক্ষু চড়কগাছ বিন্দুর।

সায়েব কবিয়ালদের দোরে ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল নীলু ঠাকুরের কাছে। নীলু ঠাকুর তাকে বলেছে যজ্ঞেশ্বরীর কথা। আর দলের লোকদেরও সে বলেছে, "তোরা যা সবাই। আপনি ওদের নিয়ে যান ভট্‌চাজমশাই। না-হলে সে বুঝতে চাইবে না। আর তাকে বলবেন, কবিয়াল হওয়ার জন্যই তার জন্ম— এটা যেন সে ভুলে না যায়।" নীলু ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বিন্দু মনে মনে মাথা নোয়াল। আর মনে মনেই বলল, 'ভুলব না, আমি ভুলব না। আর তোমাকেও যজ্ঞেশ্বরী ভুলবে না। দেখো তুমি।'

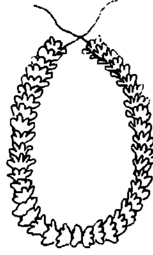
গাওনার দিন সন্ধেবেলা বিন্দু ভয়ে ভয়ে সৌদামিনীকে ডেকে বলল, "ও সদু, আমার যে পেট গুড়গুড় করছে।" সৌদামিনী বলল, "চালাকি চলবে না বিন্দুদিদি।

আসরে তোমায় নামতেই হবে।”

“যদি সায়েবটা রেগে গিয়ে মারে?” বিন্দু অবুঝের মতো বলল, “সায়েবরা খুব রাগি, আর খুব হাত চলে ওদের।”

“ধুর পাগল। অত সস্তা? আর মনোহরদাদা বলল না— এটা ভেতো সায়েব। কতদিন ধরে গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পর আবার বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছে। একদিক থেকে আমাদের সম্বন্ধী। চলো চলো আসরে চলো, ম্যালা বকিও না।”

বিন্দু বাধ্য মেয়ের মতো মুখ ব্যাজার করে আসরে গিয়ে নামল। খুব যে বেশি ভিড় হয়েছে তা নয়। বেশিরভাগ লোকই এসেছে সায়েব কবিয়াল দেখতে। বিন্দু আসরে নামার আগে আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। সায়েবটা অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। বিন্দুকে দেখে হাত জোড় করে নমস্কার করে ভারী শুদ্ধ ভাষায় বললে, “নমস্কার দেবী যজ্ঞেশ্বরী। আপনার সহিত কবিগান করিতে পারিয়া আমি ধন্য। অধমের নাম হেন্সম্যান অ্যান্টনি। লোকে আমাকে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বলিয়াই চেনে।”



পঁচিশ

অ্যান্টনি অবশ্য হারিয়ে দিয়েছিল বিন্দুকে। সামনে সায়েব বলে সে ভয় খেয়ে গিয়েছিল, নাকি সায়েব বলেই তার ভেতরে একটু তাচ্ছিল্য জন্মেছিল— জানে না বিন্দু। শুধু এটা জানে, যে সে হেরে গেছে। কলকেতার বুকে তার প্রথম গাওনা সে হেরে বসেছে। অথচ শুরুটা হয়েছিল চমৎকার। সখীসংবাদে শুকশারি সেজে চাপান-কাটান দিচ্ছিল দুইপক্ষ বেশ খানিকক্ষণ ধরে।

এদিকে সায়েব গাইলে হাততালির ঝড় কিন্তু বিন্দুর সময় সবাই মোটামুটি চুপ। অধৈর্য হয়ে বিন্দু ভাবল, খেউড়ে নিয়ে গিয়ে সোজাসুজি আক্রমণ করে খেলা শেষ করে দেবে। দেখা গেল অ্যান্টনি ভারী চালাক। সে খেউড়ের প্রলোভনে পা তো দিলই না, উল্টে কায়দা করে ফের চাপান দিয়ে দিল তরজার। উত্তেজনায় বিন্দু খেয়ে হারিয়ে ফেলেছে, কাটান দিতে গিয়ে তার তালগোল পাকিয়ে গেল। ব্যস, ওখানেই লড়াই শেষ। সায়েবটা অবশ্য ভারী ভদ্র, গানের শেষে এসে নমস্কার করে গিয়েছিল। কিন্তু হার তো হারই। বিন্দু ভুলতে পারছিল না।

এই লড়াইতে একটা লাভ হল, কবিয়াল যজ্ঞেশ্বরীর নামটা ছড়াল কলকেতায়। রাম বসুর মাগ, যাকে নিয়ে ভারী কেচ্ছা ছড়িয়েছে— সে নাকি নিজেও চমৎকার কবিয়াল। কলকেতার হাওয়ায় যজ্ঞেশ্বরীর নাম নতুন করে উড়ছে আবার। মনোহর

রাস্তায় রাস্তায় চটি ঘষে যা করতে পারেনি, একরাতের কবিগান সেইটে করে দিল। লাভ অবশ্য সায়েবেরও হয়েছিল। সায়েব নাকি এখন পরপর লহরের বায়না পাচ্ছে।

ঠাকুরদাস সিং-কে হারিয়ে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি এখন কবিগানের নতুন ওস্তাদ। শোনা যাচ্ছে ভোলা ময়রাও নাকি সায়েবের সঙ্গে লড়াইতে নামতে রাজি হয়েছে। দু'-একটা আসরে বিন্দুও ডাক পেয়েছিল বটে, তবে সেখানে বড়ো কবিয়াল কেউ ছিল না। নামকরারা কেউ এখনও বিন্দুর সঙ্গে এক আসরে দাঁড়াতে রাজি নয়। ওদিকে নীলু ঠাকুরও নাকি গান করা বন্ধ করে দিয়েছে, দলের লোকেরা চেয়ে আছে বিন্দুর মুখের দিকেই। বিন্দু অনেকবার ভেবেছে, গিয়ে দাঁড়াবে নীলুর সামনে, বলবে, "ওঠো কবি, চলো। আমি গান বাঁধব, তুমি গাইবে। শুধু তুমি নও, গাইব আমিও।" কিন্তু কী যেন এক অজানা কারণে সে পারেনি।

দাওয়ায় বসে চিন্তিতমুখে এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিল বিন্দু। সায়েবের সেই আসরের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ভাদ্রমাসের পচা গরম। দুপুরের কড়া রোদে মানুষজন নেই রাস্তায়। এমন সময় মুখ লাল করে হাঁপাতে হাঁপাতে মনোহর এসে হাজির। এসে দাওয়ায় সে অনেকক্ষণ বসে বসে জিরোল। তারপর জলবাতাসা খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে দারুণ উৎসাহভরে বলল, "জবর খবর গো দিদি। জবর খবর। শোভাবাজারের রাজবাড়ি থেকে বায়না নিয়ে এলাম। মিষ্টিমুখ করাও।" গলার আওয়াজ পেয়ে ভেতর থেকে চলে এসেছে সৌদামিনী। "হ্যাঁ, এইবারে বলো দিনি, কী বেত্তান্ত— কী সংবাদ।" বিন্দুর পাশে গ্যাঁট হয়ে বসে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করে। ধীরেসুস্থে সব বলতে থাকে মনোহর।

এইবার রাজা রাধাকান্ত দেব মস্ত করে দুর্গাপুজো করছেন, অন্যান্যবারের থেকেও বড়ো আয়োজন। লখনৌয়ের সেরা সেরা বাইজি আসছে, সঙ্গে কলকেতার সমস্ত কবিয়াল। যজ্ঞেশ্বরীর নাম বলতেই রাজামশায় লুফে নিলেন প্রস্তাবটা। রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে ভারী উদ্যোগী। নিজের বাড়ির মেয়েদের নাকি ইংরেজি শিক্ষাও দিয়ে থাকেন। তড়বড় করে এইসব বলছিল মনোহর। বিন্দু নিজের মনেই ভাবে, লেখাপড়ায় কি তবে বড়োলোকের একরকম নিয়ম আর গরিবের আর-এক রকম? রাজারা নিজের ঘরের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারেন ইচ্ছেমতো, আর প্রজার বেলায় সেটাই হয়ে যায় পাপ? বিন্দুর চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে মনোহর ফের বলে, "তবে একটা গোল হয়েচে।" সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করে "কীসের গোল?" মনোহর একটু থেমে সামান্য ইতস্তত করে, তারপর বলে, "তবে বিন্দুদিদির সঙ্গে আসরে লহর হবে

কত্তামশায়, ইয়ে... মানে... রাম বোসের।” কথাটা বলে বিন্দুর দিকে সে আড়চোখে চায়।

বিন্দু আর সৌদামিনী দু'জনেই বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে। তখন মনোহর ফের খুলে বলে ব্যাপারটা। “দিদির সঙ্গে নামী ওস্তাদেরা কেউ গাইতে রাজি নয়। অ্যান্টনি-সায়েবের সঙ্গে লড়াই কয়দিন আগেই হয়েচে। রাজামশাই নিজেই নাকচ করলেন ওটা। আর ওদিকে রাম বোসের অবস্থা ভালো নয়। একে তো মাঝরাতে মাতালদের সঙ্গে হাঙ্গামায় জুটে রামমোহন রায়ের বাড়ি গিয়ে হাঙ্গামা করায় কবিসমাজে কত্তার বেশ দুর্নাম হয়েছে। তার ওপর সে-দিন ভূকৈলাশে নিজের ঘরের কেচ্ছা যেমন হাটের মাঝে উপুড় করেচেন কত্তা...,” এই পর্যন্ত বলে হঠাৎই থেমে যায় মনোহর। বিন্দুদিদি কী ভাবল? আড়চোখে সে চায় বিন্দুর দিকে। বিন্দুর অবশ্য ভাবান্তর নেই কোনও।

ওদিকে সৌদামিনী অধৈর্য হয়ে তাড়া লাগায়, “থামলে কেন মনোহরদাদা। বলো।” মনোহর একটা গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, “হ্যাঁ, মানে সব মিলিয়ে কত্তার দুর্নাম হয়েচে বেজায়। নামীরা তেনার সঙ্গেও গাইতে চাইচেন না। আবার বাজারে একটা খপর রটেচে, বিন্দুদিদির গানের জোর দেকে ভয় খেয়ে রাম বোস দিদিকে তাড়িয়েচে। হেনকালে রাজামশাই কইলেন, 'তা বাপু রাম, তুমি যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে ভিড়ে যাচ্চ না কেনে? সায়েব হল রাজার জাত। তিনি যদি লড়তে পারেন— তুমি তো কায়েতের পো হে।' রাজামশায়ের কতার উপর কি আর কতা চলে? কত্তা রাজি হয়েচেন।” একসঙ্গে অনেকটা কথা বলে মনোহর থামে।

বিন্দু আর সৌদামিনী একসঙ্গে হাঁ করে সব শুনছিল। সৌদামিনী প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয় বিন্দু। কঠিন কঠোর গলায় বলে, “না, সে হবে না। কত্তামশায়ের সামনে আমি আসরে দাঁড়াতে পারব না। সে মহাপাপ হবে। আর তা ছাড়া...,” কথা অসমাপ্ত রেখে চুপ করে যায় বিন্দু। সৌদামিনী কী একটা বোঝাতে যাচ্ছিল, বিন্দু মাথা নাড়তে নাড়তে ছিটকে গেল। ঘরে ভিতরেই ঢুকে পড়ছিল সে, এমনসময় খুব ঠান্ডা গলায় মনোহর বলল, “আসল কতাটাই বলা হয়নি, দেখেচ! বুড়ো হয়ে যাচ্চি। ওই অষ্টমীর রাতে, লাটসায়েব আসবেন, আর লাটসায়েবের সঙ্গে আসবেন রামমোহন রায় নিজে। গান শুনতে। তুমি যদি গাও বিন্দুদিদি, তেনাকে নিজের গান শোনাতে পারবে।”

* * *

সৌদামিনী তাকে সাজিয়ে দিয়েছে। বিন্দু আসরে যাওয়ার জন্য তৈরি। রামমোহন রায় সত্যিই এসেছেন তবে।

মনোহর যখন বলেছিল, তার বিশ্বাস হয়নি। মনোহর বারবার করে দিব্যি গেলে বলেছিল, "আমি সত্যি কইচি দিদি। এই বুড়োটারে বিশ্বাস করো। লাটসায়েব কয়েচেন, সতীদাহ বন্ধ হবে কি না, সেইটে এখন ঠিক হবে বিলেতে রাজার দরবারে। সেই নিয়ে তো দেওয়ানজি আর শোভাবাজারের মদ্যে ঘোর আকচা-আকচি। সে-সব তো সবাই জানে। কিন্তু লাটসায়েব এখন নাকি কয়েচেন, বিলেতে যাই বলুক না কেনে, দু'জনে যেন শত্তুর না হয়ে যান। সায়েবদের নাকি দু'জনকেই দরকার। তাই রাজাকে সায়েব কয়েচেন, দেওয়ানজিকে নেমন্তন্ন করতে। ওদিকে দেওয়ানজি তো এখন বেম্মজ্ঞানী হয়েচেন, তিনিও পুজোতে আসতে চাননি। লাটসায়েবের জোরাজুরিতে বলেচেন নাকি আসবেন। একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর।"

মনোহর চলে যাওয়ার পর বিন্দু গুম হয়ে বসেছিল। রামমোহন রায়ের সামনে গান করবে সে, এ তার চিন্তারও অতীত। এ গান যদি তার জীবনের শেষ গান হয়, তাতেও তার পরোয়া নেই। কিন্তু একটা কাঁটা খচখচ করে ক্রমাগত বিঁধে চলেছে তার মনের মধ্যে। রাম বসুর সামনে কী করে দাঁড়াবে সে? তার কত্তামশায়ের সঙ্গে খেউড়ে নামার কথা সে ভাবতেও পারছে না। তার উপর রাম বসু এখন খ্যাপা ষাঁড়। বিন্দুকে সামনে দেখলে সে লোকলজ্জার বালাই ভুলে আবার খুলে বসবে কুৎসিত গালিগালাজের ঝাঁপি। বিন্দু কি তা সইতে পারবে?

মনোহর অবশ্য ভারী জোর দিয়ে বলেছে, "রাজামশাই কত্তাকে সাবধান করে দেছেন, বলচি না! দেশের মানীগুণীরা সব আসবেন। দেওয়ানজি আসবেন। বড়োলাট নিজে আসবেন। সবচে বড়ো কতা— রাজবাড়ির মেয়েরা সব থাকবেন যে গো চিকের আড়ালে। নোংরা কিছু যেন না গাওয়া হয়, কড়া হুকুম হয়েচে।" বিন্দুর অবশ্য তাতেও ভরসা হয়নি পুরোপুরি। দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলে সে দুলেই চলেছে। বিন্দুর মনের ভাব বুঝেছে সৌদামিনী। সইয়ের পাশে এসে বসে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে বলেছে, "তুমি কিচ্ছুটি চিন্তা কোরো না বিন্দুদিদি। দেখো তুমি ঠিক পারবে। পারতে তোমাকে হবেই।" বিন্দু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সদুকে জড়িয়ে ধরে সে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল, "সে আমি পারব না সদু। কিছুতেই পারব না।

তার থেকে আমার মরণই ভালো।"

সৌদামিনীর নিজের চোখও শুকনো নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে তার বহু বছরের একনিষ্ঠ সখ্য যেন আজ এক ঘনীভূত মূর্ত রূপ ধারণ করেছে। বিন্দুকে সোজা করে বসিয়ে তার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিল সে। তার কণ্ঠে প্রবল উত্তেজনা, "পারবে না তুমি? পারবে না? পারবে না তো ছেড়েছুড়ে দাও গান। নেড়ির দলেও গাইতে হবে না তোমায়। ফিরে যাও মাসির দোরে, কসবিপট্টিতে। তোমার দিদি দেকচে গো সব উপর থেকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকে বলো, তুমি পারবে না। বিধুদিদির কতা মনে পড়ে? তাকে পুড়িয়েচে ওই গাঙের ঘাটে। সেই ঘাটে গিয়ে মা গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে বোলো— তুমি পারবে না। ওই নীলু ঠাকুর তোমার জন্য নিজের মান খোয়াল, তোমায় দল গড়ে দিল, তার সামনে গিয়ে বলো— তুমি পারবে না। আমার দিকে চাও। আমার মাথায় হাত রেখে বলো— তুমি পারবে না।"

খপ করে বিন্দুর হাত টেনে নিয়ে নিজের মাথায় রেখেছে সৌদামিনী। তাকে চেনা যাচ্ছে না। চোখ জ্বলছে কী এক অজানা আবেগে। চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে। এত জোরে ধরেছে বিন্দুর হাত যে, নখ বসে গেছে মাংসে। কিন্তু বিন্দু চিনতে ভুল করেনি। এ সেই সৌদামিনী, যে লাহাবাবুর মারমুখী পাইকটার কাপড় টেনে ধরেছিল নিজের প্রাণের পরোয়া না করে। এ সেই সৌদামিনী, যে এককথায় নিজের সর্বস্ব এনে তুলে দিয়েছিল বিন্দুর হাতে। বিন্দু সৌদামিনীর চোখে চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে বলে, "আমি পারব সদু। আমি পারব।"

বিন্দু আসরের দিকে পা বাড়ানোর আগে চোখ বন্ধ করল একবার। এক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল। নিস্তারিণী ঠিকই বলেছিল, লোক একেবারে থিকথিক করছে। একে তো রামমোহন রায় আর রাধাকান্ত দেবকে শেষ কবে একসঙ্গে দেখা গেছে বলা মুশকিল। তার উপর আবার রাম বসু আর যজ্ঞেশ্বরী দাসীর কবির লড়াই। কাগজে এর নাম দিয়েছে 'প্রকৃতি-পুরুষের দ্বন্দ্ব'। রাম বসুর নিজের মাগ ছিল ওই যজ্ঞেশ্বরী। এমন রসালো লহর কে-ই বা ছাড়তে চায়?

আসরে বিন্দুর একটু পরেই ঢুকল রাম। অতিথিরা সবাই অধীর অপেক্ষায় বসে আছেন। বিন্দু দেখল লাটসাহেবের একপাশে রাধাকান্ত দেব আর একপাশে রামমোহন রায়। রামমোহনকে সে এত কাছ থেকে কখনও দেখেনি আগে। তার মনে হল, চারদিকে এত কোলাহল এত হট্টগোলের মাঝেও লোকটি কেমন অসীম প্রশান্তিতে বসে আছেন। এঁকে দেখে বোঝা মুশকিল, একটা সময় গোটা কলকেতা খেপে

উঠেছিল এঁর রক্তদর্শন করবে বলে। রামমোহন সোজা তাকিয়ে আছেন আসরের দিকে। কোনও নির্দিষ্ট দিকে তাঁর দৃষ্টি নয়, অথচ শান্ত দু'টি চোখে যেন তিনি সবার ভিতরটা অবধি দেখতে পাচ্ছেন। বিন্দু আর রাম দু'জনেই ওঁদের দিকে ঝুঁকে নমস্কার করল। বিন্দু মনে মনে বলল, 'দেবতা, আমায় শক্তি দাও।'

রাম বসু সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছনের সঙ্গীসাথী সব নতুন। কেমন সব পাল্টে গেছে কয়দিনেই। বিন্দু জোর করে নিজের মনকে সংহত করল। কত্তার চোখে কি একটা নিষ্ঠুরতা ঝিলিক দিচ্ছে? কে জানে? প্রথমে আগমনী বা বিরহ ধরলে মুশকিল আছে— কলকেতার সেরা রাম বসু ওইসব গানে। লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনবে— তারপর আর চাপান-উতোরে মন দেবে না। বিন্দুকে স্বস্তি দিয়ে রাম সরাসরি তরজায় চলে এল, আজ আঘাত করার মেজাজে এসেছে সে। তবে প্রথমেই খেউড় নয়, রাজামশায়ের নিষেধ মনে আছে তার।

শিব বিষয়ক গান, দুর্গাপুজো বলে বোধহয় বৈষ্ণব গান ধরেনি রাম। শিব সেজে বলছে, বাপের বাড়ি যাবে বলে গৌরী সংসার নিয়ে কৈলাস ছেড়ে চলে গেছেন, শিবের আর মেয়েজাতের উপর ভরসা নেই। রুদ্রতেজে তিনি সব ছারখার করে দেবেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর অঙ্গুলিহেলনে কাঁপে, সামান্য পৃথিবী ধ্বংস করতে মহাদেবের চোখের একটি পলকই যথেষ্ট। বিন্দু বুঝল, কথাটা তাকে ঠেস দিয়েও বলা হচ্ছে। শুধু বিন্দুই নয়, উপস্থিত জনতাও সেটা বুঝেছে। হর্ষধ্বনি করে উঠল তারা। বিন্দু মনে মনে হাসে, বসুজা প্রথম থেকেই রৌদ্ররস ধরেছে। হাততালির আওয়াজ থামলে সে শুরু করে—

'মেয়েজাতের বিড়ম্বনা কেমন করে বুঝবে তুমি
সতী ছিল পত্নী ভালো, মরল করে 'স্বামী স্বামী'।
মরেও কি সে শান্তি পেল, বলো গো শিব এ কী জ্বালা
তোমার স্যাঙাত সুদর্শনে দেহ করে ফালাফালা।
ধ্বংস করো— সৃষ্টি করো, করো যাহা তোমার মতি
আদ্যা বিনা শক্তিহীন সব, মনে রেখো উমাপতি।'

ধাক্কাটা জোর লেগেছে। রাম এত সরাসরি আক্রমণের প্রত্যাঘাত আশা করেনি। তার সামনে যেন সতেরো বছরের বিন্দু দাঁড়িয়েছে এসে— ভয়ডরহীন। তবু সে ফের চাপান দেয়—

“আদ্যাশক্তি মহাশক্তি, মহাদেবও কম বা কীসে?
পুরুষেরই কণ্ঠ যে নীল, সংসারেরই তীব্র বিষে।’

কাটান এল সঙ্গে সঙ্গে, সপাটে—

‘সংসার শুধু তো নয় সৃষ্টিসুদ্ধু পুরুষ নাশে
সে-সংসার জোড়া দেবে নারীতেই হেসে হেসে।
আগুপিছু না ভাবিয়া বর তো দেবেই মহিষাসুরে
(তারপরে) বিপাক দেখে দুর্গাপদে পড়বে এসে মাথা খুঁড়ে।’

একপ্রহর অতিক্রান্ত। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছে না। দর্শকেরা একবার একে বাহবা দেয়— একবার ওকে। বড়োলাট পর্যন্ত হাঁ করে শুনছেন। কতটা বুঝছেন তিনিই জানেন, তবু পরিবেশের গুণে তিনিও চোখ ফেরাতে পারছেন না। ধৈর্য প্রথম হারাল রাম। দশ বছর আগের মতোই। তার ক্রোধ তাকে চালিত করছে সরাসরি খেউড়ে চলে যেতে। কঠিন মুখে সে গায়—

‘সতী সতী করিসনে লো, পুণ্যবতী সতী বড়ো
তোমার মুখে মানায় না গো যতই তুমি জাঁক করো।
কেমন করে দেমাক করিস, দেখে মোরা অবাক রই
সতীর তুই কী বুঝিবি, তোর মাথাতে সিঁদুর কই?’

বিন্দু চমকায়নি। এমন কিছুই একটা আশা করছিল সে। বহুদিন আগে রাম বসুরই বলা একটা কথা তার মনে পড়ে গেল, ‘সংযম হারালে চলবে না।’ রাম বসু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। বিন্দু কিন্তু শান্ত, সতেরো বছর বয়েসে যে-ভুল সে করেছিল, সেটা আর সে করবে না। অদ্ভুত শান্ত মুখে বিন্দু গান ধরে—

‘কী-ই বা হবে সিঁদুর দিয়ে, কী-ই বা হবে এ জীবনে
পুরুষ গেলে সিঁদুর যাবে, জীবন যাবে তারি সনে।’

দর্শক স্তব্ধ। রাধাকান্ত বিস্মিত। রাম বসুও চমকে গেছে। সমাজের ভাগ্যবিধাতাদের সামনে একটা সামান্য মেয়েমানুষ শাঁখা-সিঁদুরের অপমান করছে। এত সাহস এই মেয়েছেলেটার? শুধু রামমোহনের মুখে একটি দুর্বোধ্য গূঢ় হাসি। রাম বসু খেপে উঠল। তার পৌরুষে ঘা লেগেছে। বিন্দুকে সে শাঁখা-সিঁদুরের অধিকার দিতে চেয়েছিল, বিন্দু প্রত্যাখ্যান করেছিল তাকে। আর আজ এই ভরা আসরে, গোটা কলকেতার মানুষের সামনে কী বিনা দ্বিধায় বলল বিন্দু, সে ওই অধিকারের পরোয়া করে না, পুরুষের আধিপত্যে তার বিশ্বাস নেই! তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রাম চেঁচিয়ে ওঠে—

'সাবধান করি আমরা তোরে, ওরে নষ্ট নারী
আগুন নিয়ে খেলিস না তুই, বিষম বাড়াবাড়ি।
মান ইজ্জত ধুলোয় ফেলে ধর্মে আঘাত হানিস না
(ঠাকুরের) রোষাগ্নিতে ভস্ম হবি, এ কথা কি জানিস না?'

বাজনা বেজে উঠেছে প্রবল রবে। রাধাকান্ত দেবের কুঞ্চিত ভ্রু সিধে হয়ে এল, রাম বসু জবর প্যাঁচে ফেলেছে যজ্ঞেশ্বরীকে। ঠাকুরের নামে কোণঠাসা হয়ে যাবে এবার মেয়েছেলেটা। আড়চোখে রামমোহনের দিকে চাইলেন তিনি। কিন্তু রামমোহনের মুখে তখন সেই দুর্বোধ্য হাসির রেখাটি লেগে রয়েছে। বিন্দু একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমে, কিন্তু তার পরেই তার চোখ পড়ল রামমোহনের দিকে। তার কেন জানি না মনে হল, দেওয়ানজি যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছেন, শুধু তার দিকেই। অপেক্ষা করছেন তার উত্তর শোনার জন্য। এক মুহূর্ত চোখ বুজে বিন্দু দীর্ঘ শ্বাস নিল একটা। তারপর রাম বসুর চোখে চোখ রেখে গান ধরল—

'আদ্যাশক্তির নয়নেতে আগুন আছে সর্বগ্রাসী
(আবার) আগুন জ্বেলে বেওয়া পোড়াও, (এ) কেমন খেলা সর্বনাশী?
যে-গর্ভ জন্মদাত্রী তাকেই তোমরা নাশ করো
(আবার) সেই নারী বিদ্রোহী হলে, তখন হাহুতাশ করো।
তোমাদের ওই চিতার আগুন রেখেছি গো বক্ষে করে
মনে জেনো সেই আগুনই জ্বলবে সারা দেশটা জুড়ে।'

শেষ পঙ্‌ক্তি দুটো বলার সময় বিন্দুকে চেনা যাচ্ছিল না। চুল খুলে গেছে, আঙ্গুল উঁচিয়ে ধরেছে আকাশের দিকে— চোখ জ্বলছে। বুকের কোন গভীর থেকে উঠে এসেছে তীক্ষ্ণ তীব্র উচ্চারণ। জনতা থমকে গিয়ে দেখছে তাকে, যেন কথা বলতে ভুলে গেছে সবাই। রামমোহন উঠে দাঁড়ালেন সোৎসাহে। তীব্র কণ্ঠে বলছেন, "সাধু, সাধু!" দু'হাত আকাশের দিকে তুলে দিয়েছেন, সোল্লাসে বলছেন, "তোমার মতো মেয়ে আছে বলেই এ দেশটা বেঁচে যাবে মা, এ দেশটা বেঁচে যাবে। তুমি বঙ্গের কবিশ্রেষ্ঠা। তুমি ভারতবর্ষের কবীশ্বরী।"

বিন্দু হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। রাম বসুর মাথা নিচু। নিস্তারিণী আর সৌদামিনী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। বড়োলাটও উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছেন, রামমোহন গিয়ে কী যেন বললেন তাঁকে। রাধাকান্ত বসে আছেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বড়োলাটকে হাততালি দিতে দেখে জনতা ফের উল্লাসে ফেটে পড়ল। রামমোহন এগিয়ে এলেন আসরের মাঝখানে। নতজানু বিন্দুর মাথায় দুই হাত রেখে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, "তোমার জয় হোক মা। আশীর্বাদ করছি বটে, কিন্তু আসলে তোমায় প্রণাম করছি আমি। তোমায় প্রণাম করছে গোটা দেশ।"

বিন্দু যেন পাথর হয়ে গেছে, হাত বাড়িয়ে রামমোহনের পায়ের ধুলো নেওয়ার ক্ষমতাও নেই আর তার। শুধু তার চোখ থেকে অঝোর অশ্রুধারা এসে রামমোহনের পা ধুইয়ে দিচ্ছে। রামমোহন এবার জনতার দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "জয়, যজ্ঞেশ্বরীর জয়! জয়, কবীশ্বরীর জয়!" সেই বিশাল জনতার উল্লাসরবে কলকেতার রাত্রি খানখান হয়ে গেল, "জয় যজ্ঞেশ্বরীর জয়! জয়, কবীশ্বরীর জয়!"

বিন্দু নড়েনি একচুলও। রামমোহন রায়ের মুখে নিজের নামে জয়ধ্বনি শুনে তার অশ্রুবেগ আরও বেড়েছে। চতুর্দিক অস্পষ্ট, সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছে শুধু বিধুদিদির মুখ। বিধুদিদি সেই চেনা হাসি হেসে বলছে, "বিন্দুরে, তুই হারিসনি। দেখ, তুই জিতে গেছিস।" বিন্দু দেখতে পাচ্ছে বিলুদিদিকে। বিলুদিদির মুখে হাসি, চোখে জল। সে ধরা গলায় হাসতে হাসতে বোনটিকে যেন বলছে, "মাগো মা, কী সব্বোনেশে মেয়ে রে তুই বিন্দু!"

বিন্দু চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। অদূরে রাম বসু দাঁড়িয়ে আড়চোখে দেখছে বিন্দুকে। অস্ফুট স্বরে একবার ডাকল, "বিন্দু, আমি...।" বিন্দু শুনতে পেল না রামের কথা। সে এগিয়ে গিয়েছে আসরের অন্যদিকে। সে-দিক থেকে বিন্দুর দিকে এগিয়ে আসছে

সৌদামিনী আর নিস্তারিণী। কখন কোন ফাঁকে যেন নীলু ঠাকুরও এসে হাজির হয়েছে আসরে। নীলুর দিকে তাকিয়ে বিন্দু হাসল। হাসছে নীলুও, সে-হাসিতে একটা প্রশ্নও যেন মিশে আছে। বিন্দু হেসে মাথা নামিয়ে নিল। আনন্দে, লজ্জায়, সুখে।

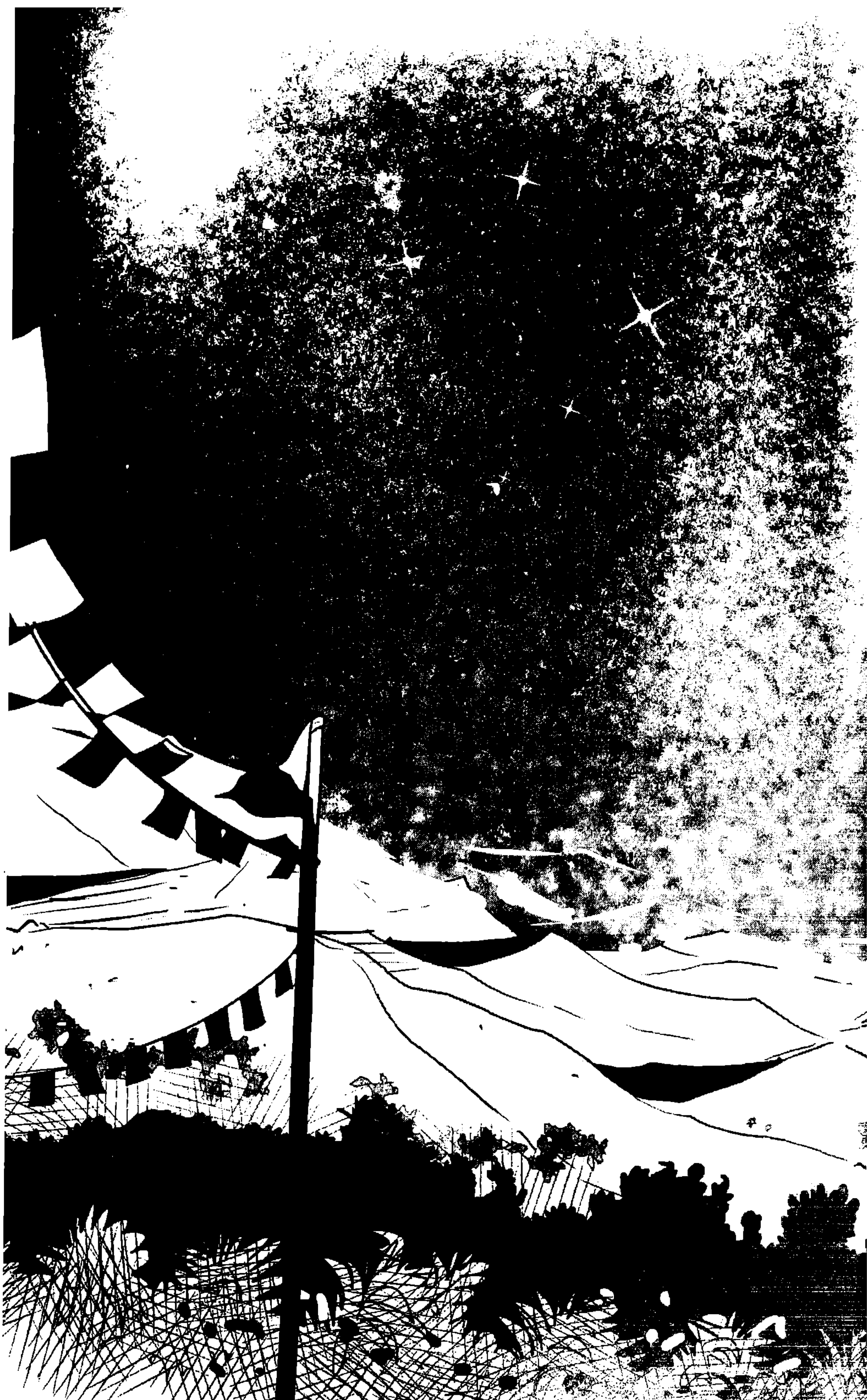
বাইরে কলকেতার আকাশে তখন রাত কেটে গেছে, দেখা যাচ্ছে নতুন একখানি ভোরের আভাস।

নক্ষত্রপ্রভা

নভেম্বর ১৯৪৮, ম্যাঞ্চেস্টার

ঠান্ডা জাঁকিয়ে পড়তে এখনও বেশ দেরি আছে। ডিসেম্বরের ছুটির মরশুম শুরু হওয়ার আগে ঠান্ডা পড়েও না সাধারণত। তার উপর এ বছর গরমই বলা যায় একরকম। অন্তত ম্যাঞ্চেস্টারের লোকজন তাই বলছে। ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ধার ঘেঁষে পুরোনো কসাইয়ের দোকান একখানা। ড্যান্ডেলিয়ন বুচার্স। বুড়ি মালকিন ক্যাথি সসেজ কাটতে কাটতে বলে, "ঠান্ডা আজকাল পড়ে নাকি? ঠান্ডা পড়ত সেই আমাদের ছেলেবেলায়। রানিসাহেবা ভিকটোরিয়া এসেছিলেন একবার ডিসেম্বরের শীতে এখানে। তখন বুড়ির প্রায় শেষ বয়েস। কেঁপেঝেঁপে একশা। দিব্যি মনে আছে আমার।"

একটানা বকবক করতে করতে বুড়ির হঠাৎ মনে পড়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খদ্দেরটির কথা। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে রোগাপাতলা মেয়েটা সোয়েটারের উপর একখানা জাবদা লেডিস কোট চাপিয়েও ঠকঠক করে কাঁপছে শীতে। ক্যাথি সহানুভূতির সঙ্গে বলল, "আহারে বাছা, তোমার তো দেখছি এই শীতেই কাহিল অবস্থা। অবিশ্যি তোমার মুলুকে তো বেজায় গর্মি শুনেছি। আমার এক ভাইপো ছিল বোম্বেতে। সে ছোঁড়া বেজায় শয়তান যদিও।"





তরুণী মেয়েটি এবার বাধা দেয় এভাকে, বুড়ি কতক্ষণ বকবক করবে তার ঠিক নেই। "মিসেস রিচার্ডস, আমার সসেজটা একটু যদি দিয়ে দিতেন," মৃদুস্বরে বলে সে। ক্যাথিবুড়ি থামেনি যদিও, গজগজ করতে করতেই সে বলে চলেছে, "বুড়োদের কথা বাছা শোনো না তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়ে। এই এক নতুন উঠেছে, বুড়োগুলো আর কী জানে? তা হ্যাঁ বাছা 'পোরবা', তোমাদের দেশেও এমন চলছে নাকি যুদ্ধের পর থেকে? বাপ-মা-বুড়ো মানুষের কথার দাম নেই সেখানে?"

'পোরবা' অর্থাৎ প্রভা মুচকি হাসে। ড্যান্ডেলিয়ন বুচার্স-এ প্রায় তিন বছর ধরে আসছে সে, ক্যাথি এখনও তার নামখানি জিভে সড়গড় করে উঠতে পারেনি। বুড়ি অবশ্য মানুষ খারাপ নয়। বকে একটু বেশি বটে, কিন্তু মনটা খাঁটি। দু'-একবার দোকানে আসার পরেই তাকে চিনে নিয়েছিল বুড়ি। তারপর একদিন প্রভাকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা করেছিল, "ইন্ডিয়া থেকে আসছ নিশ্চয়ই? তা প্রতি হপ্তায় দেখি কোয়ার্টার পাউন্ড সসেজই নিয়ে যাও, ওর বেশি লাগে না বুঝি?"

প্রথমবারে প্রভা বুঝতে পারেনি বুড়ির কথা। খাঁটি ইংলিশ উচ্চারণ বুজতে তার তত অসুবিধা হয় না, কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে ইংরেজ প্রফেসর ছিলেন দু'জন, তাদের ক্লাস মন দিয়েই করেছে প্রভা। ক্লাসের পর পিছু ধাওয়া করে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্তও করেছে নিয়মিত। কিন্তু সেই উচ্চারণের সঙ্গে ক্যাথির স্কটিশ হাইল্যান্ডার উচ্চারণের তফাত প্রচুর। বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর প্রভা ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়েছে ক্যাথির উচ্চারণের সঙ্গে, কিন্তু সেইদিন সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল একবর্ণ কথাও বুঝতে না পেরে।

ক্যাথি বুঝতে পেরেছে প্রভার অসুবিধা। ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে আবার বলেছে সে কথাগুলো। এবার আর বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু কী উত্তর দেবে প্রভা? মাছ-মাংস যথেষ্ট পরিমাণে কেনার পয়সা থাকে না তার কাছে। বাবা সম্পত্তি বিক্রি করে রিসার্চ করতে পাঠিয়েছেন তাকে বিলেতে, তারপরেও বাবার কাছে পয়সা চাইতে তার মানে লাগে। যেটুকু মাসোহারা না হলে নয়, সেইটুকুই সে হাত পেতে নেয়, তাও সসংকোচে। কিন্তু ক্যাথি বা ক্যাথরিন ঠিকই বুঝেছিল। ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট এই প্রথম দেখছে না সে।

যুদ্ধের পর রাজাবাহাদুর ষষ্ঠ জর্জের টাঁকশালে আকাল চলছে। এককালে এই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটিতে ডালটন আর রাদারফোর্ডের মতো বিশ্রুত বিজ্ঞানীরা কাজ করে গেছেন ঠিকই, কিন্তু এখন গবেষণাগারগুলো থেকে অতিপ্রয়োজনীয়

যন্ত্রপাতি কেনার অনুরোধ আসলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থদপ্তরের প্রধান মিস্টার বেডফোর্ডের চকচকে টাকে ঘাম জমতে থাকে। এমন অবস্থায় ইংরেজ ছাত্রছাত্রীর অভাব বাড়ছে গবেষণায়। তার উপর এত বড়ো একখানা যুদ্ধ গেছে, পড়াশোনা করে রিসার্চ করার যুগ্যি তরুণদের অনেকেই মরেছে জার্মান গোলাগুলির ঘায়ে। এমন অবস্থায় গবেষণাগারগুলির ফাঁক ভরানোর জন্য প্রফেসররা দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছেন চীন, মিশর, ইন্ডিয়া, পূর্ব ইউরোপের ছাত্রছাত্রীদের। তার সাড়াও দিচ্ছে বেশ।

সুতরাং ড্যান্ডেলিয়ন কসাইখানার মালকিন বেশ ভালোই জানে ভারতীয় ছাত্রদের হাল-হকিকত। আর তাই তার বুঝতে অসুবিধা হয়নি এই ভারতীয় তরুণীটির নিশ্চুপ থাকার প্রকৃত কারণখানি। মুখে কিছু বলেনি ক্যাথি, কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে বাজারের থলে খুলে প্রভা দেখেছিল সসেজের পরিমাণ তার দেওয়া দামের তুলনায় অনেকটাই বেশি। অজানা বিভুঁইয়ে এই অনাত্মীয় ভিনদেশি বৃদ্ধাটির অযাচিত স্নেহস্পর্শে প্রভার চোখে জল এসেছিল। তার পরে কেটে গেছে তিনটে বছর। ক্যাথির সঙ্গে প্রভার সম্পর্ক ক্রমে গাঢ় হয়েছে। ক্যাথিও কোন এক অজানা কারণে ছোটোখাটো চেহারার এই মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছে। তাই সে নির্দ্বিধায় বকবক করে যায় প্রভার সঙ্গে। সঙ্গে ঠিক নয়, সামনে। প্রভা চুপচাপই থাকে বেশিরভাগ। আজও যেমন ছিল।

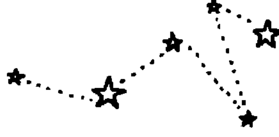
কিন্তু একটা সময় বুড়িকে থামাতে বাধ্য হল প্রভা। আজ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে একটা জরুরি লেকচার আছে। আজ আসছেন ভিক্টর হেস। এই ভদ্রলোক প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্ব সেই কোনকালে। তিন যুগ আগে। তার জন্যে নোবেলও পেয়েছেন। সেও তো হয়ে গেল বারো বচ্ছর।

অবিশ্যি এই বারো বচ্ছরকে এখন অনন্তকাল বলে মনে হয় পৃথিবীর বেশিরভাগ লোকের। এর মধ্যেই ঘটে গেছে গোটা একখানা বিশ্বযুদ্ধ। দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে সাড়ে সাত কোটি প্রাণ। এইবার পৃথিবীটা ফের গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে, স্বাভাবিক হচ্ছে জীবনযাপন। গোটা দুনিয়ার মতো শিক্ষাক্ষেত্রগুলিও প্রাণপণে ফিরতে চাইছে উনচল্লিশ সালের আগের জীবনে। শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান। তাই সেই সুদূর মার্কিনমুলুক থেকে আজ একখানি লেকচার দিতে আসছেন প্রফেসর হেস।

প্রভা এই লেকচার কিছুতেই মিস করবে না। তার নিজের কাজের ক্ষেত্রও যে ওই মহাজাগতিক রশ্মি। এখানে এই ম্যাঞ্চেস্টারে। আর অনেক আগে— যেন কোন গত জন্মে, কলকাতাতেও ছিল তাই। ক্যাথিবুড়ির দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে ম্লান হাসে প্রভা। প্রফেসর হেস যখন বারো বছর আগে সুইডেনে গ্রহণ করছেন নোবেল

প্রাইজ, তিনি কি জানতেন সুদূর ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের বিভাগীয় প্রধানের ঘরে ঢুকে পড়বে একটি মেয়ে, দৃঢ় কণ্ঠে বলবে— "স্যার, আমি আপনার কাছে কাজ করতে চাই।" প্রফেসর হেস জানতেন না। যেমন জানেন না ভাগ্যের ফেরে আট হাজার কিলোমিটার দূরে আর বারো বছর পরে সেই মেয়েটিই তাঁর একটি লেকচারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

ঠিকই। আট হাজার কিলোমিটার পেরিয়ে এসেছে প্রভা, জীবনের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছে বারোটা বছর। একটা যুগ জুড়েছে যেমন জীবনে, জীবন থেকে নিংড়েও নিয়েছে অনেককিছু। কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মির সন্ধান তার নিয়তির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আজ এই লেকচারে প্রভা আবার খুঁজে পেতে চাইছে মহাবিশ্বের এই অদ্ভুত হেঁয়ালির জন্মরহস্য। একটা বিষাদ ঘনাচ্ছে তার মনের মধ্যে, একদিন তো সে-ও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল ওই পথে— অজানার খোঁজে। আস্তানার দিকে জোরে পা চালায় প্রভা, যেন দ্রুত হেঁটে হারিয়ে দেবে তাড়া করে আসা একঝাঁক বিষণ্নতাকে।



ডিসেম্বর ১৯৩৬, কলকাতা

বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। এম এস সি ফার্স্ট ইয়ারের প্র্যাকটিকাল ক্লাস নিয়ে সবে নিজের ঘরে এসে বসেছেন ফিজিক্সের বিভাগীয় প্রধান। প্রশস্ত সুইং ডোরের পাশে দেওয়ালের ফলকে বড়ো করে লেখা রয়েছে সুরেন্দ্রমোহন বসু, 'পালিত অধ্যাপক'। হ্যাঁ, সুরেন্দ্রমোহন কিছুদিন আগেই স্যার তারকনাথ পালিত প্রবর্তিত পালিত অধ্যাপকের পদটির দখল পেয়েছেন। তাঁর আগে দীর্ঘ আঠেরো বছর এই পদটি অলংকৃত করে বসেছিলেন ভারতের বিজ্ঞানাকাশের উজ্জ্বলতম একজন তারকা। কিন্তু অধিক বেতন ও সুযোগ-সুবিধার টানে তিনি দক্ষিণের একটি নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যোগ দিয়েছেন। অবশ্য পিছনে রেখে গিয়েছেন নোবেল প্রাইজের গরিমার ছায়া।

পালিত প্রফেসর পদটি কম সম্মানের নয়, কিন্তু সুরেন্দ্রমোহনের মনে সুখ নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঁড়ারের অবস্থা খুবই খারাপ। আজ প্র্যাকটিকাল ক্লাস নিতে গিয়ে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন খুবই সাধারণ যন্ত্রপাতি, একেবারে প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যেগুলি ব্যবহৃত হয়— সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে তো নেই-ই, যেগুলি আছে সেগুলিও কাজ চালানোর মতো নয়। বেচারি ছাত্রছাত্রীদের খুব একচোট বকাবকি করে রাগটা কিছুটা কমাতে চাইলেও, পন্থাটা কাজে দেয়নি। মাঝখান থেকে বেচারি ছেলেমেয়েগুলো ধাতানি খেয়ে গেল। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরা বলাটা অবশ্য

বাড়াবাড়ি, এ বছর এম এস সি-র ফার্স্ট ইয়ারে মেয়ে একটিই। তরুলতা ব্যানার্জি। ছাত্রদের ভিড় থেকে দূরে খাতা বুকে ধরে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুরেন্দ্রমোহন বুঝতেও পারেন না মেয়েটি তাঁর কথা আদৌ শুনছে কি না!

সেকেন্ড ইয়ারের ব্যাচে একটিও মেয়ে নেই। গত তিন বছর যে ব্যাচগুলি পাশ করে বেরিয়েছে তাতে অবশ্য ছাত্রীর উপস্থিতি ছিল। প্রতি ব্যাচে একটি করে। সুরেন্দ্রমোহন অবাক হননি। এবং এ বছরের সেকেন্ড ইয়ারে নারীশূন্য ক্লাসরুম প্রৌঢ় অধ্যাপককে একরকম স্বস্তিই দিয়েছিল। প্রফেসর বোস আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন, ফিজিক্সের ক্লাসরুমটা মেয়েদের, বিশেষ করে ভারতীয় মেয়েদের জায়গা নয়। মেয়েদের জন্য কলাবিদ্যা, ভাষাবিদ্যা এগুলোই পাঠ্যবিষয় হিসেবে চমৎকার। পদার্থবিদ্যার ধারেকাছেও মেয়েদের আসার চেষ্টা করা ঘোরতর অনুচিত।

সহকর্মী ও বন্ধু জয়নাথ হালদারের সঙ্গে সুরেন্দ্রমোহনের এ বিষয়ে মাঝেমধ্যেই দীর্ঘ তর্ক হয়ে থাকে। জয়নাথ অপেক্ষাকৃত উদারবাদী লোক। তিনি সওয়াল করেন মেয়েদের বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে। সুরেন্দ্রমোহন তখন মেয়েদের বিজ্ঞানশিক্ষা যে মেয়েদের থেকেও বিজ্ঞানের পক্ষে অনেক বেশি মারাত্মক— সেইটে বোঝাতে দীর্ঘ এক ভাষণ ফাঁদেন প্রায়শই। জয়নাথ তাঁর বন্ধুকে চেনেন। তাঁরা বর্তমানে সহকর্মী হলেও, একদা সহপাঠীই ছিলেন। এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই একসঙ্গে স্নাতকোত্তর শ্রেণির পাঠ নিয়েছেন। তখন অবিশ্যি রাজাবাজারের এই বাড়ি হয়নি। গোলদিঘির ধারের পুরোনো বাড়িতেই ক্লাস চলত। 'সুরেনটা বরাবরের গোঁয়ার'— বন্ধুর দীর্ঘ ভাষণ শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে ভাবেন জয়নাথ।

কথা ঠিক। সুরেন্দ্রমোহন জেদি ও একগুঁয়ে। উপরন্তু তাঁকে তর্কে হারানোও মুশকিল। বাধ্য হয়ে জয়নাথ একটি চাতুরির আশ্রয় নিয়েছেন, "নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়াস ক্লাসে, পার্টিকল ফিজিক্সের বিজ্ঞানী তুই, মেরি ক্যুরির নামটা জানা আছে তো?" জয়নাথ শ্লেষভরে প্রশ্ন করেছেন। সুরেন্দ্রমোহন বিরক্ত হয়েছেন বক্তব্যে বাধা পড়ায়। এক মুহূর্ত থেমে তিনি গম্ভীরভাবে বলেছেন, "জানা আছে। ম্যাডাম ক্যুরির সঙ্গে সামনাসামনি কথাও বলেছি ব্রাসেলসের কনফারেন্সে, সাতাশ সালে।" জয়নাথ প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন, "তবে?" সুরেন্দ্রমোহনের মুখে এইবার একটি তির্যক হাসি ফুটে উঠেছে, প্রশ্নটি আশা করছিলেন তিনি। পাল্টা বললেন, "আচ্ছা জয়, তুই একজন বিখ্যাত মহিলা বৈজ্ঞানিকের নাম বল দেখি।" জয়নাথ বিষম অবাক হয়ে বললেন, "কেন, এই তো বললুম— মেরি ক্যুরি।" এবারে স্বভাববিরুদ্ধ তরলকণ্ঠে

ফের প্রশ্ন ছুড়েছেন সুরেন্দ্রমোহন, "আচ্ছা বেশ, এবারে আরেকজন বিখ্যাত মহিলা বৈজ্ঞানিকের নাম বল তো।" এইবার জয়নাথ তোতলাতে শুরু করেছেন, "ইয়ে, মানে...।"

সুরেন্দ্রমোহন হেসে উঠেছেন হা-হা করে। তারপর ফের গম্ভীর হয়ে বলেছেন, "ব্যতিক্রমটা ব্যতিক্রমই জয়। প্রকৃতির খেয়াল। ফ্রিক অফ নেচার। সেইটে ভুলিস না।" এতক্ষণে কথা খুঁজে পেয়েছেন জয়নাথ, "কিন্তু অতীতের কথা ভাব সুরেন। আমাদের লীলাবতী, মিশরের হাইপেশিয়া...।" বন্ধুকে কথা শেষ করতে দেননি সুরেন্দ্রমোহন, "অতীতটা অতীতই। সেটা বর্তমান নয়। সময়ের স্রোত পিছনে ফেরানো যায় না। এই যুগে, এই সময়ে, মেয়েদের হাতে বিজ্ঞানের ভার তুলে দেওয়া মানে বিজ্ঞানের গতি রোধ করা।" তীব্রস্বরে কথাগুলো বলে সুরেন্দ্রমোহন দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঘর ছেড়ে। পিছনে জয়নাথ বসেছিলেন স্তম্ভিত হয়ে।

এই হলেন সুরেন্দ্রমোহন। তিনি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেন মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে ঘর-সংসার-সন্তান। সেই প্রবৃত্তির টান এড়িয়ে বিজ্ঞানসাধনায় সর্বস্ব সমর্পণ করা এ যুগের মেয়েদের কর্ম নয়। মেয়েরা যদি বিজ্ঞানসাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তা হলে তা হবে দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলার সমান। তাতে পায়ের ক্ষতি হোক না হোক, নৌকোর গতিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ মুহূর্তে সুরেন্দ্রমোহন নিজের ঘরের জাঁকালো চেয়ারখানিতে বসে বিজ্ঞান গবেষণায় নারীদের অবস্থান সংক্রান্ত কোনও তত্ত্বকথা চিন্তা করছিলেন না। এ মুহূর্তে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর চিন্তা নিবদ্ধ রয়েছে।

ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়। একে তো সরকারবাহাদুর উপুড়হস্তটি করছেন না, ডিপার্টমেন্ট চালানো দায় হয়ে উঠেছে। নিজের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় জার্নাল পর্যন্ত কেনা যাচ্ছে না। নিজের গবেষণার কথা মনে পড়তেই সুরেন্দ্রমোহনের মুখ গম্ভীরতর হয়ে উঠেছে। গবেষণার জন্য শুধু টাকার নয়, ভালো ছাত্রেরও বেজায় অভাব।

হবে না-ই বা কেন, মেঘনাদ সাহা চাকরি নিয়ে পশ্চিমদিকে গেছেন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে আর সত্যেন বোস পূর্বের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। মাঝখানে পড়ে রয়েছেন সুরেন্দ্রমোহন। ডিপার্টমেন্টের বাকি অধ্যাপকেরা গবেষণায় তত উৎসাহী নন। এক-দু'জন ছিলেন বটে, তবে তাঁরাও এখন বিদেশে গিয়েছেন নিজেদের আরব্ধ গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে। ফলে ডিপার্টমেন্টে ভালো ছাত্ররা আসতে অনীহা দেখাচ্ছে।

এ দিকে সুরেন্দ্রমোহন রাশভারী কড়া লোক। মেঘনাদের মতো ছাত্রদরদি বা সত্যেন্দ্রনাথের মতো আপনভোলা তিনি নন। তাঁর দুর্নাম রয়েছে রূঢ়ভাষী হিসেবে। ছাত্রদের খাটানও প্রচুর। সুতরাং যে দু'-একজন পদের ছাত্র আছে তারা ইদানীং প্রফেসর বোসের ল্যাবরেটরি থেকে বিমুখ হয়েই রয়েছে।

গম্ভীরমুখে এইসবই চিন্তা করছিলেন সুরেন্দ্রমোহন, হঠাৎই দরজার ওপার থেকে একটি মৃদু কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "স্যার, আসব?" কণ্ঠস্বরটি চেনেন প্রফেসর। প্রভা চৌধুরী। তাঁর পূর্বতন ছাত্রী। এ বছরেই এম এস সি পাশ করে বেরিয়েছে। কিন্তু এখন? সুরেন্দ্রমোহন সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, "এসো প্রভা, ভিতরে এসো।"

অন্ধকার হয়ে এসেছে। শীতের বেলা, সূর্য তাড়াতাড়ি ডোবে। আলোটা জ্বালানো দরকার। পালিত অধ্যাপকের জন্য একটি বেয়ারা বহাল থাকে অবশ্য, কিন্তু তাকে না ডেকে নিজেই উঠে আলোটা জ্বালালেন সুরেন্দ্রমোহন। প্রভা ততক্ষণে ধীরপদে কুণ্ঠাভরে ঢুকে এসেছে ঘরের ভিতরে। অধ্যাপকের ইশারায় সে সসংকোচে জড়োসড়ো হয়ে বসল একটা চেয়ারে। নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে প্রভার দিকে ঘুরে বসেছেন সুরেন্দ্রমোহন। গলাটা যথাসাধ্য কোমল করে জিজ্ঞাসা করেছেন, "হ্যাঁ, বলো, কেমন আছ? কী করছ আজকাল?"

কণ্ঠস্বর কোমল করার কারণ একটি আছে অবশ্য। ছাত্রীদের অধ্যাপক বোস বিশেষ পছন্দ না করলেও প্রভার আরও একটি পরিচয় রয়েছে। প্রভা চৌধুরী সুরেন্দ্রমোহন বোসের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। প্রভার একমাত্র মাসি সুরমাদেবী। সুরমাদেবীর কন্যা নীলিমা সুরেন্দ্রমোহনের স্ত্রী। সুরেন্দ্রমোহন সম্পর্কে জামাইবাবু হন প্রভার। কিন্তু বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে আত্মীয়তা কখনওই প্রভাকে এম এস সি-র দুই বছরে কোনও বাড়তি সুবিধা দেয়নি, বরং সে কিছুটা এড়িয়েই থেকেছে অধ্যাপককে। তবে আজ প্রভার প্রয়োজনটা কিঞ্চিৎ বেশি, তাই সে নিরুপায় হয়েই এসেছে সুরেন্দ্রমোহনের কাছে।

প্রভার অনুরোধ শুনে সুরেন্দ্রমোহন থ হয়ে গেলেন। অধ্যাপকের প্রবল বিস্ময়ের কারণটা অবশ্য অনুরোধখানি নয়, প্রভার সাহস। মেয়েটা তাঁর কাছে পিএইচ ডি-র গবেষণা করতে চায়। মাথা খারাপ হল নাকি নীলিমার এই বোনটার? ছাত্রমহলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কে সুরেন্দ্রমোহনের মনোভাব অজানা নয়। তিনি সেটা গোপন করার চেষ্টাও করেন না বিশেষ।

প্রভা যখন এম এস সি-তে ভর্তি হল দুই বছর আগে, তিনি বিশেষ খুশি হননি।

কিন্তু প্রভার বাবা ডাক্তার মধুসূদন চৌধুরী ব্রাহ্ম-সমাজে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। কলকাতায় তার বেশ প্রতিপত্তি রয়েছে। সুরেন্দ্রমোহন নিজেও ব্রাহ্ম। তাই সমাজের মোড়লদের চটাতে চাননি তিনি। অগত্যা প্রভার উপস্থিতিকে নিতান্ত তেতোমুখেই মেনে নিতে হয়েছিল তাঁকে। তবে মেয়েটা তাঁর কাছে ঘেঁষত না বিশেষ।

কিন্তু সে আপদ চুকেবুকে গিয়েছিল প্রভার পাশ করার সঙ্গে। তার পরেও কেটে গেছে বেশ কয়েকমাস। আজ আবার ফিরে এসেছে প্রভা। অসম্ভব একখানি অনুরোধ রেখে সপ্রশ্নে তাকিয়ে রয়েছে অধ্যাপকের দিকে। সুরেন্দ্রমোহনের প্রথমে ইচ্ছা হল হো-হো করে সশব্দে হেসে ওঠেন। বোকা মেয়েটার স্পর্ধিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা উড়ে যাক হাসির দমকে। মেয়েটা বুঝুক কী অসম্ভবের আশা করে সে বৃথাই সময় নষ্ট করছে। কিন্তু হাসলেন না অধ্যাপক। কোনও কথাই বললেন না। মুখটিকে গম্ভীরতর করে টেবিল থেকে চার্লস কালভারের ‘এ টেক্সটবুক অফ ফিজিক্স’ বইখানি নিয়ে তার পাতা উল্টাতে থাকেন মনোযোগ দিয়ে।

কিছুক্ষণ কেটে যায় নিস্তব্ধতায়। প্রভা উশখুশ করতে শুরু করেছে। প্রফেসর নিশ্চুপ কেন? কিছু তো বলবেন। প্রভা জানে সুরেন্দ্রমোহনের ল্যাবরেটরির জন্য গবেষক দরকার। আর গবেষণা করা প্রভার বহুবর্ষলালিত স্বপ্ন। আরও পাঁচ মিনিট কেটে যায় শীতল স্তব্ধতায়। শুধু বড়ো দেওয়াল ঘড়ির পেন্ডুলামটার শব্দ হচ্ছে—টিক্ টিক্। বিভা এইবার দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে জিজ্ঞাসা করে উঠেছে, “স্যার?” তার কথায় একটি শব্দই ছিল বটে, কিন্তু প্রশ্ন ছিল অনেক। আর ছিল এমন একটা মরিয়া ভাব যে, সুরেন্দ্রমোহন কঠিন শীতল উপেক্ষার অদৃশ্য দেওয়ালের ওপার থেকেও তা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না।

হাতের বইটা ফের টেবিলে নামিয়ে রেখে তিনি প্রভার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, “সে সম্ভব নয় প্রভা। তুমি কী যেন করছ, ও হ্যাঁ মাস্টারি—সেইটেই করো মন দিয়ে। আর মধুবাবুকে বোলো, তোমার জন্য যেন পাত্র দেখেন দেরি না করে।” অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর তাঁর দৃষ্টির চেয়েও কঠিনতর। কিন্তু প্রভা এখন আর সে-সব খেয়াল করছে না। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিজ্ঞানী, বিশ্রুত অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন বোস এসমস্ত কী বলছেন? ‘মাস্টারি করো মন দিয়ে’, ‘পাত্র দেখেন দেরি না করে’? প্রভা কানাঘুষোয় মেয়ে স্টুডেন্টদের প্রতি অধ্যাপকের মনোভাবের কথা শুনেছে বটে। এইটাই কী কারণ?

কিন্তু আজ প্রভা শূন্য হাতে ফিরবে না। হয় প্রফেসরের সম্মতি, অথবা অসম্মতির

কারণ— একটি সে আদায় করেই ছাড়বে। প্রভা বলে উঠল, "কেন স্যার? আপনি তো স্টুডেন্ট খুঁজছেন রিসার্চ করাবেন বলে। তা হলে?" কথাটা সত্যি। কিন্তু এ দিকে সুরেন্দ্রমোহন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। কী অসম্ভব দুঃসাহস মেয়েটার। ক্লাস নিতে গিয়ে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি। কিন্তু ক্লাসের একধারে বেঞ্চে খাতার উপর মুখ নামিয়ে বসে থাকা রোগাভোগা মেয়েটার মধ্যে এত তেজ এল কোথা থেকে? বাপের স্বভাব পেয়েছে মেয়েটা।

সুরেন্দ্রমোহন একবার ভাবলেন মেয়েটাকে বেয়ারা ডাকিয়ে দূর করে দেবেন ঘর থেকে। কিন্তু ফের ব্রাহ্ম-সমাজের কথাটা তাঁর মনে পড়ল। তাঁর নিজেরও একটি মেয়ে রয়েছে। সমাজে দুর্নাম হলে পরে সে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। আর হিন্দু ঘরের কোন ছেলেটাই বা বিয়ে করবে ব্রাহ্ম-বাড়িতে? সবাই তো আর প্রভা চৌধুরীর বাপ মধুসূদন চৌধুরীর মতো হয় না। নাঃ, এ মেয়েকে তাড়াতে হবে অন্যভাবে।

সুরেন্দ্রমোহন উঠে পড়েছেন চেয়ার থেকে। প্রভার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলছেন, "কারণ জানতে চাও, তাই তো? বেশ, কারণটা নিজেই দেখে নাও তবে।" অধ্যাপকের খাড়া নাক অল্প অল্প কাঁপছে, গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। প্রভা বুঝেছে সুরেন্দ্রমোহন অত্যন্ত রেগেছেন। কিন্তু কেন? সে তো অন্যায় কিছু বলেনি। তবে? হতবুদ্ধি প্রভার চোখের সামনে দিয়ে সুরেন্দ্রমোহন চলে গেছেন ঘরের অন্যপ্রান্তে। সেখানে রাখা আছে সেগুন কাঠের একটি বেশ বড়ো আলমারি। তার তাক হাতড়াচ্ছেন ক্রুদ্ধ অধ্যাপক। ভাবছেন ঠিক বাপের মতোই জেদি হয়েছে মেয়েটা। তবে এর ওষুধ আছে, সেটিই প্রয়োগ করতে হবে ঠিক করে।



জুলাই ১৮৯৮, ভাঙনতলা, হুগলি

“সকাল থেকে তোমাদের পিছনে খাটতে খাটতে আর পারিনে বাপু,” অভিযোগের সুরে কথাগুলি বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন কুসুমবালা। হাতে একখানি গামছা। ঘরের মধ্যে খালিগায়ে তেল মেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাড়ির কর্তা প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী। গিন্নির অভিযোগে তাঁর মুখ প্রথমে কালো হয়ে উঠলেও, কুসুমবালার হাতের গামছাখানি দেখে তাঁর মনটা ফের খুশি হয়ে উঠেছে।

গতবছর এক প্রজা নবান্নের দিনে এই গামছাখানি ভেট করে গেছিল চৌধুরীদের সেজো তরফের কর্তা অর্থাৎ প্রাণকৃষ্ণকে। কুষ্টিয়ার বিখ্যাত কুমারখালি গামছা। প্রথমদিন ব্যবহার করেই একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন প্রাণকৃষ্ণ। আহাহা, যেন রেশম একেবারে। তারপর থেকে অষ্টপ্রহর ওই গামছা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চোখের আড়াল হতে দিচ্ছেন না। কুসুমবালা দু’-একবার ধমকও দিয়েছেন, “তোমার কোনও আক্কেল নেই গা? জমিদার মানুষ, মুটে মজুরের মতো গামছা কাঁধে ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছ?”

তা প্রাণকৃষ্ণ অত গা করেননি। মানুষটা ওরকমই। জমিদারসুলভ হাবভাব একেবারেই নেই, বরং কুসুমবালার দাপট বেজায়। বকলমে বাড়ির আসল কর্তা তিনিই। প্রাণকৃষ্ণ তাতে বরং খুশিই আছেন। সংসারের চিন্তা এমনিতেও নেই।

জমিদারির আয়ের উপর রয়েছে নিজেদের জমির ফসল, সবজি, আট পুকুরের মাছ। বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার নায়েব, গোমস্তা আর স্ত্রীর হাতে ছেড়ে প্রাণকৃষ্ণ তাস, দাবা, পাশা আর মাছধরা নিয়ে দিব্যি রয়েছেন। বিষয়ের কাজ সামলেও কুসুমবালার প্রখরদৃষ্টি সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটিতে রয়েছে যদিও।

আজ সক্কাল-সক্কাল স্নান করে নেওয়ার তালে ছিলেন জমিদারমশাই। পাশের গ্রাম থেকে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছিলেন কিঞ্চিৎ বিষয়কর্মে, সে-সব সেরে নিয়ে এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে তাঁরা পাশায় বসবেন। উদ্যোক্তা স্বাভাবিকভাবেই প্রাণকৃষ্ণ। সে-জন্যই স্নান-খাওয়া করে নেওয়ার তাড়া গৃহস্বামীর।

কিন্তু স্নান করার জন্য তেল-টেল মেখে তৈরি হয়ে প্রাণকৃষ্ণ দেখতে পেলেন সাধের গামছাখানা হাপিশ। সারা বাড়ি তোলপাড় করেও যখন সেই কুমারখালি গামছাখানার হদিস মিলল না, প্রাণকৃষ্ণ স্ত্রীর শরণাপন্ন হলেন। আর এখন সেই গামছাটি কোথা থেকে যেন খুঁজে নিয়ে এসেছেন কুসুমবালা। গামছা পেয়ে ভারী খুশি প্রাণকৃষ্ণ। নাকে দু'ফোঁটা সর্ষের তেল ফেলে খিড়কি-পুকুরের দিকে এগোচ্ছেন, এমন সময় কুসুমবালা ডেকে বললেন, "হ্যাঁ গা, সান্যাল-মশায়ের সঙ্গে সে-কথাটা কওয়ার ব্যাপার মনে আছে তো?" প্রাণকৃষ্ণ থেমে গেলেন। শিবরাম সান্যাল বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি। বিষয়কর্মে এসেছেন ঠিক কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা তাঁর হাতে পাশার দান যেন কথা বলে। প্রাণকৃষ্ণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সান্যাল-মশায়ের সঙ্গে পাশা খেলার জন্য।

সান্যাল-মশায়কে কী বলতে হবে? কুসুমবালা কিছু বলেছিলেন নাকি? প্রাণকৃষ্ণ গামছার শোকে বোধহয় সে-সব ভুলে বসে রয়েছেন। প্রমাদ গোনেন তিনি। এইবার গৃহকর্ত্রীর তর্জন-গর্জন শুরু হলে স্নান করতে বেলা গড়িয়ে যাবে, আর তারপর খাওয়া-দাওয়া— ওরে বাবা, পাশা খেলা কি হবে না আজকে? প্রাণকৃষ্ণের বিপন্ন মুখ দেখে কুসুমবালা ব্যাপারটি ঠিকই বুঝেছেন। কপালে করাঘাত করে তিনি বললেন, "বুড়োর ভীমরতি হয়েছে গো, হায় হায়! কী দেখে যে বাপ মা এমন কাছাখোলা লোকের হাতে আমায় তুলে দিল পইপই করে যে বললাম তোমায়, মধু-র জন্য সান্যাল-মশায়ের মেয়েটিকে পছন্দ করেছি, আজকে এইবেলা কথা কয়ে নেবে। সব ভুলে গেছ গো?"

এইবার প্রাণকৃষ্ণ মনে করতে পেরেছেন। গেল-হপ্তায় পাশের গ্রামে শিবপুজো দিতে গিয়ে শিবরাম সান্যালের পঞ্চদশী কন্যাটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সুপুত্র মধুসূদনের জন্য মনে মনে পছন্দও করেছেন মেয়েটিকে। সেই কুটুম্বিতার কথা

পাড়ার জন্যই আজ এত তোড়জোড়। অপ্রতিভ প্রাণকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে সামলে নেওয়ার জন্য বললেন, "ওহো সেই কথা? আরে সেইটা ভুলব কেন? সে-সব মনে ঠিকই আছে। কিন্তু মধুকেও তো আসতে হবে নাকি?" কুসুমবালা তাঁর ভুলো স্বামীটিকে ঠিকই চেনেন। কথা না বাড়িয়ে তিনি বললেন, "মধু আসবে দুপুরের গাড়িতে। তুমি দেরি না করে এইবেলা নেয়ে নাও গে।"

প্রাণকৃষ্ণ কুসুমবালার একমাত্র সন্তান মধুসূদন কলকাতায় সায়েবদের মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে। প্রাণকৃষ্ণর অবশ্য ইচ্ছা ছিল না ছেলেকে অতদূর পাঠানোর। স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, "দু'খানা পাশ দিল তো মধু, আর পড়ে কী হবে? বিষয়সম্পত্তি সামলানোরও একটা ব্যাপার আছে বলো?" কুসুমবালা উত্তরে ঝেঁঝে বলেছিলেন, "ছেলেটাকে নিজের মতো অকম্মার ঢেঁকি না বানালে চলবে কেন? সুরো-দাদার ছেলে ডাক্তারি পাশ করে এখন কত নাম করেছে জানো? সুরো-দাদার সম্পত্তি কম? তোমার তিনগুণ।"

সুরেশ লাহিড়ী কুসুমবালার আপন পিসতুতো দাদা। বরিশালের বড়ো জমিদার। তাঁর পুত্রটি ক্যাম্পবেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে এখন বেশ পসার করে ফেলেছে। আসল কথা এই ভাইপোটিকে দেখেই ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে মনস্থ করেন কুসুমবালা। তাঁর রূঢ় কথায় স্বামী আঘাত পেয়েছেন দেখে কুসুমবালা এবার নরমভাবে বললেন, "দিনকাল পাল্টাচ্ছে, বোঝো তো। এভাবে বসে বসে জমিজমার আয়ে খাওয়া যাবে না আর। কলকাতায় অনেক সুযোগ-সুবিধা হচ্ছে এখন। মধু জলপানি পেয়েছে, ডাক্তারি পড়লে ও নাম করবে। আর আমি তো রইলামই, তোমার বিষয় আর তোমার দেখাশুনো করার জন্য।" শেষ কথাটা বলে মৃদু হাসেন কুসুমবালা।

সেই মধুসূদন আজ ডাক্তারির শেষ একজাম দিয়ে বাড়ি ফিরছে মায়ের ডাকে। ছোটো থেকেই সে মায়ের নিতান্ত বাধ্য। কুসুমবালার মনোগত ইচ্ছে ছেলের সঙ্গে সান্যাল-মশায়ের ওই সুলক্ষণা কন্যার বিয়ে দিয়ে ছেলেকে কলকাতাতেই থিতু করে দেবেন। সেখানেই সংসার করুক, ডাক্তারি করুক। গোমস্তাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, সে বেলিয়াঘাটার কাছে একখানা বড়ো দোতলা বাড়িও দেখে এসেছে। সব কথাবার্তা চুকে গেলে বাড়িটা বায়না করে ফেলতে হবে। কুসুমবালা দ্রুতপদে পাকশালের দিকে গেলেন, এখনও হাজারও কাজ বাকি।

* * *

সন্ধ্যাবেলা মা-বাবার শোয়ার ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল মধুসূদন। খাটে বসে রাগে ফুঁসছেন কুসুমবালা। তীব্র ক্রোধে তাঁর নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে, গা কাঁপছে। স্ত্রীর অবস্থা দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ওগো তুমি শান্ত হও। বুকের ব্যামো ধরাবে শেষে একটা।" স্বামীর দিকে তাকিয়ে তীব্রকণ্ঠে কুসুমবালা বললেন, "থামো তুমি। তোমার জন্যেই ছেলেটা এমন অমানুষ হয়েছে।" ধমক খেয়ে প্রাণকৃষ্ণ মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন, যেন সমস্ত দোষ তাঁরই। অথচ প্রকৃত দোষী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মায়ের চোখে চোখ রেখে। সে চোখে অনুশোচনার চিহ্নমাত্র নেই।

অনুশোচনার যোগ্য কাজ কিছু করেছে বলেও ভাবে না মধুসূদন। বাড়িতে সে আজ পৌঁছে গিয়েছিল দুপুরের আগেই। কুসুমবালা ছেলেকে দেখে খুশি হয়েছেন। তারপর বলেছেন, "একটু জিরিয়ে নিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে নে জলদি। বিকেলে উনি পাশায় বসার আগেই সান্যাল-মশায়ের কাছে কথাটা পাড়তে হবে। তোকে দেখে যান উনি, কেমন সোনার টুকরো ছেলে আমার।" কুসুমবালা চিবুক ছুঁয়ে আদর করেছেন তাঁর 'সোনার টুকরো' ছেলেকে। ছেলে অবশ্য মায়ের কথার একবর্ণও বোঝেনি— হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছে। কুসুমবালা তখন ধীরেসুস্থে সবটা খুলে বলেছেন মধুসূদনকে।

"কী করেছ তুমি মা? আমাকে না জানিয়ে এত কিছু! এ সম্ভব নয় মা, তুমি ওদের মানা করে দাও।" ছিটকে গিয়ে প্রায় আর্তকণ্ঠেই বলেছে মধুসূদন। ছেলের বিব্রতভাব দেখে কুসুমবালা মনে ভেবেছেন তরুণ পুত্র মায়ের মুখে নিজের বিয়ের কথা শুনে লজ্জাবোধ করেছে, সেটা ঢাকার জন্য এই চঞ্চলতার ভান। কিন্তু এখন প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে, এ দিকে মন দেওয়ার সময় নেই গৃহকর্ত্রীর। ছেলেকে শুধু, "সে সব পরে হবে অখন। এখন আমার হাত জোড়া, অত বকতে পারছি না বাপু," বলে ভিতরবাড়িতে চলে গিয়েছিলেন তিনি। বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল মধুসূদন।

মা চলে যাওয়ার পরেও মধুসূদন অনেকক্ষণ স্থাণু হয়ে ছিল। কুসুমবালার কথা তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে। সে-ও আজ বাড়িতে বিয়ের কথাই পাড়তে এসেছিল। তবে শিবরাম সান্যালের পঞ্চদশী কন্যা নয়, কলকাতার বেলতলা রোডের বাসিন্দা অদ্রীশ মজুমদারের কন্যা উনিশ বছর বয়স্কা শান্তাকে সে মন দিয়ে বসে আছে, তাকে বিয়ে করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বছরখানেক আগে, তরুণী শান্তা হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়— পা কেটে একটা বিশ্রী ঘা হয়ে গেছে। হিঁদুবাড়িতে এখনও সাহেবদের

হাসপাতালে যাওয়া নিয়ে হাজার একখানা সমস্যা রয়েছে। কিন্তু শান্তার পিতা অদ্রীশ মজুমদার এসকল সংস্কার হতে মুক্ত। তিনি হিন্দু নন, ব্রাহ্ম-সমাজের একজন মাথা এবং প্রচারক।

ডাক্তার হাওয়ার্ড-সায়েবের প্রিয় ছাত্র মধুসূদন। তিনি মাঝেমধ্যেই চিকিৎসার সময় মধুসূদনকে সঙ্গে করে নিয়ে যান— এতে ছাত্রের অভিজ্ঞতা বাড়ে। সে-দিনও মধুসূদন গিয়েছিল হাওয়ার্ড-স্যারের পিছন পিছন। তারপর শান্তা সুস্থ হল, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, কিন্তু তরুণ চিকিত্সা-বিদ্যার্থীটি তরুণীর পিছু ছাড়ল না। কয়েকদিন পরেই সে খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হয়েছে তাদের বেলতলা রোডের বাড়িতে। অজুহাত— ডাক্তার হাওয়ার্ড নাকি ছাত্রকে পাঠিয়েছেন রোগিণীর খোঁজখবর করতে।

সে-অজুহাত অবশ্য বেশিদিন টেঁকেনি। অদ্রীশ মজুমদার বহুদর্শী বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি একদিন মধুসূদনকে আলাদা করে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাপু ব্যাপারখানা কী বলো দেখি। মেডিক্যাল কলেজে সরকার কি আজকাল রুগিপিছু একজন করে ডাক্তার বরাদ্দ করছেন নাকি? তাও রোগ সেরে যাওয়ার পরে।" লজ্জায় লাল হয়ে মাথা নিচু করে তোতলাতে তোতলাতে মধুসূদন প্রকাশ করল তার মনোগত বাসনাটির কথা। সে শান্তাকে খুবই পছন্দ করে, এবং শান্তারও এ ব্যাপারে কোনও অমত নেই। অদ্রীশ অন্দরমহলে খোঁজ নিয়ে জানলেন মধুসূদনের শেষ কথাটি সত্যি। তারপর আরও একটি খোঁজ নেওয়ার বাকি ছিল অবশ্য, মধুসূদনের পরিবার বিষয়ে সন্ধান করা।

সম্পদশালী ভদ্রঘর, আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু একটি অলঙ্ঘনীয় বাধা রয়েছে। মধুসূদন হিন্দু ব্রাহ্মণসন্তান, মজুমদারেরা কায়স্থ এবং আরও মারাত্মক— ব্রাহ্ম। অদ্রীশ বললেন, "বাপু মধুসূদন, এ বিবাহে আমার তো কোনওই আপত্তি নেই, কিন্তু তোমায় যে ব্রাহ্ম হতে হবে। তা ছাড়াও রয়েছে তোমার পরিবারের বিষয়টি। ওটাও তোমাকে সামলাতে হবে। এমনিতে আমাদের সমাজে শান্তার জন্য পাত্রের অভাব হবে না। কিন্তু শান্তার মা বললেন, মেয়েটা নাকি তোমাকে মনে মনে খুবই পছন্দ করে। তাই এই দুটো ব্যাপার ঠিক হয়ে গেলে আমার আর কোনও আপত্তি নেই।"

সেই কথা বলবে বলেই মনস্থির করে বাড়ি এসেছে মধুসূদন। কিন্তু আকস্মিকভাবে এই বিনামেঘে বজ্রপাত। অনেকক্ষণ ভেবেও যখন চৌধুরীকুলতিলক কোনও কর্তব্যকর্মই স্থির করতে পারল না, তখন সে মাতৃ-আদেশ শিরোধার্য করে আপাতত স্নান-খাওয়া করে নিতেই মনস্থ করল। বিপদ এল বিকেলবেলায়। বাবা-ছেলের

মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা ছিল অভ্যাগতদের সঙ্গেই— মধুসূদন মাকে একলা পায়নি কোনওমতেই। বিপুল খাওয়া-দাওয়ার পরে অতিথিরা একটু গড়িয়ে নিয়েই পাশায় বসবেন, তার আগেই স্ত্রীর নির্দেশমতো প্রাণকৃষ্ণ পেড়ে ফেলেছেন কথাটা। মধুসূদন তখন সেখানেই উপস্থিত। দরজার আড়ালে রয়েছেন কুসুমবালাও।

শিবরাম সান্যাল এককথায় রাজি। প্রাণকৃষ্ণ উৎসাহের চোটে ছেলের হাত ধরে সামনে টেনে এনে বললেন, "নাও বাবা, সান্যাল-মশায়ের পায়ের ধুলো নাও।" মধুসূদন এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আগুপিছু কিছু না ভেবেই হাতজোড় করে সে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বলেছে, "আমায় আপনারা মাফ করবেন, এ বিয়ে আমার দ্বারা হবে না। আমি নিজের জন্য মেয়ে দেখে রেখেছি কলকাতায়। আমার বাপ-মায়ের কোনও দোষ নেই, ওঁরা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না।"

এখন সন্ধ্যা হয়েছে। শিবরাম সান্যাল অনেক আগেই সপার্ষদ চৌধুরীবাড়ি ত্যাগ করেছেন। কুসুমবালার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। প্রাণকৃষ্ণও বেজায় দুঃখিত। কিন্তু তার কতটা এই ঘটনার অভিঘাতে আর কতখানিই বা পাশাখেলা ভেস্তে যাওয়ার জন্য, সেটা হলফ করে বলা মুশকিল। অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে মধুসূদনের পছন্দের মেয়েটির পারিবারিক পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার পর। "ব্রাহ্ম?" রাগে কাঁপতে কাঁপতে শুধু বলতে পেরেছিলেন কুসুমবালা। তারপর থেকে ছেলের সঙ্গে কোথাও বলছেন না তিনি। মধুসূদন অবশ্য এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। যা থাকে থাকুক কপালে, এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই।

স্বামীকে দাবড়ানি দিয়ে কুসুমবালা ছেলের দিকে ফিরে বললেন, "এ মতলব তোমায় ছাড়তে হবে মধু। এ সম্বন্ধ হতে পারে না।" তাঁর কণ্ঠস্বর ভয়ানক গম্ভীর। মধুসূদন সটান উত্তর দিল, "সে হতে পারে না মা। আমি শান্তাকে ভালোবাসি। আর আমি কথাও দিয়েছি তাঁদের।" কুসুমবালা নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'ভালোবাসা'? মধুর কাছে সে-বস্তুটা আজ বড়ো হয়ে গেল মাতৃ-আদেশের থেকে? কিন্তু ছেলে বড়ো হয়েছে। তার উপর যদি মায়ের ইচ্ছের জোর না চলে তবে আর উপায় কী? মরিয়া হয়ে তাই তিনিও বলে উঠলেন, "বেশ। তবে জেনে রেখো, আজ থেকে তুমি তেজ্যপুত্তুর। চৌধুরীবাড়ির একটা ধুলোর কণাও তুমি পাবে না।"

পরের দিন সকালেই নিজের বাক্স গুছিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল মধুসূদন। চৌধুরীবাড়ির সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই তার।



ডিসেম্বর ১৯৩৬, কলকাতা

সুরেন্দ্রমোহন খুব ভুল ভাবেননি। বাপ-ঠাকুমার জেদ প্রভার মধ্যেও রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। আর সেই জেদের বশেই সে এখনও বসে রয়েছে অধ্যাপকের সামনে। অন্য কেউ হলে হয়তো ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিত এতক্ষণে। কিন্তু প্রভা হাল ছাড়েনি। সুরেন্দ্রমোহন তার যোগ্যতা যাচাই করতে চান, নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেবে প্রভা। আজ, এই মুহূর্তেই।

পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিনই বেছেছেন সুরেন্দ্রমোহন। আলমারি থেকে দু'-একখানি বিদেশি জার্নাল বেছে বেছে তুলে এনেছেন। পশ্চিমের সাম্প্রতিক গবেষণার নথিবদ্ধ নিবন্ধ পত্রিকা। এখনও, এই বিংশ শতাব্দীর ছত্রিশটি বছর অতিক্রান্ত, তবুও এই জার্নালগুলি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের হাতে আসতে আসতে প্রায়শই বহু দেরি হয়ে যায়। এই যেমন এই মুহূর্তে প্রভার সামনে টেবিলে সুরেন্দ্রমোহন দড়াম করে ছুড়ে ফেলেছেন দু'খানি জার্নাল। একটির নাম 'ফিজিক্যাল রিভিউ', আর-একটির নাম 'সায়েন্স'। এয়ারমেলে এসেছে আমেরিকা থেকে। দেখে বোঝা যায় বেশিদিন আগেও আসেনি। অথচ পত্রিকার উপর ছাপা আছে তাদের প্রকাশের বছর। ১৯৩২ ও ১৯৩৩।

সুরেন্দ্রমোহন দু'খানি নিবন্ধ দেখিয়ে দিয়েছেন প্রভাকে। প্রভা ঝুঁকে পড়ে দেখল প্রবন্ধ দু'খানি একই ব্যক্তির লেখা। কার্ল অ্যান্ডারসন। ওরে বাবা। এ বছরই ফিজিক্সে

নোবেল পেয়েছেন তো ইনি। মার্কিন দেশের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে ওরফে ক্যালটেক-এ গবেষণা করেন। সুরেন্দ্রমোহন পদার্থবিদ্যার যে শাখায় নিজে গবেষণা করেছেন সেই একই শাখায় কাজ করছেন অ্যান্ডারসনও, এবং ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়েও গেছেন।

এ বছরেরই প্রথমদিকে— বিভা তখনও পাশ করে বেরোয়নি— সুরেন্দ্রমোহন ক্লাসে বলেছিলেন এই বিজ্ঞানীর কথা। অ্যান্ডারসন নাকি নোবেল পাওয়ার প্রবল দাবিদার। অধ্যাপকের কথাই সত্যি হয়েছিল। এ বছরেই দুই-তিনমাস আগেই ঘোষণা হয়েছে নোবেল প্রাইজের। সুরেন্দ্রমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করে প্রাইজ পেয়েছেন ক্যালটেক—এর বিজ্ঞানী।

কিন্তু তাকে অ্যান্ডারসনের লেখা নিবন্ধ পড়তে দিচ্ছেন কেন অধ্যাপক? প্রভা দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল একটা নিবন্ধতে ক্লাউড চেম্বারে করা পরীক্ষা নিয়ে লিখেছেন অ্যান্ডারসন। ক্লাউড চেম্বার। বাঙালি গবেষকরা নিজেদের মধ্যে এই বিশেষ যন্ত্রটিকে মেঘকক্ষ বলেও অভিহিত করেন। নামখানা বেশ মোক্ষম। মেঘই তৈরি হয় ওই কক্ষে।

কণাবাহী কোনও রশ্মিকে একদিক থেকে ঢোকানো হয় এই কক্ষে। কক্ষটি পূর্ণ থাকে জলীয় বাষ্প বা গ্যাসীয় অ্যালকোহলে। চরম গতি ও শক্তিতে পরিপূর্ণ রশ্মির এই কণাগুলি চলার পথের গ্যাসীয় অণুতে ধাক্কা মেরে তাদের ইলেক্ট্রনগুলিকে অপসারিত করে সঙ্গে সঙ্গেই। ইলেক্ট্রনগুলি ভাগলবা হওয়ার মুহূর্তেই ওই গ্যাসের অণুগুলিতে সৃষ্টি হয় তড়িদাধান।

নবসৃষ্ট এই তড়িদাহিত গ্যাসীয় কণাগুলির চারদিকে এক এক করে এসে জড়ো হয় অনাহত বাকি সব গ্যাসীয় অণু। তড়িদাহিত গ্যাসীয় কণাদের ঘিরে ধরে তারা তৈরি করে বাষ্পীয় বিন্দু। এইসব বাষ্পীয় বিন্দু ঘনীভূত হতে শুরু করে তৎক্ষণাৎ আর তৈরি করে বাষ্পের মেঘ। ফলে ওই মূল কণাবাহী রশ্মির যাত্রাপথটি প্রকট হয়ে ওঠে চতুর্দিকের ওই মেঘের উপস্থিতিতে।

এক-এক ধরনের মৌলিক কণা বহন করে এক-এক রশ্মি। তাই কক্ষ পূর্ণকারী বাষ্পের উপর এক-এক রশ্মির অভিঘাতও ভিন্ন ভিন্ন, ফলে স্বাভাবিকভাবে তাদের যাত্রাপথের যে আকৃতিচিহ্নের ছাপ পড়ে এই বাষ্পের মেঘে তা-ও এক-এক রকমের। সুবিধের ব্যাপার হল কোন কোন মৌলিক কণা কেমন কেমন চিহ্ন ছেড়ে যায় বাষ্পমেঘের উপর, কেমন আকৃতি-অভিমুখের পথ তৈরি করে যেতে যেতে— সেইটে জানা রয়েছে আগে থেকেই। ফলে বহিরাগত রশ্মিতে কী ধরনের কণা রয়েছে

সেটা বোঝা সম্ভব হয় ওই বাষ্পমেঘের উপর তাদের সঞ্চারচিহ্ন পর্যবেক্ষণ করেই। এমনকি নতুন ধরনের অজানা অপর্যবেক্ষিত কণাও যদি থাকে ওই রশ্মিতে, তা হলে সেই নতুনের উপস্থিতিও বোঝা যায় অদৃষ্টপূর্ব সঞ্চারপথের আকৃতি-অভিমুখ দেখে।

ক্লাউড চেম্বারের এই মোদ্দা ব্যাপারটা প্রভা জানে মোটামুটি। প্রফেসর বোসই বলেছেন তাদের। নিজের ল্যাবরেটরিতে একখানা কাজ চালাবার মতো ক্লাউডচেম্বার বানিয়েওছেন। তবে তাতে কাজ করার অধিকার ছিল না এম এস সি স্টুডেন্টদের। যন্ত্রটি দেখে এবং প্রফেসরের লেকচার শুনেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। প্রথম দিকে প্রভা বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। ল্যাবরেটরিতে ক্লাউড চেম্বার যন্ত্রখানির সামনে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক বক্তৃতা করছেন, তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে উৎসুক ছাত্রের দল। বিভা এক কোণে সরে দাঁড়িয়েছিল অন্যমনস্কভাবে। কিন্তু সুরেন্দ্রমোহনের একটি কথায় তার চমক ভাঙল।

"কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মি অসংখ্য জ্ঞাত-অজ্ঞাত মৌল কণার সমাহার। In a way these rays are but particles of high energy. These particles travel through space, through galaxies, carrying the unknown truths of universe. আর এই ক্লাউডচেম্বারে আমরা সেই কণাদের চিহ্নিত করে, জেনে বুঝে নিয়ে মহাবিশ্বের সেই সব অজানা সত্যের খোঁজ পেতে পারি। My dear students, let me tell you something. Might come as a surprise, but believe me when I say this little glass chamber can in fact reveal the biggest secrets of the universe we all live in."

সুরেন্দ্রমোহনের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর প্রভাকে সজাগ করে তুলেছে। মহাবিশ্বের অসীম অপার রহস্য তাকে ছাত্রজীবনের প্রথম থেকেই তীব্র আকর্ষণ করে এসেছে। শুধু কল্পনায় এই মহাবিশ্বের গম্ভীর বিরাটত্বের উপাসনা নয়, একজন বিজ্ঞানীর মতোই সে চায় এই বিশালত্বের স্বরূপ জানতে। তার নিজের অস্তিত্বটি মূর্ত হয়ে উঠেছে যে বিপুল অস্তিত্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ রূপে, সেই ব্রহ্মাণ্ডের সত্য সে জানতে চায়। পশ্চিমা বিজ্ঞানের নবসূত্রপাত রেনেসাঁর হাত ধরে। আজ সেই রেনেসাঁর সময় থেকে মানবসভ্যতার যে-উদ্যম মহাবিশ্বকে জানার— সেটুকু প্রভা জেনে ফেলেছে মোটামুটি। কখনও বাবার লাইব্রেরি থেকে, কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে আর লাইব্রেরিতে তার সে-জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছে। কিন্তু তবু পিপাসা মেটেনি এই পড়ুয়া তরুণীটির।

প্রভা জানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উন্নতি হয়েছে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের। যত

সময় এগিয়েছে বিপুল বিস্তার পেয়েছে মহাবিশ্বের অসীম রহস্যভাণ্ডার। মানুষ যত জেনেছে আরও বেশি বেড়েছে অজানার পরিমাণ। কিন্তু মানুষ হাল ছাড়েনি, এখনও ক্রমাগত তারা ব্যাপৃত মহাকাশের পথে মহাবিশ্বের সত্যোদ্‌ঘাটনে। আজ প্রভা সেই রহস্যসন্ধানীদের অংশ হতে চায়। পরম সত্যের সেতুসন্ধানে নিজের বালিমুঠিটি রাখতে চায় সযত্নে।

কিন্তু শুরু করবে সে কোথায়? নিরাকার সত্যের কাছে পৌঁছোনোর পথের শুরুটি কীভাবে হবে তার? এসব প্রশ্ন এতদিন বিব্রত করেছে, বিধ্বস্ত করেছে প্রভাকে। কিন্তু আজ প্রফেসর বোসের কথা শুনে মনে হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে একটি আলোকরেখা। সত্যসন্ধানের চিরন্তন যাত্রাপথের একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

সেইদিনই ঠিক করেছিল প্রভা, মহাজাগতিক রশ্মি নিয়েই সে গবেষণা করবে। আর সেটা করবে সুরেন্দ্রমোহনের কাছেই। তাই পাশ করে বেরিয়ে একটি স্কুলে চাকরি নিয়েও সুস্থির হতে পারেনি সে। আজ বহুকষ্টে সাহস সঞ্চয় করে সে এসেছে সুরেন্দ্রমোহনের দরজায়। কিন্তু প্রফেসরের মতলবখানা কী? মতলবখানা অবশ্য তক্ষুনিই বোঝা গেছে। গম্ভীর কণ্ঠে সুরেন্দ্রমোহন বলেছেন, "এই দু'খানা আর্টিকল পড়ো এখানে বসে। যতক্ষণ লাগে লাগুক। তারপর এই খাতায় লিখে ফেলো অ্যাবস্ট্রাক্ট। গবেষণাটার সারসংক্ষেপ।" প্রভা স্তম্ভিতের মতো চেয়ে রয়েছে। এ কী বলছেন অধ্যাপক!

প্রভার বিমূঢ় অবস্থাটা যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন সুরেন্দ্রমোহন। চিবিয়ে চিবিয়ে তিনি ফের বললেন, "আর্টিকলের উপরে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট আছে, সেটাকে ঢাকা দিয়ে রাখো। দেখবে না। নিজে লিখবে যা লেখার। অবশ্য দেখে লিখলে আমি ঠিকই বুঝতে পারব।" ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন বোস।

প্রথমে কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল প্রভা। এ অসম্ভব। নিবন্ধ দু'টি বুঝতে গেলে ক্লাউডচেম্বারে হাতে কলমে কাজ জানা থাকা দরকার। প্রভা তো তা করেনি কখনও। আর প্রফেসর বোসও সেটা জানেন ভালো করেই। জেনে বুঝেই তিনি প্রভাকে ফেলেছেন এই ফাঁদে। হতাশ প্রভা আর-একবার পড়ে নিবন্ধ দু'খানি। নিবন্ধ দু'টি আসলে একটিই মূল কাজের উপর ভিত্তি করে লেখা। প্রাথমিকভাবে তাতে চোখ বুলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, ওই ক্লাউডচেম্বার ব্যবহার করেই অ্যান্ডারসন খুঁজে পেয়েছেন একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কণা। অদ্ভুত সেই কণা। সবরকমভাবে মৌল

কণা ইলেক্ট্রনের সঙ্গে চমকপ্রদ মিল তার। কিন্তু তফাত একটিই, তফাত মারাত্মক। ইলেক্ট্রনের আধান ঋণাত্মক, এই কণাটির ধনাত্মক আধান।

বেশ কয়েকবছর আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা এমন একখানি কণার উপস্থিতির সম্ভাবনার কথা বলে আসছেন বটে, বিভাও পড়েছে। কিন্তু এই অ্যান্ডারসন ক্লাউড চেম্বারে তার অস্তিত্বের কথা হাতে কলমে প্রমাণ করে ছেড়েছেন। এবং পর্যবেক্ষণ করে কী পেয়েছেন সেইটেই লেখা রয়েছে ওই দু'খানি নিবন্ধে। কিন্তু এখানে বসে সদ্য নোবেল জয়ী একটি কাজকে কীভাবে আত্মস্থ করে অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখবে প্রভা?

অ্যাবস্ট্রাক্ট লেখা সহজ কাজ নয়। ব্যাকরণসিদ্ধ সারসংক্ষেপ করলে চলবে না। সম্পূর্ণ প্রতিবেদনের ঘনীভূত নির্যাসটি থাকতে হবে তাতে। সমস্ত কাজটি আত্মস্থ না করলে, গবেষণার মূল লক্ষ্য ও পথটি চোখের সামনে না ভাসলে তা অসাধ্য। সবে এম এস সি পাশ করে আসা এক ছাত্রীর পক্ষে এ অসম্ভব জেনেই ধুরন্ধর অধ্যাপক এই পন্থা নিয়েছেন। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। অপদস্থ প্রভা নিজের স্পর্ধিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে নিজেই বিদায় নেবে। প্রফেসরের উপর কোনও দোষ পড়বে না।

প্রভার চোখ থেকে নিজের অজান্তেই এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আকুল হয়ে অস্ফুটে সে ডেকে উঠল, "মা, ও মা। কী হবে মা?" ছোটোবেলার অভ্যেস মেয়েটার। বিপন্ন বোধ করলেই মায়ের কাছে গিয়ে ঠিক ওইভাবেই ডাকত একরত্তি প্রভা।



মার্চ ১৯২০, কলকাতা

"মা, ও মা। কী হবে মা?" মেয়ের ডাক শুনে মুখ তুলে তাকালেন শান্তা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সেজবাতির আলোয় একটা এম্ব্রয়ডয়ারির কাজ করছিলেন তিনি। এইটে বড়ো শখের কাজ তাঁর। স্বামীর একখানা সাটিনের রুমালে একগাছি ফুল ফুটিয়ে তুলছিলেন মন দিয়ে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে শান্তা দেখলেন ছ'বছুরে প্রভা ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে স্লেট-পেনসিল। মেয়েকে আদর করে কাছে টেনে শান্তা বললেন, "কী হয়েছে ছুটকি? আমার ছুটকিটার বুঝি মন খারাপ?"

কোলপোঁছা ছোটো মেয়ে প্রভার ডাকনাম ছুটকিই বটে। মায়ের আদরে তার চিত্তব্যথার উপশম হয়নি। সে গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর করে বলল, "আমি যে লিখতে পারছি না কিছুতেই। সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। আর ওই শয়তান রন্তুটা আমায় খালি খ্যাপাচ্ছে— বলছে আমার হাতে নাকি গুড়গুড়ির ব্যামো আছে।" চোখে জল চলে এসেছে প্রভার। এক হাতে ধরা স্লেট-পেনসিল, অন্য হাতে চোখ মুছতে মুছতে ফোঁৎ ফোঁৎ করে সে ফের বলল, "নিজে এট্টু ভালো লিখতে পারে বলে খুব গুমোর। আমায় বলে টিকটিকির ল্যাজে পেনসিল বেঁধে ছেড়ে দিলে নাকি আমার থেকে হাজারগুণ ভালো লেখা হবে।" এইবার প্রভার চোখের জল আর বাধা মানল না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে।

মুখ লুকিয়ে শান্তা অতি কষ্টে হাসি চাপলেন। তাঁর তিনটি সন্তান। সব থেকে বড়ো নীহারেন্দু। বয়েস উনিশ। সে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই এ পড়ে। তার পরেরটিও পুত্রসন্তান। অমলেন্দু ওরফে রন্তু। বয়সে সে অনেকটাই ছোটো বড়োদাদার থেকে। তার এই আট চলছে। আর রন্তুর থেকেও দু'বছরের ছোটো হল ছুটকি অর্থাৎ প্রভা। নীহারেন্দু এখন বড়ো হয়ে গেছে, নিজের পড়াশোনা, বন্ধুবান্ধব নিয়েই সে ব্যস্ত। কিন্তু অমলেন্দু ও প্রভা, পিঠোপিঠি বলেই বোধহয়, সর্বদাই একসঙ্গে থাকে। ভাব-ভালোবাসা, খেলাধুলোর সঙ্গে খুনসুটি ও হাতাহাতিতে তাদের উৎসাহ কিছু কম নয়।

শেষেরটি যখন প্রায়শই তীব্র রূপ ধারণ করে তখন অবশ্য শান্তাকেই মিটমাটের দায়িত্ব নিতে হয়। ছেলেমেয়েকে সামলাতে সামলাতে শান্তা বিষণ্ণও হয়ে পড়েন। এই বয়েসে সব ছেলেমেয়ে ঠাকুরদা-ঠাকুমার কোলে কোলে খেলে বেড়ায়। কিন্তু তাঁর সন্তানেরা সেই ভাগ্য করে পৃথিবীতে আসেনি। নীহারেন্দু তো সম্পূর্ণ শৈশবটাই আয়া-চাকরের সঙ্গে খেলেছে। ছোটো দু'জন তাও একে অন্যের সঙ্গ পাচ্ছে, তাই খেলুক ওরা দু'জনে যত ইচ্ছা— স্নেহভরে ভাবেন শান্তা।

না, মধুসূদন চৌধুরী আর ভাঙনতলায় ফিরে যাননি কখনও। সেখান থেকেও কেউ আসেনি খোঁজ নিতে। মধুসূদন জানতেন কুসুমবালার দিক থেকে কোনও সাড়া আসবে না। কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন প্রাণকৃষ্ণ যদি একবারও আসেন। সম্ভবত স্ত্রীর ভয়ে প্রাণকৃষ্ণের দিক থেকেও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। আর এখন তো দু'জনেই দেহ রেখেছেন গত বছর।

খবর ঠিকই পেয়েছেন মধুসূদন। ভাঙনতলা থেকে কলকাতায় খবর আনার লোকের অভাব নেই। প্রথমে গিয়েছেন প্রাণকৃষ্ণ, আর তার চারমাস পরেই কুসুমবালা। ভুলোমনা স্বামীটিকে পরপারে বেশিদিন একলা রাখার সাহস হয়নি বুঝি তাঁর। তবে কথা রেখেছিলেন কুসুমবালা, মারা যাওয়ার আগে সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করে দিয়ে গেছেন।

শেষ খবরটা শুনে অত দুঃখের মধ্যেও তেতো হাসি হেসেছিলেন মধুসূদন। বাপ-মা'র স্নেহই যখন পেলেন না, সম্পত্তি দিয়ে কী-ই বা করবেন তিনি। না, সে মানুষ মধুসূদন নন। তবে পিতামাতার উপেক্ষার ব্যথা তিনি কখনওই কাউকে বুঝতে দেননি। ডাক্তারি পাশ করেছেন, ধর্ম পরিবর্তন করে বিবাহ করেছেন, সংসারে মন দিয়েছেন। আজ মধুসূদন কলকাতা শহরের একজন ব্যস্ততম ডাক্তার। দায়িত্বশীল স্বামী, স্নেহশীল পিতা। তবে তাঁর হৃদয়বেদনা যদি কেউ বুঝতে পেরে থাকে সে তাঁর অর্ধাঙ্গিনী, শান্তাদেবী।

শান্তা স্বামীর কষ্ট বোঝেন। বুঝে এসেছেন এতকাল ধরেই। তবে শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে দোষ তিনি দেননি। দোষ যদি কাউকে দিয়েই থাকেন, তা নিজের ভাগ্যকে। মধুসূদন যেমন ডাক্তারির চাপ আর ব্রাহ্ম-সমাজের নানা দায়িত্বভার সামলেছেন দক্ষ হাতে, শান্তাও নীরবে সংসার-সন্তানের সকল ঝক্কি তুলে নিয়েছেন নিজের ঘাড়ে। ব্যস্ত মধুসূদনের সঙ্গ বিশেষ পায়নি ছেলেমেয়েগুলো কচি বয়স থেকে। তাই তাদের সকল আনন্দ-আবদারের আশ্রয় তাদের সর্বংসহা মা। আজও তাই প্রভা ক্ষুণ্ণমনে এসে দাঁড়িয়েছে মায়ের কাছে।

মেয়ের কথা শুনে মুহূর্তেই সবটা বুঝে নিয়েছেন শান্তা। রন্তু পড়ে স্কুলের নিচু ক্লাসে। প্রভাকে স্কুলে পাঠানো হয়নি এখনও। মায়ের কাছেই পড়ে সে। রন্তুও বাড়িতে পড়াশোনা করার সময় মায়ের কাছে বসে পড়ে। দু'জনকেই নীতিমালা থেকে ধরে ধরে লিখতে বলে অন্যঘরে এসে বসে সেলাই করছিলেন শান্তা— তার মধ্যেই ঝগড়া বাধিয়েছে দুইজনে মিলে।

ব্যাপার হল রন্তুর হাতের লেখাটা এর মধ্যেই রীতিমতো ভালো হয়ে উঠেছে। আর প্রভার হাতের লেখা যে বেশ বাজে শুধু নয়, অক্ষরগুলো সে বসায় ত্যাড়াব্যাঁকা, এ ওর ঘাড়ে উঠে যায় তারা সবসময়েই। গন্ডগোল হয়ে যায় 'ক'-'ব'-'র'-তে, আঁকড়ি আর ফুটকির মিলমিশ হয়ে যায় খামোখাই। রন্তু বরাবরের মতো আজও সেইটে নিয়ে খেপিয়েছে বোনকে। শুধু তাইই নয়, 'গুড়গুড়ি ব্যামো' নামে একখানা ভয়ানক ব্যারামের ভয় দেখিয়েছে এবং টিকটিকির ল্যাজসম্পর্কিত উপমাটিও জুতমতো প্রয়োগ করেছে। এবং ওই টিকটিকির ব্যাপারটাই দেখা যাচ্ছে প্রভার মনে লেগেছে সবথেকে বেশি।

প্রভার নিজেও জানে তার হাতের লেখা খারাপ। তার অক্ষর সব বেপথু হয়ে যায় লিখতে গেলে। নিজে সে অনেক চেষ্টা করেছে মন দিয়ে, মায়ের কথা শুনে। কিন্তু কাজ হয়নি। শান্তা নিজের মেয়েকে চেনেন। মেয়ে তাঁর মনোযোগী ও মেধাবী। খুবই মেধাবী। শান্ত পড়া দিলে বুঝে ফেলে রপ্ত করতে তার একেবারেই দেরি হয় না। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে ফেঁসে বসেছে সে। শান্তা নিজে অত্যন্ত ভক্তিমতী মহিলা। সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরের উপর তাঁর বিশ্বাস অটল। যে-কোনও বিপদে যে-কোনও বিপন্নতায় তিনি সেই নিঃসীম নির্গুণ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। মনে জোর পান, মনে হয় হৃদয়ের কোনও গহিন কুঠুরি থেকে কেউ বলে দিচ্ছে সামনের রাস্তার হদিস।

একবার মনে হল মেয়েকেও ঈশ্বরের কথা বলেন, বলেন প্রার্থনা করতে। হয়তো মনে জোর পাবে, হয়তো আত্মবিশ্বাস পাবে ফিরে। কিন্তু এই একরত্তি মেয়ে, সেই অসীম অনন্ত অস্তিত্বের কথা শান্তা কেমন করে বোঝাবেন একে? কিন্তু মেয়েকে তো একটা পথের সন্ধান দিতে হবে। শুধু মকশো করে হবে না, প্রভার আসল সমস্যা লুকিয়ে মনে। সংশয়ে, ভয়ে, অনিশ্চয়তায়, বিপন্নতায়। শান্তার নিজের কাছে এর সমাধান একটিই— ঈশ্বরের প্রার্থনা। কিন্তু এই অবুঝ জেদি মেয়েটাকে নিয়ে কী করবেন তিনি?

খানিকক্ষণ ভেবে তিনি প্রভাকে বললেন, “চল, ওসব স্লেট-পেনসিল রাখ, আমার সঙ্গে চল।” মেয়ের হাত ধরে তিনি নিয়ে এসেছেন দোতলা বাড়ির প্রশস্ত ছাদে। চৈত্রের মেঘমুক্ত আকাশে ফুটে রয়েছে অসংখ্য তারা। আকাশের দিকে আঙুল তুলে শান্তা মেয়েকে বললেন, “ওই দ্যাখ, কিছু দেখতে পাচ্ছিস?” প্রভা ঝটিতি উত্তর দিল, “হ্যাঁ, তারা। অনেক তারা, এক থালা সুপারি।” খিলখিল করে হেসে উঠেছে দুষ্টু মেয়ে। হেসে উঠেছেন শান্তাও। হাসতে হাসতেই বললেন, “ধুর, মেয়ে, আমার আঙুলের দিকে তাকিয়ে বল। কী দেখাচ্ছি তোকে?”

প্রভা মন দিয়ে দেখে বলল, “ওটা তো কালপুরুষ। আমি জানি। তুমিই তো বলেছ।” মায়ের কাছে নক্ষত্র-পরিচয় হয়েছে প্রভার। সন্ধ্যাবেলা তাকে ছাদে নিয়ে এসে শান্তা যত্ন করে চিনিয়েছেন কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবতারা, লুব্ধক। মেয়েটার কেন কে জানে, তারাদের প্রতি একটা অদ্ভুত টান রয়েছে। শুধু যে চট করে সব শিখে নিয়েছে তা নয়, কেমন এক মুগ্ধ বিস্ময়ের ফাঁদে পড়ে গেছে।

শান্তা জানেন, তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সন্ধ্যায় প্রভা মাঝেমধ্যেই চলে আসে ফাঁকা ছাদে। মাথা তুলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে— যেখানে এক ঝুড়ি শিউলিফুলের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অসীম অনন্ত নক্ষত্ররাজি। প্রভা তাকিয়েই থাকে আর তাকিয়েই থাকে। ঝিম ধরে যায়, ঘাড়ে ব্যথা। কিন্তু মোহগ্রস্তের মতোই অনড় থাকে প্রভা— যেন তার হুঁশ নেই কোনও, অস্তিত্বের চেতনাটুকুও লোপ পেয়েছে।

কখনও খুঁজতে খুঁজতে মেয়েকে পাচ্ছেন না শান্তা— হঠাৎ খেয়াল পড়েছে ছাদে একবার দেখার কথা। উঠে এসে দেখেন ছাদের ঠিক মাঝখানে নিশ্চুপ নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রভা। মাথা হেলে রয়েছে পিছনে, চোখ নিবদ্ধ দূর আকাশের দিকে। একরত্তি মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে তার ক্ষুদ্র দেহখানি এই পৃথিবীতে থাকলেও তার চেতনাটি যেন এই গ্রহ ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে দূরে ওই আকাশে, ওই উজ্জ্বল তারাদের মাঝে।

“এই ছুটকি, দুষ্টু মেয়ে, অন্ধকারে একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছিস। ঠান্ডা লেগে যাবে যে, হিম পড়ছে খেয়াল নেই?” মায়ের হাঁকে প্রভার সংবিৎ ফেরে। “অন্ধকারে কী করছিলি ভূতের মতো?” শান্তা জানতে চান। প্রভা মৃদু হেসে মাথা নাড়ে, মুখে কিছু বলে না। কী-ই বা বলবে, সে নিজেই কি জানে ছাই?

ছোটো মেয়ে প্রভা। কেমন করে সে বলবে মাকে— এই নির্জন অন্ধকারে তারাভরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কেমন লাগে? তার খালি মনে হয়, তার পা ছাদের চুনসুরকি ছুঁয়ে থাকলেও তার মাথা যেন বাড়তে বাড়তে ঠেকে গিয়েছে ওই আকাশে। নাকি তারাভরা আকাশটাই নেমে এসেছে তার চোখের একেবারে সামনে? কে জানে? যেটাই হোক না কেন, প্রভা তখন আর নিজের মধ্যে থাকে না।

ওই তারাগুলো, তাদের ঘিরে থাকে অদ্ভুত আলো, চালচিত্রের বিরাট কালো আকাশ— প্রভার চোখে ঘোর লাগিয়ে দেয়। প্রভা আর প্রভা নেই তখন যেন— একটা তারা হয়ে পৌঁছে গেছে ওদের মধ্যেই। সে এক মনকেমন করা— ভালো লাগা— নিজেকে হারিয়ে ফেলার আশ্চর্য অনুভূতি। এইটা গুছিয়ে বলে মাকে বোঝাবে, বালিকার শব্দভাণ্ডারে এত শব্দ নেই। তাই প্রভা চুপই থাকে।

মায়ের মন সবই বোঝে। শান্তা অন্তত এইটুকু বুঝেছেন, তাঁর মেয়ে তারাদের সঙ্গে নিজের একটা বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছে। প্রভা মুখে বলে উঠতে না পারলেও শান্তা যেন আবছা অনুভব করেন সেই বন্ধুত্বের স্বরূপটি। এই সখ্য আসলে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবের আদিম সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি, লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন মানুষ প্রথমবারের জন্য চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল— তার চোখে যে বিমুগ্ধ জিজ্ঞাসার ছায়া পড়েছিল, শান্তা জানেন, প্রভার উজ্জ্বল দু'টি চোখের মণিতে সেই ছায়া ঘর বেঁধেছে। শান্তার নিজের মনে হয় এই সখ্য, এই মুগ্ধতা-বিস্ময়, এই জিজ্ঞাসা যেন আসলে স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক, অসীম অখণ্ড চিদানন্দস্বরূপ সেই ব্রহ্মপুরুষের কাছে মানবহৃদয়ের চিরকালের নিবেদন।

শান্তা জানেন প্রভাকে দিক্‌নির্দেশ করতে হবে ওই তারাদের সাহায্যেই। তাই তিনি তাকে আজ ছাদে নিয়ে এসেছেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে তিনি বলেন, “ছুটকি, বল তো, ওই কালপুরুষ কেন এমন? এরকম ধনুক, তলোয়ার দিয়ে কে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল?” তা তো জানে না প্রভা, নিরুত্তরে সে জিজ্ঞাসুভাবেই চাইল মায়ের দিকে। শান্তা মেয়ের মাথার চুল আলতো নেড়ে দিয়ে বললেন, “ঈশ্বর ওকে ওভাবেই তৈরি করেছেন।”

"ঈশ্বর? যার প্রার্থনা আমরা সবাই একসঙ্গে করি?" প্রভা ঈশ্বরকে দেখেনি বটে, কিন্তু জানে তিনি একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তারা পাঁচজন প্রতিদিন সকালে বাড়িতে আর রোববার দিন অতি অবশ্যই সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বিশাল হলঘরে প্রার্থনা করে তাঁরই উদ্দেশে। শান্তা মাথা নেড়েছেন, "হ্যাঁ, কিন্তু ঈশ্বর যেমন-তেমনভাবে তৈরি করেননি এই তারাদের। তার মধ্যে মজা রয়েছে।"

এইবার প্রভার সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে মায়ের কথার দিকে। সে ভারী উৎসুক হয়ে উঠে শান্তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, "কী মজা?" শান্তা উত্তর দিলেন, "দেখ মা, এইটে জানবি— ঈশ্বর সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর সে-সৃষ্টিতে কোনও বিশৃঙ্খলা, কোনও বেনিয়ম নেই। ওই দেখ কালপুরুষের মাথায় জ্বলছে মৃগশিরা নক্ষত্র। আবার কোমরে ওই যে তিনটে তারা— উষা, অনিরুদ্ধ, চিত্রলেখা, ওরা দেখ কেমন একসারিতে বসে আছে। লক্ষকোটি তারার মধ্যে ওরা এমন সুন্দরভাবে পাশাপাশি এল কী করে? মাথায় মৃগশিরা, দুই কাঁধের আদ্রা তারা— কার্তিক তারা, কোমরের ওই তিনটে, পায়ের কাছে ওই লুব্ধক তারা, দেখতে পাচ্ছিস?" মায়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রভা ঘাড় কাত করে, দেখতে পাচ্ছে সে।

শান্তা বলে চলেন, "এই, ঠিক এই ক'খানি তারাকে কেমন সুন্দরভাবে, এমন সুন্দর ছন্দে সাজিয়েছেন তো তিনিই। তিনিই তৈরি করেছেন ওই শিকারিপুরুষ। সেই একেশ্বর। ওই যে আরও দূরে অসংখ্য ফুটকির মতো তারা দেখতে পাচ্ছিস, মনে হচ্ছে ওগুলো এমনিই যেমন-তেমন ছড়িয়ে আছে আকাশে, তাই না? কিন্তু তা নয়। ওগুলো যদি কাছে থাকত তবে দেখতে পেতিস–– ওরাও কেমন নিয়ম মেনে, রকম মেনে ঠিক যে যেখানে থাকার কথা, তেমনটিই রয়েছে।" শান্তা শ্বাস নিলেন একটু থেমে। প্রভা পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। মায়ের কথা সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারছে না, কিন্তু তবুও কী যেন একটা অজানা ইঙ্গিতের স্পর্শ এসে লাগছে তার মস্তিষ্কে— মনে।

শান্তা আবার বললেন, "এই দুনিয়ায় কোথাও বেনিয়মে বেচাল কিছু হয় না। সেই পরমপুরুষ সমস্তকিছুর মধ্যে একটা নিয়মশৃঙ্খলা লুকিয়ে রেখেছেন, শুধু সেইটে বুঝে নিতে হবে। আকাশের ওইখানে তো আর সত্যিই কোনও শিকারি নেই দাঁড়িয়ে— কিন্তু ঈশ্বর তারাগুলিকে ওইভাবে রেখেছেন যাতে আমরা দেখে নিতে পারি কালপুরুষকে। মহাবিশ্বের সবখানে এইরকম সূত্র ছড়ানো আছে তাঁর কৃপায়। প্রকৃতি, মানুষ, এমনকি অক্ষরেও।" প্রভার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এইবার, সে যেন ধরতে পেরেছে শান্তার কথার সূত্র।

“তাই, সত্যি?” মেয়ের প্রশ্নে মৃদু হাসলেন শান্তা। “হ্যাঁ, সত্যি। ঈশ্বরকৃপা পেতে গেলে তাঁকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বুঝতে হবে। তাঁরই তৈরি করা ছাঁচ চিনে নিতে হবে সর্বত্র। ওই যে অক্ষর, তাও সাজানোর নিয়ম তিনিই তৈরি করে রেখেছেন। সেইটে চিনে নিতে হবে, মনের মধ্যে সাজাতে হবে সেইরকম করেই। তারপর দেখবি তোর হাতের পেনসিলে উঠে আসছে পরিপাটি হাতের লেখা। শুধু নিজের ভিতরদিকে তাকাতে হবে— বাইরে নয়, যেখানে আমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু নিজেই রয়েছেন সর্বদা।”

শান্তার কণ্ঠে এক অজানা অচেনা আবেগ ঝরে পড়ছে। প্রভাও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে মায়ের কথা। মা তার সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু প্রভার মনে হচ্ছে আসলে মা যেন উচ্চারণ করছে রবিবারের প্রার্থনাসংগীত। প্রভা আবার তাকাল আকাশের দিকে, তবে এখন তার হাতে ধরা রয়েছে মায়ের নরম হাত।

দূরের, বহুদূরের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রভা চোখ বন্ধ করল এবার। দুই চোখের মাঝে নিঃসীম অন্ধকারে একে একে ফুটে উঠছে সে অসংখ্য ছোটো ছোটো আলোকবিন্দু। ক্রমে অবিন্যস্ত ছড়ানো-ছিটোনো সেই ফুটকিগুলো সুবিন্যস্ত সজ্জায় তৈরি করতে থাকে কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, বাসুকী, কন্যা। নিজের ভিতরে তাকাচ্ছে প্রভা, বিশৃঙ্খলায় উঠে আসছে নিয়মের সুস্পষ্ট পরিচয়। বাংলা অক্ষরগুলোর সজ্জা ক্রমে অর্থবহ হয়ে ফুটে উঠছে তার কাছে। প্রভা চোখ বুজেই ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে নক্ষত্রমালার অক্ষরে অথবা অক্ষরের নক্ষত্রমালায়। শান্তা কি কিছু বুঝেছেন? কে জানে? তিনি শুধু মনে মনে একেশ্বরের উদ্দেশে একটি নমস্কার জানিয়ে মেয়ের হাতটি শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন।



ডিসেম্বর ১৯৩৬, কলকাতা

অন্যমনস্কভাবে মাকে ডেকে ফেলতেই প্রভার মনে পড়ে গেল মায়েরই শেখানো কথা। দুনিয়ায় সমস্তকিছুরই নিয়ম আছে, আছে একটা সুশৃঙ্খল বিন্যাস। শান্তা মেয়েকে শিখিয়েছিলেন, এই সুবিন্যাস, এই আপাত অর্থহীনতার অন্তর্নিহিত অর্থ— সকলই সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছা। তাঁরই কৃপায় এই মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে সুবিশাল পর্বত— সকল বস্তুর মধ্যেই একটি সুনির্দিষ্ট অর্থপূর্ণতা রয়েছে।

বহু বছর কেটে গেছে। প্রভা বড়ো হয়েছে। অনেকটাই এগিয়েছে বিজ্ঞানশিক্ষার পথে। ছোটোবেলায় মায়ের কাছ থেকে পাওয়া ঈশ্বরভক্তিটুকু ক্ষীণ হয়ে এসেছে তার মনে। তবে মায়ের বিশ্বাসের সারটুকু রয়ে গেছে মেয়ের নিজস্ব পথান্বেষণের পাথেয় হিসেবে। এখন প্রভা আর ঈশ্বরপুরুষের অস্তিত্বে তেমন বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু সে মানে এই বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্রই একটি অলঙ্ঘ্য নিয়মের সজ্জায় সজ্জিত রয়েছে সকল পদার্থ, সময়, স্থান, ঘটনা।

প্রভা জানে 'এনট্রপি'-র কথা। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির উপাদান সমূহের নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খলার মানক এই 'এনট্রপি'। কিন্তু এই বিরাট বিশৃঙ্খলাও একসময় কোথাও গিয়ে একটি বিরাটতর শৃঙ্খলিত সজ্জার অংশই হয়ে ওঠে। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের বিশাল মানচিত্রে সবকিছুই এক পরম সজ্জায় সজ্জিত। প্রকৃতির সেই সজ্জাটি খুঁজে পাওয়াই

চেতনাসম্পন্ন মানুষের, একজন বিজ্ঞানীর চূড়ান্ত লক্ষ্য।

প্রভা বড়ো করে একটা শ্বাস নেয়। এই যে সামনে রাখা নিবন্ধ দু'খানিতে কালো কালো অক্ষর, তারা একটি নির্দিষ্ট সজ্জায় সজ্জিত হয়ে পাঠককে কিছু বলতে চাইছে। একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা, একটি সযত্নে গড়ে তোলা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কথা এবং সর্বোপরি সেই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা একটি সিদ্ধান্তের কথা। কী সেই সিদ্ধান্ত? একটি নতুন কণা— 'পজিট্রন'-এর উপস্থিতির ঘোষণা।

প্রভা চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্তের জন্য। বিরাটাকার তারায় তারায় যে নকশা রয়েছে প্রকৃতির নিজের হাতে তৈরি করা, সেই একই নকশার ছাপ রয়েছে আণুবীক্ষণিক কণাসমূহে। সেই তারাদের থেকে, তাদের প্রজ্বলিত বিভা থেকে চতুর্দিকে বিকিরিত হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মির প্রবাহ। তার মধ্যেও রয়েছে কণাদের সংসার। প্রভার বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে মহাকাশের মানচিত্র। একটি একটি তারা, তারামণ্ডল সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। যেন দেখতে পাচ্ছে তারাদের জ্বলা নেভা, প্রত্যক্ষ করছে বিকিরিত মহাজাগতিক রশ্মির যাত্রা— লক্ষ আলোকবর্ষের দূরত্ব অতিক্রম করে যাচ্ছে তারা মহাশূন্যের বুক চিরে।

প্রভা থর থর করে কাঁপছে। আনন্দে, উত্তেজনায়। ওই তো সেই রশ্মিরা ছায়াপথ পেরিয়ে এসে ঢুকছে তার এই শ্যামল গ্রহখানিতে, ছড়িয়ে যাচ্ছে মহাদেশে, মহাসাগরে, তুষারধবল মেরুপ্রদেশে। একগুচ্ছ রশ্মি এসে ঢুকেছে ওই যে প্রফেসর অ্যান্ডারসনের ল্যাবরেটরিতে, পথ খুঁজে অথবা পথ ভুলে ঢুকে পড়ছে সাবধানে যত্নে রাখা ক্লাউড চেম্বার যন্ত্রখানির গর্ভে। প্রভার মনে পড়ে গেছে সুরেন্দ্রমোহনের সে-দিনের লেকচারটি। অধ্যাপক নিপুণভাবে বোঝাচ্ছিলেন ক্লাউডচেম্বারের কার্যপ্রণালী। কোন পথে কণাবাহী রশ্মিরা প্রবেশ করে, কেমন করে সে-সব মৌল কণারা এইবার পা রাখল তাদের অন্তিম যাত্রাপথে। এই যাত্রাপথের চিহ্ন ধরা থাকছে যন্ত্রের মধ্যেকার সিসার পাতের উপরে।

আড়াই হাজার বছর আগে আকাশের নক্ষত্রমালার বিভা বিজয়সিংহের রণপোতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সিংহলে, এই অসংখ্য নক্ষত্ররাজির একটিকে দেখেই দৈবাদিষ্ট তিন জ্ঞানী খুঁজে পেয়েছিলেন বেথলেহেমের সেই সরাইখানাটির পাশের একটি আস্তাবলের সন্ধান। মহাকাশের তারারা মানুষকে পথ দেখিয়েছে, জন্ম দিয়েছে বিস্ময়ের। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বিস্ময় ক্রমে জিজ্ঞাসা জাগিয়েছে

মানুষের মনে।

পাটলিপুত্রের রাতের আকাশের নক্ষত্ররাজি তরুণ শিক্ষার্থী আর্য্যভট্টের মনে যে জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিল, সেই একই জিজ্ঞাসা বহু শতক পেরিয়ে জেগে উঠেছিল পিসা শহরের বালক গ্যালিলেওর মনে। সেই জিজ্ঞাসাটিই মানুষকে বিজ্ঞানপথের সন্ধান দিয়েছে, মহাবিশ্বের মহান বিশালত্বের স্পর্শ দিয়েছে। সেই জিজ্ঞাসাস্পৃষ্ট হয়েই অ্যান্ডারসনের এই পরীক্ষা। সেই জিজ্ঞাসার অমোঘ মন্ত্রে চালিত হয়েই প্রভার আজ সুরেন্দ্রমোহনের কাছে আসা।

প্রভা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে নিজেকে। বিশাল বিপুল নক্ষত্রমণ্ডলীর গহন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে মানবনির্মিত সামান্য কয়েকফুটের একটি যন্ত্রে। ওই অসীম অবোধ্য নক্ষত্রমণ্ডলী ফের একবার সংকেত পাঠিয়েছে মানুষের কাছে। নক্ষত্রজাতক ওই মহাজাগতিক রশ্মিরা মহাবিশ্বের গূঢ়তম সত্যটি বহন করে নিয়ে এসেছে এই মার্কিন বিজ্ঞানী কার্ল ডেভিড অ্যান্ডারসনের কাছে।

কী এক আবেশে বশীভূত হয়ে প্রভা মোহগ্রস্তের মতোই জার্নাল দুটোর পাতা উল্টে নিবন্ধ দু'খানি পড়ে আবার। তারপর আর-একবার, তারপরেও আরও একবার। এবারে সব পরিষ্কার। অসহ্য উত্তেজনায় প্রায় ছিটকে উঠে দাঁড়ায় প্রভা। একটু আগেও যে কালো অক্ষরের সারি প্রায় অবোধ্য ছিল, তা এবার অংশ হয়ে উঠছে এক বৃহত্তর অর্থপূর্ণতার। প্রভা মনে মনে মাকে একবার ধন্যবাদ দিয়ে একটা পাতা টেনে নিয়ে খসখস করে লিখতে থাকে।

* * *

সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। সন্ধ্যাটা বেশ গাঢ় হয়ে নেমেছে এবার। অমিয় অনেকক্ষণ ধরেই উশখুশ করছে। চায়ের দোকানে বসে ছিল, কিন্তু কাঁহাতক একটার পর একটা চা খাওয়া যায়? চার-পাঁচ কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে। সঙ্গে জল আর লেড়ো বিস্কুট খেয়ে পেটটাও ঢাক হয়ে এসেছে। একদিক থেকে ভালো, রাতে খাওয়ার ঝামেলা রইল না। বাড়িতে ফিরে রোজ রোজ খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করতে তার ভালো লাগে না। একটুখানি বিষণ্ণ হয় অমিয়। অথচ বছর-দুয়েক আগেও এমন অবস্থা ছিল না। আর-পাঁচটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার যেমন করে থাকে কলকাতায়, তেমনিই ছিল তারা। বাবা, মা, একটি ছোটো বোন আর সে। চার জনে মিলে ক্রিক রো-র দুই

কামরার বাসায় সুখে-দুঃখে ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু ভাগ্য তাদের সহায় ছিল না।

গত বিশ বছর ধরে যে বিলিতি সওদাগরি অফিসটায় অমিয়র বাবা যতীশরঞ্জন কেরানির চাকরি করতেন, দু'বছর আগে সেই অফিসটাই উঠে গেছে বিনা নোটিশে। তারপরে বহুদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও যতীশরঞ্জন কোনও চাকরির সন্ধান পাননি। অবশ্য পঞ্চান্ন বছর বয়সি প্রৌঢ়কে এই দুর্মূল্যের বাজারে কে-ই বা নতুন করে চাকরি দেবে? তখন বেশ কিছুদিন সংসারের হাঁড়ির হাল বেহাল হয়েছিল। নেহাত বাড়িওয়ালা অনেকদিনের পরিচিত মানুষ তাই ঘর ছাড়তে হয়নি। কিন্তু রোজকার খরচ চালানোও দায় হয়ে ওঠে। তখনিই কলেজের পড়া ছেড়ে দেয় অমিয়। তা নিয়ে ঝামেলাও হয়েছিল বিস্তর। ঠিক ফাইনাল পরীক্ষার আগে গ্র্যাজুয়েশনের পড়া ছেড়ে দিতে ছেলেকে অনেকবার বারণ করেছিলেন যতীশরঞ্জন। কিন্তু অমিয় কথা শোনেনি।

অমিয়র পাশে তখন এসে দাঁড়িয়েছিল প্রভা। দু'জনে তারা সহপাঠী। সিটি কলেজে একই বছরে ভর্তি হয়েছে তারা। প্রভা পড়ে ফিজিক্স, অমিয়র বিষয় কেমিস্ট্রি। দু'জনে একসঙ্গে করত অঙ্কের ক্লাস। তবে দু'জনের যে বন্ধুত্ব হয়েছে আদৌ, এবং সেটা এতদিন টিকেও গেছে— এটা ভারী একটা আশ্চর্যেরই ব্যাপার। দু'জনের স্বভাব বিলকুল উল্টো। প্রভা স্বল্পবাক্, গম্ভীর, নির্জনতাপ্রিয়। অন্যদিকে অমিয় বাক্‌পটু, প্রগলভ ও মিশুকে।

ইন্ট্রেগ্রাল ক্যালকুলাসের একটা ক্লাসনোটের খাতা দরকার ছিল অমিয়র টেস্ট পরীক্ষার আগে। কিন্তু পরীক্ষার আগে কেউ-ই তা দিতে রাজি নয়। অধ্যাপক তপন বসাক কড়া লোক। তাঁর পরীক্ষায় ফেল করলে পুরো বছর বাক্যবাণ সহ্য করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। সকলের কাছে চেয়েচিন্তে হতাশ হয়ে শেষে অমিয়র মনে পড়ে প্রভার কথা। যে মেয়ে ক্লাসে কারও সঙ্গে কথাই বলে না— অন্য কোনওদিকে তাকানোর ফুরসুত নেই, সর্বদাই বইখাতায় মুখ গুঁজে রয়েছে— তার থেকে সাহায্য পাওয়ার বিশেষ আশা নেই যদিও।

"বলছি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? একটু সাহায্য দরকার ছিল।" অধ্যাপক আসেননি ক্লাসরুমে তখনও। প্রভা মন দিয়ে একটা আঁক কষার চেষ্টা করছিল একেবারে সামনের বেঞ্চে বসে। পাশ থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনে মুখ ঘুরিয়ে দেখে অমিয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু, ডিবেট ক্লাবের নেতা, ছাত্রদলের সর্দার অমিয়র কী সাহায্য দরকার তার থেকে? বেশ অবাক হয়েই প্রভা জিজ্ঞাসা করেছিল, "বলুন, কী দরকার?" অপ্রতিভভাবে নিজের দরকারটা বলেই ফেলে

অমিয়। কিন্তু তাকে অবাক করে প্রভা ঘাড় নেড়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই।

“নিশ্চয়ই। আপনি নিতে পারেন আপনার লাগলে। আমার ওই পার্টটা তৈরি করা হয়ে গেছে।”

“আমার কিন্তু দু’-একদিন লাগবে। কপি করতে, বুঝতে। আমি কিন্তু আপনার মতো ভালো স্টুডেন্ট নই।” অমিয়র মুখে একটা ফিচেল হাসি।

“যতদিন দরকার রাখতে পারেন। আমার এখনই লাগছে না।” অমিয়র ফিচলেমিতে কান দেয়নি প্রভা।

অমিয় রেখেছিল খাতাটা দু’-একদিন। যখন খাতাখানি তুলে দিচ্ছে সে প্রভার হাতে, তার মুখে আর ফিচলেমির চিহ্নমাত্র নেই, বরং একটা শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতার ভাব। প্রভার খাতাখানি উল্টেপাল্টে সে বুঝে গেছে, এ মেয়ে প্রকৃতার্থেই জিনিয়াস। তপন বসাকের ক্লাস কলেজে বিখ্যাত ‘দুর্বোধ্য’ বলে। ভদ্রলোক ইউনিভার্সিটির সিলেবাসের মধ্যে নিজেকে আটকে পারেন না, প্রায়শই এদিক-ওদিক চলে যান। এক-একখানা অঙ্ক গুচ্ছের স্টেপজাম্প করে কষেন ব্ল্যাকবোর্ডে। আবার ক্লাসের পরীক্ষায় সিলেবাস বহির্ভূত জিনিসগুলোর প্রতিই অধ্যাপকের বিশেষ টান লক্ষ করা যায়।

খাতাটা নিয়ে কপি করার সময় অমিয় অবাক হয়ে দেখেছে প্রফেসরের দুর্বোধ্য ক্লাস যেন জলভাত হয়ে ফুটে উঠেছে তার চোখের সামনে। প্রতিটা অঙ্ক, প্রতিটা থিওরি অত্যন্ত সহজ সুচারুভাবে মুক্তোর মতো হাতের লেখায় ঝকঝক করছে বালিকাগজের খাতার বুকে। অমিয় স্তব্ধ হয়ে ভেবেছে তপন বসাকের জায়গায় প্রভা চৌধুরীকে অঙ্ক পড়াতে বসিয়ে দিলে স্টুডেন্টদের উপকার হত অনেক বেশি। খাতাটা ফেরত দেওয়ার সময় সে তাই না বলে পারল না, “আপনি সত্যিই আমার অনেক উপকার করলেন। আর আপনার অপরিসীম মেধার কথাটা আর উল্লেখ করলাম না— নিজের অপদার্থতায় ফের লজ্জা পেয়ে যাব।” এইবার সেই ফিচেল হাসিটা আবার ফিরেছে অমিয়র মুখে।

লজ্জা পেয়েছে কিন্তু প্রভাই। লাল হয়ে উঠে সে বলে, “এমন করে বলার কী সত্যিই দরকার রয়েছে?” অমিয় বোঝে মেয়েটাকে সে বিব্রত করে তুলছে। কথা ঘোরানোর জন্য সে তড়িঘড়ি বলে, “তবে আমার কিন্তু সব থেকে ভালো লেগেছে আপনার হাতের লেখা। এরকম হাতের লেখা পড়াটাও একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।” এবার আর লজ্জা পেল না প্রভা। বরং এইবার তার মুখেই ফুটে উঠেছে একখানি তৃপ্তির হাসি। সহজভাবেই সে বলল, “আমার ছোটোবেলার হাতের লেখা যদি দেখতেন, তা

হলে হয়তো এ কথা বলতেন না। অপাঠ্য ছিল সে-লেখা।"

"আমার কিন্তু সে-কথা বিশ্বাস হয় না। আপনি বিনয় করছেন।" অমিয়র চোখে অবিশ্বাস। "না, সত্যিই, তবে তারপরে আমি প্যাটার্নটা খোঁজার চেষ্টা করতে শুরু করি। আর লেখাটাও চলনসই হয়ে ওঠে— এই আর-কি!" "প্যাটার্ন?" অমিয় বুঝে উঠতে পারল না কিছু। প্রভার মুখে একটি গূঢ় হাসি, "সে অনেক কথা।" "হোক না, আপাতত নেক্সট দু'খানা ক্লাসও অফ। আমারও সময়ের অভাব নেই।" অমিয়র কথা শুনে প্রভা কী যেন ভাবে। খানিক ভেবেটেবে বলে, "বেশ।"

অনেক পরে প্রভা ভেবে দেখেছিল সে-দিনকার কথাবার্তার ধরন তার নিজের স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই সাযুজ্যপূর্ণ নয়। প্রভা আত্মমগ্ন প্রকৃতির মেয়ে, সহপাঠীদের সঙ্গে মিশে যাওয়া তার ধাতে নেই। কিন্তু সে-দিন কেন কে জানে সে স্বভাববিরুদ্ধভাবে অমিয়কে অনেক কথা বলে ফেলেছিল নিজে থেকেই। হয়তো ছেলেটার আপাতচঞ্চল সপ্রতিভ বহিরঙ্গের ভিতরে একখানি সরল নিষ্পাপ মনখানির সন্ধান পেয়েছিল সে। অথবা হয়তো শুধুই বন্ধুত্বের প্রতি একটা টান ছিল প্রভার। কারণ যা-ই হোক না কেন, প্রভা আর অমিয়র সখ্য ক্রমশই গাঢ়তর হয়েছে সে-দিনের পর থেকে।

পড়া ছেড়ে দেওয়ার সময় যখন সহপাঠী-পরিবার-গোটা দুনিয়ার সঙ্গেই একরকম লড়তে হচ্ছিল অমিয়কে, সে দিশাহারা হয়ে পড়েছে ক্রমে। বাবা যতীশরঞ্জনের বহুদিনের স্বপ্ন ছিল ছেলে পড়াশোনা করে বড়ো হবে, বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে। চাকরি চলে গেলেও সংসার ও ছেলের পড়াশোনার ধাক্কা সামলাতে তিনি কাবুলিওয়ালার কাছে ধার করতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু গোঁয়ার অমিয় কারও কোনও কোথায় শোনেনি। তীব্র ক্ষোভে যতীশরঞ্জন ছেলের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছিলেন।

বন্ধুর মুখে তার সিদ্ধান্তের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিল প্রভা। তারপর একটিই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি অন্য কোনও কারণে পড়া ছাড়ছ না তো? তা যদি হয় তা হলে সত্যিই কিছু বলার নেই।" অমিয় প্রভার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। প্রভার উষ্মার কারণ রয়েছে। ইদানীং যে কলেজের পড়ায় অমিয়র খুব মন রয়েছে, এমনটা নয়। হালে সে তার সময়ের পুরোটাই প্রায় দিয়ে দিচ্ছিল রাজনীতিতে। কমিউনিস্ট রাজনীতি। শহরের তরুণরা এখন সাম্যবাদের স্বপ্নে বিভোর হতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। অহিংসা ও আলোচনার রাজনীতিতে তারা বীতশ্রদ্ধ, আবার আগের প্রজন্মের মতো বিচ্ছিন্ন গুলি-বোমার রাজনীতি থেকেও তারা দূরে সরে আসছে।

এই দ্বিধার সময়ে নতুন পথের দিশারি হয়ে এসেছে সমাজের সার্বিক মুক্তির ডাক। কৃষক শ্রমিকের আন্দোলনের স্বপ্ন। জাতে এই মতবাদ বিদেশি, তাই বয়স্ক প্রজন্মে বিশেষ সাড়া ফেলতে পারেনি। কিন্তু তারুণ্যের স্বপ্নালু আর অবুঝ চোখে নতুন এই পথ ও মতের আবেদন ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সে-হাতছানি এড়িয়ে যেতে পারেনি অমিয়ও। প্রথমে খুব বেশি সংযোগ না থাকলেও ধীরে ধীরে সে পার্টির কাজকর্মে ক্রমশই জড়িয়ে পড়েছে আরও বেশি করে। মাঝে মাঝে কলেজের ক্লাস, বাড়ি-পরিবার ফেলে বেশ কয়েকবার চলে গিয়েছে চন্দননগরের গোপন প্রাদেশিক সম্মেলনে, কখনও বা বসিরহাটের কৃষক জমায়েতে গিয়ে কাটিয়ে আসছে দু'-তিন রাত।

রাজনীতিতে প্রভার উৎসাহ নেই। সে বিষয়টি বোঝেও না তত ভালো করে। কিন্তু এটা সে জানে— ব্রিটিশ সরকার পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বছর-দেড়েক আগেই। পার্টির সঙ্গে কোনওরকম সংস্রব বিপদ বহন করে আনতে দেরি করবে না তাই মোটেই। ব্রিটিশের পুলিশের নজর রয়েছে পার্টির ছেলেদের, নেতাদের উপরে।

এসব খবর মধুসূদনের কথাবার্তা থেকে জেনেছে প্রভা। কলকাতা পুলিশের ডিসি নর্থ আর ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী মধুসূদনের বাঁধা রোগী একরকম। তাঁদের মুখেই মধুসূদন শুনেছেন এ মুহূর্তে পুলিশের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কমিউনিস্ট পার্টির ছেলেরা। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের উদ্যম এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। সেই আন্দোলনের অনেকেই কালাপানির সাজা কেটে এসে ভিড়েছেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। ঘরোয়া কথাবার্তায় মধুসূদন বাড়িতে সে-সব বলেও ফেলেছেন দু'-একবার। প্রভা শুনেছে, আর দুশ্চিন্তায় ভুগেছে অমিয়র কথা ভেবে।

যাক, অমিয় তবে ওসবের চক্করে পড়াশোনা ছাড়ছে না। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় প্রভা। অমিয়র সিদ্ধান্তটা অবশ্যই খুশি করেনি প্রভাকে, কিন্তু সে এও জানে— এ গোঁয়ার কারও কথা শুনবে না। সে যেটা করতে পারল, সেটাই করেছে। অমিয়র একখানি চাকরির বন্দোবস্ত করেছে কোনওক্রমে।

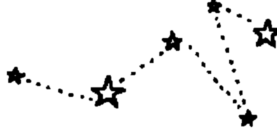
প্রভার বাল্যসখী নিরঞ্জনার বাবা ইউনিভার্সিটিতে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক। তিনি অমিয়কে ল্যাবরেটরিতে অশিক্ষক কর্মচারীর একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন। অমিয় অবশ্য চেয়েছিল দূরে গ্রামের দিকে কোনও মিডল স্কুলে একটা চাকরি জুটিয়ে চলে যেতে, প্রভা তাকে বকে-ধমকে নিরস্ত করেছে। "সংসারের কিছুটা সুরাহা হলে আবার পরীক্ষা দেবে, ব্যস— আর কিছু আমি শুনতে চাই না," প্রভার সাফ কথা ছিল।

সেই থেকে অমিয় এই চাকরিটাই করছে। বছরখানেক কেটে গেছে। সংসারে কিছু স্বচ্ছলতাও ফিরেছে। যতীশরঞ্জনও কোনওমতে একটা খাতা লেখার চাকরি জুটিয়েছেন বড়োবাজারের এক মাড়োয়ারির গদিতে। অমিয়ও তার বেতনের প্রায় পুরোটাই এনে মায়ের হাতে তুলে দেয় প্রতি মাসে। কিছুটা সুরাহা হলেও যতীশরঞ্জন এখনও ক্ষমা করেননি ছেলেকে, পিতাপুত্রের সম্পর্ক স্বচ্ছন্দও হয়নি আর। বাড়িতে তাই যথাসম্ভব কম থাকতে-খেতেই পছন্দ করে অমিয়। আজ অবশ্য প্রভা তাকে জানিয়েছিল সে ইউনিভার্সিটিতে আসবে। দেখা করবে বলে এই এতক্ষণের অপেক্ষা।

প্রভার সঙ্গে এখন দেখা-সাক্ষাৎ কমে গেছে অমিয়র। বেশ কিছুদিন হল প্রভা পাশ করে বেরিয়ে গিয়েছে ইউনিভার্সিটি থেকে। সিঁথির দিকের একটা গার্লস স্কুলে চাকরি নিয়েছে পড়ানোর। কিন্তু অমিয় জানে, প্রভার মন অস্থির, গবেষণা না করে একটা স্কুলে বাচ্চাদের দিদিমণি হয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অমিয় নিজেও বোঝে গবেষণা ছাড়া প্রভা বাঁচবে না— মেয়েটা যেন তৈরিই হয়েছে বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘর করার জন্য। অবশ্য ইউনিভার্সিটিতেও অমিয় বিশেষ দেখা করত না। ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে ল্যাব-অ্যাটেন্ডেন্টের মেলামেশা অধ্যাপকেরা ভালো চোখে দেখেন না।

কিন্তু মেয়েটা বেরোয় না কেন? সুরেন্দ্রমোহন প্রাক্তন ছাত্রীকে পেয়ে লেকচার ঝাড়ছেন নাকি? নাকি উল্টোটাই? প্রভাই নিজের পদার্থবিদ্যাপ্রেমের কথা বলতে বলতে আর থামতে পারছে না? সেটা যে অসম্ভব নয়— তা অমিয় নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানে। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই অমিয় দেখল ইউনিভার্সিটির গেট দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে প্রভার ছোট্টখাট্টো অবয়বটি।

একরকম ছুটেই অমিয় গিয়ে দাঁড়াল প্রভার সামনে। গ্যাসলাইট জ্বলে উঠেছে গেটের ধারে। সেই আলোছায়াতেও স্পষ্ট বোঝা যায় প্রভার মুখ অন্ধকার। মুখে কিছু বলেনি অমিয়, কিন্তু তার সমস্ত মুখে ফুটে ওঠা প্রশ্নের ছাপ চোখ এড়ায়নি প্রভার। এক মুহূর্তের জন্য অমিয়র চোখের দিকে চোখ রেখেই মুখ নামিয়ে নিল প্রভা। সুরেন্দ্রমোহনের থেকে কোনও উত্তর পায়নি সে। অধ্যাপক শুধু হাতের নির্দেশে তাকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন।



জানুয়ারি ১৯৩৮, কলকাতা

জানুয়ারি মাস। ঠান্ডা খুব যে পড়েছে তা নয়, তবু ইলেক্ট্রিক পাখা চালানোর দরকার একেবারেই নেই। অথচ ঘরের ছাতে লাগানো পাখাটা ঘুরছে বনবন করে। এবং ঘুরছে ফুলস্পিডে। পাখার ঠিক তলায় বসে রয়েছে প্রভা। তাপমাত্রা কিছু না হলেও ১৭-১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঘুরন্ত পাখার তলায় বসেও প্রভা ঘামছে দরদর করে। সাজগোজ প্রভা বিশেষ করে না— তার কোনও আগ্রহ নেই ওতে। কিন্তু আজ সে একটু পাউডার বুলিয়ে, চোখের তলায় সামান্য কাজল ছুঁইয়ে এসেছে। কারণও আছে তার। কিছুক্ষণ পরেই প্রভাকে একটা লেকচার দিতে হবে নিজের গবেষণার কাজের উপরে।

গত একবছর ধরে প্রভা গবেষণা করছে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে। মহাজাগতিক রশ্মির বৈশিষ্ট্য-সন্ধানে, নতুন নতুন কণাদের খোঁজ এখন আর শুধুই ক্লাউড চেম্বারে হচ্ছে না। তার পাশাপাশি ব্যবহৃত হচ্ছে ফোটোগ্রাফিক প্লেট। ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ক্লাউড চেম্বারের মতো বাষ্প ধরে রাখার ঝামেলা নেই, যেখানে খুশি নিয়ে যাও— যেমন খুশি সেট করে বসাও। রাতে ক্লাউড চেম্বার বন্ধ থাকলে সে-সময়কার রশ্মিপ্রবাহের নিরীক্ষণ হয় না। এখানে সে-সমস্যাও নেই, চব্বিশ ঘণ্টা রশ্মিগুচ্ছ বুকের কণাদের নিয়ে আছড়ে পড়বে প্লেটের উপর। চলার পথে ওই প্লেটে আপনা থেকেই ছাপ রেখে যাবে নিজের সঞ্চারপথের। তবে বাষ্পের মেঘ তৈরি হয় না এখানে।

রশ্মিকণার আঘাতে প্লেটের উপরিতলের যে সিলভার আয়োডাইডের প্রলেপ থাকে তা বিয়োজিত হয়ে মৌলিক সিলভার বা রুপো তৈরি হয়। সেই রুপালি চিহ্নরেখাতেই কণাগুলিকে চিনে নেওয়া হয় এখানে।

এই নতুন পন্থাটি সুরেন্দ্রমোহন গত বছরের ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে জেনে এসেছেন। তাঁর বেশ মনেও ধরেছে ব্যাপারটা। কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মির সম্পূর্ণ অভিঘাত পেতে গেলে ফোটোগ্রাফিক প্লেটগুলোকে নিয়ে যেতে হবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা উঁচুতে। পশ্চিমে এই কাজটা শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। কখনও বিজ্ঞানীরা বেলুনে করে প্লেটগুলো নিয়ে যান ভূমিপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা উঁচুতে, কখনও বা রেখে আসতে হয় কোনও পাহাড়ের উপরে কোথাও। কলকাতায় বেলুন ওড়ানোর সুবিধা নেই। পাহাড়ের উপরেই রাখতে হবে ফোটোগ্রাফিক প্লেট।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। আগে দেখে নিতে হবে ফোটোগ্রাফিক প্লেটে কণাদের চলন সত্যিই ঠিকঠাক ধরা পড়ছে কি না। সেই পরীক্ষার জন্য চেনাজানা তেজস্ক্রিয় পদার্থ দরকার হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে বিয়োজিত হয়ে শক্তিধর কণার জন্ম দেয়। সেই কণার চলন ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা পড়ে কি না, পড়লে কেমনভাবে পড়ে— সে-সব নিয়েই গত একবছর ধরে গবেষণা করে চলেছে প্রভা। কাজ দাঁড়িয়ে গেছে কিছুটা। একটা গোটা নিবন্ধ লিখে ফেলাই যায়। লিখে ফেলেওছে প্রভা। কিন্তু এখন সেই বিষয়েই আগে লেকচার দিতে হবে আজ।

এমনি সাধারণ কোনও লেকচার হলে প্রভা এমন ঘাবড়াত না। কিন্তু আজ আবার হাজির হয়েছেন কেমব্রিজ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক। এঁরা একদা সুরেন্দ্রমোহনের সহকর্মী ছিলেন ইউরোপে। সুরেন্দ্রমোহন তাঁদের নিয়ে এসেছেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণার ব্যবস্থাপনা দেখতে। হ্যাঁ, সুরেন্দ্রমোহন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছেন। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু মারা গিয়েছেন গত বছর। কলকাতাতে সুরেন্দ্রমোহনই যোগ্যতম ব্যক্তি এখন আচার্যের প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অধ্যাপক রাজিও হয়ে চলে এসেছেন আপার সার্কুলার রোডের এই বাড়িতে— ল্যাবরেটরি ও গবেষক ছাত্রছাত্রী সমেত। প্রভাও এসেছে তাই। এখন এখানেই তার রিসার্চের কাজ হয়।

কিন্তু এই বিশ্ববিশ্রুত দুই অধ্যাপকের সামনে আজ তাকে লেকচার দিতে হবে এটাই যথেষ্ট টেনশনের। কিন্তু সেটাও আসল সমস্যা নয়, লেকচারের জন্য গত বেশ কয়েকদিন ধরেই সে প্রস্তুতি নিয়েছে। আর নিজের কাজটাও তার হৃদয়ঙ্গম হয়েই

আছে। কিন্তু সর্বনাশ হল, প্রভা নিজের নোটবুকটা খুঁজে পাচ্ছে না। ওতেই সমস্ত তথ্য, পরীক্ষাগুলির সমস্ত গাণিতিক মান লেখা রয়েছে।

আরও মুশকিল, ওই নোটবুকেই প্রভা লিখে রেখেছিল তার লেকচারের মূল পয়েন্টগুলো। একটার পর একটা। কী কী আসবে কীসের পরে, একঘণ্টার লেকচার— কতক্ষণ কীসের কীসের উপর বলবে— পুরো প্ল্যানটা অত্যন্ত যত্ন করে বানিয়েছিল প্রভা। নিজের টেবিলের দেরাজে রেখে গিয়েছিল নোটবুক। আজ সকালে এসে দেখেছে দেরাজ ফাঁকা, নোটবুক নেই।

তারপর থেকেই প্রভার মাথার ঠিক নেই। সুরেন্দ্রমোহন তাকে গবেষণার সুযোগ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তার নিজেকেও যে দায়িত্ব নিয়ে প্রমাণ করতে হবে নিজের যোগ্যতা। শুধু এই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যে নয়, গোটা বিজ্ঞান জগতের সামনে। আজ সেই বিজ্ঞান জগতের প্রতিভূ হয়ে উপস্থিত হয়েছেন দু'জন প্রাজ্ঞ অধ্যাপক। তাঁদের সামনে কি প্রভা ব্যর্থ হবে নিজের কাজ তুলে ধরতে? তাতে কি সুরেন্দ্রমোহনের প্রাথমিক সংশয়ই সত্য হবে না? মেয়েদের দ্বারা গবেষণা হয় না— প্রভা কি সেই ধারণা বরাবরের মতো সত্য করে তুলবে এই ব্যর্থতা দিয়ে? প্রভা ঘামছে দরদর করে, কিন্তু তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে ভয়ে।

ভয়। হ্যাঁ, ভয়ই পেয়েছে প্রভা। যুক্তিবুদ্ধির শৃঙ্খলটি ক্রমে বিলুপ্ত হচ্ছে তার মাথা থেকে। হাত দুটো এমন কাঁপছে কেন? সভয়ে নিজের হাতের দিকে তাকায় প্রভা। আজ আর কোনও বৃহত্তর সুসমঞ্জস সজ্জার সন্ধান তাকে সাহায্য করছে না। নিজের স্নায়ুর উপর থেকে ক্রমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে সে। কী হবে? কী হবে তার?

ঘরের অন্যদিকের একটি টেবিলে বসে কাজ করছিল একটি ছেলে। প্রভার দিকে আড়চোখে তাকিয়েই সে মুখ নামিয়ে নিল। প্রভা যদি খেয়াল করত, দেখত ছেলেটির মুখে ফুটে উঠেছে একটি নিষ্ঠুর হাসি।



ডিসেম্বর ১৯৩৬, কলকাতা

প্রভা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ নিজের চেয়ারে চুপ করে বসেছিলেন সুরেন্দ্রমোহন। ভাবছিলেন। এ অসম্ভব কী করে সম্ভব করল ওই একফোঁটা মেয়েটা? তিনি সুরেন্দ্রমোহন বোস। বর্তমান ভারতের সর্বাগ্রগণ্য পদার্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম— তাঁকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছে তেইশ বছরের প্রভা চৌধুরী, যার কিনা এম এস সি পাশ করার পর পুরো বছরও ঘোরেনি? কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না বিশ্রুত অধ্যাপক।

তবে মেনে নিতে না চাইলেও মেনে তাঁকে নিতে হচ্ছেই। যতবার সাদা কাগজের উপর প্রভার অসম্ভব সুন্দর হাতের লেখায় গাঁথা অ্যাবস্ট্রাক্টের দিকে সুরেন্দ্রমোহন দেখছেন, তাঁর বিস্ময় আরও বেড়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ নতুন রিসার্চ। পরীক্ষার যন্ত্রটিতেও কখনও হাতে কলমে কাজ করেনি প্রভা— একবার বোধহয় সুরেন্দ্রমোহন ওদের ব্যাচের ছেলেমেয়েদের দেখিয়েছিলেন সামান্য। ব্যস, ওটুকুই। আর তাতেই কিনা অ্যান্ডারসনের দু'খানা জব্বর পেপারের সার বুঝে সে-দুটোকে একত্রে একটা সংক্ষিপ্ত অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে ধরে ফেলেছে প্রভা। সেটাও আবার তিরিশ মিনিটের মধ্যেই।

মুখের মধ্যে একটা তেতো স্বাদ টের পাচ্ছিলেন সুরেন্দ্রমোহন। জয়নাথ থাকলে বলতেন, 'টেস্ট অফ ডিফিট। তোর মুখের ওই তিতকুটে স্বাদ আসলে তোর

পরাজয়ের সুরেন। তুই হেরে গেছিস ব্রাদার। আমরা এতগুলো বুড়ো মিলে যা করতে পারিনি এতদিন ধরে, এই কচি মেয়েটা সেটা আধা ঘণ্টায় করে দেখিয়েছে। তোকে হারিয়ে দিয়েছে। তোর অন্ধবিশ্বাসের গোড়া ধরে নাড়িয়ে দিয়েছে। ওই অ্যাবস্ট্রাক্টের দিকে তাকিয়ে দেখ। একটা মেয়ে লিখে দিয়ে গেছে ওটা। যে-মেয়ে হাতেকলমে কোনওদিন রিসার্চ করেনি শুধুমাত্র অপরিসীম মেধার জোরে নোবেল প্রাইজের কাজ আত্মস্থ করে নিয়েছে আধ ঘণ্টায়। তারপর সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় নিজের মতো করে অসামান্য একখানা অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখে দিয়েছে তোর সামনে। তুই কি এখনও বলবি মেয়েরা গবেষণা করার যোগ্যতা রাখে না?'

অধৈর্যভাবে হাত নেড়ে সুরেন্দ্রমোহন কাল্পনিক জয়নাথকে চুপ করালেন। তবে কাল্পনিক হলেও হতভাগা ঠিকই বলেছে। প্রভার লেখাটা প্রথমবার পড়েই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী। হাতে কাগজখানা নিয়ে ধপ করে বসে পড়েছেন নিজের চেয়ারে। প্রভা ওদিকে তাকিয়ে রয়েছে আগ্রহভরে। প্রফেসরের পরীক্ষায় সে কি উতরোতে পেরেছে? সুরেন্দ্রমোহন কোনও উত্তর দিচ্ছেন না দেখে শেষ পর্যন্ত সে অধৈর্যস্বরে জিজ্ঞাসা করেছে, "স্যার, লেখাটা ঠিক হয়েছে? ভুল নেই তো?" ছাত্রীর আকুল প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেননি অধ্যাপক, কেবল হাত নেড়ে দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন প্রভাকে। প্রভা গম্ভীর মাস্টারমশাইকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি, নীরবে বেরিয়ে গেছে ঘর ছেড়ে।

তখন তাঁর কাছে কোনও উত্তর ছিল না। কিন্তু এতক্ষণ চিন্তা করার পরে তিনি উত্তর পেয়েছেন একটা। সামান্য ঝুঁকে একটা দেরাজ খুলে তিনি বার করলেন ক্যালকাটা টেলিফোন ডাইরেক্টরিখানা। তারপর মন দিয়ে খুঁজতে লাগলেন মধুসূদন চৌধুরীর নম্বরটা।

* * *

"মনোজ, এই মেয়েটির নাম প্রভা। এ এখন থেকে আমাদের ল্যাবে কাজ করবে। ওকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ো একটু।" সংক্ষেপে কথা শেষ করে সুরেন্দ্রমোহন ল্যাবরেটরি ছেড়ে চলে গেলেন। প্রভা মনোজ নামের ছেলেটির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একা। মনোজ তার সিনিয়র। দু'বছর আগে পাশ করেছে। ল্যাবের পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময় দু'-একবার দেখেওছে ছেলেটিকে। দোহারা চেহারায় বিশেষ কোনও বিশেষত্ব

নেই। তবে প্রভার কেন জানি না মনে হল ছেলেটির চোখে একটা চোরা নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে রয়েছে। এর উপরেই পড়েছে প্রভাকে কাজ শেখানোর ভার? প্রভার একটা অস্বস্তি হতে শুরু করেছে।

মনোজ খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে প্রভার দিকে। এই দুবলা-পাতলা মেয়েটাকে স্যার নিয়ে এসেছেন কাজ শেখার জন্য? সুরেন্দ্রমোহন বোস একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছেন গবেষণার কাজ করাতে? সুরেন্দ্রমোহন বোস? প্রফেসরের কি ভীমরতি হয়েছে? মেয়েদের দিয়ে কাজ করা অসম্ভব। সেটা প্রফেসরের থেকে বেশি আর কে জানে? আর মনোজও সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। কিন্তু এ কী করেছেন স্যার? এ কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে। গোদের উপর বিষফোঁড়া—একে আবার কাজ শেখাতে হবে তাকেই। কিন্তু স্যারের হুকুমের উপর কিছু বলা যায় না, মনোজের পিএইচ ডি-খানি সম্পূর্ণই সুরেন্দ্রমোহনের উপর নির্ভর কিনা। বিরসমুখে মনোজ প্রভার আপাদমস্তক আর-একবার দেখে নিয়ে বিরক্তভাবে বলল, “চলো, ল্যাবটা ঘুরিয়ে দেখাই আগে।”

* * *

সে-দিন সুরেন্দ্রমোহনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে প্রভা একরকম নিশ্চিতই ছিল যে তার লেখাটা অধ্যাপকের পছন্দ হয়নি। কিন্তু কেন? সে নিজে তো জানে সে কী লিখেছে। তবুও কেন? অমিয়র সঙ্গে রাজাবাজারের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে সেই প্রশ্নটাই উচ্ছ্বকিত স্বরে করে ফেলেছিল। “কেন? কেন হবে এরকম। আমি ঠিকঠাকই লিখে এসেছি ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট। তবুও স্যার এমন কেন করলেন?” শেষ কথাটা অবশ্য সে অমিয়র দিকে ফিরেই করেছে উত্তেজনার বশে। নিজের অজান্তে শক্ত মুঠোয় ধরেও ফেলেছে অমিয়র একটা হাত।

প্রভার হাতের ছোঁয়ায় অমিয় সামান্য কেঁপে উঠল। শীতে নয়, অন্য কোনও কারণে। কারণটা প্রভাকে বলা হয়নি তার এখনও। বোকা মেয়েটা সমস্তক্ষণ ফিজিক্স আর গবেষণার স্বপ্নে মত্ত থাকে। অমিয় খুব ভালো করেই জানে প্রভা চৌধুরীর মস্তিষ্কের খোপে খোপে শুধুই তারাদের সংসার, বিজ্ঞানের ঘরবসত। সামান্য অমিয় সরকারের হৃদয়বৃত্তির খোঁজ সে রাখবে কেমন করে? অমিয় তা আশাও করে না। তবু অমিয় ভাবে, একদিন সে ঠিক বলবে প্রভাকে কারণটা। কী কারণে প্রভাকে দেখলে

তার গলা শুকিয়ে যায়, বুকের ভিতরটা খালি খালি লাগে হঠাৎ করেই, পেটের মধ্যে শুরু হয় গুড়গুড়ানি। একদিন সে ঠিক বলেই দেবে। কিন্তু এখন প্রভার এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সে?

একটা গভীর শ্বাস নিয়ে অমিয় বলে, "এটাই তো আমাদের সিস্টেমের দোষ। সামন্ততান্ত্রিক গুরুকুলের ব্যবস্থা ঢুকে গেছে সমাজের সমস্ত জায়গায়। ইউনিভার্সিটির রিসার্চও তার থেকে মুক্তি পায়নি। তোমার কাজ যত ভালোই হোক না কেন, তার মূল্যায়ন করবেন একজন সর্বশক্তিমান গুরুমশায়। তিনিই ছাত্রদের হর্তাকর্তা-বিধাতা। যেমন আমাদের সকলের হর্তাকর্তা-বিধাতা পুঁজির পুতুল এই ব্রিটিশ সরকার। সমাজবদল না হলে এসব কোনও কিছুরই বদল হবে না। তাই বলি কমরেড, বৃথা এ তোমার খেদ।" কথাগুলো বলে অমিয় মিটিমিটি দেখছে প্রভাকে। এরকম ভাষণমার্কা কথাবার্তা শুনলে প্রভা বেদম চটে যায়, অমিয় ভালোমতোই জানে। বিষয় পাল্টে মেয়েটাকে একটু হালকা মেজাজে ফিরিয়ে আনতে এটাই তার ঠিক রাস্তা বলে মনে হল।

অমিয়র বুদ্ধিতে কাজ হয়েছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে প্রভা। চলতে চলতে দাঁড়িয়েও গেছে রাস্তায়। কোমরে হাত দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে অমিয়র দিকে। প্রভার এই ভঙ্গিটা দেখে অমিয় আর-একবার পেটের মধ্যে সেই গুড়গুড় ব্যাপারটা অনুভব করল। প্রভা ওদিকে বেশ রেগেই বলছে, "তোমাকে বলেছি না, এসব পলিটিক্সে আমার কোনও আগ্রহ নেই। এসব আমায় বলবে না তুমি।" অমিয় নিরুত্তরেই চেয়ে রয়েছে প্রভার দিকে। শুধু তার চোখের তারায় ঝিলিক দিচ্ছে দুষ্টুমি। প্রভা সে-দিকে খেয়াল করেছে কি না কে জানে, তবে তার গলায় এখন রাগ নেই আর— বরং অনুযোগের সুরটা স্পষ্ট। "তুমিও আর কোরো না এসব। খুব বিপজ্জনক, জানোই তো তুমি। আর আমারও টেনশন হয় তোমাকে নিয়ে খুব।"

প্রভার টেনশন হয় তার বিপদ-আশঙ্কায়? অমিয়র গলাটা আবার শুকিয়ে যাচ্ছে, বুকটা ফের খালি খালি। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলে, "আচ্ছা আচ্ছা, এখন লড়াই ঝগড়ায় কাজ নেই। আপাতত চলো ভবানীবাবুর দোকানের লড়াইয়ের চপ খাওয়া যাক। দেরি করলে শেষ হয়ে যাবে।" মানিকতলার ভবানীচরণ মিত্তিরের দোকানের লড়াইয়ের চপ দু'জনেরই খুব প্রিয়। অমিয় আর প্রভা হাঁটতে থাকে মানিকতলার দিকে, পাশাপাশি। প্রভার হাতে আর অমিয়র হাত ধরা নেই বটে, কিন্তু পাশাপাশি চলতে থাকা দু'জনের হাতের মধ্যে দূরত্বও খুব বেশি নয়।



এপ্রিল ১৯৩৭, কলকাতা

মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে মনোজ। এই মাত্র দশ মিনিট আগে যা ঘটে গেছে সেটা সে এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। আজ দুই বছরের বেশি সময় ধরে সে কাজ করছে সুরেন্দ্রমোহনের কাছে। মনোজ খুব ভালো করেই জানে ছাত্রমহলে সুরেন্দ্রমোহনের বিশেষ জনপ্রিয়তা নেই। বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কাজ করতে ঢোকেই না তাঁর কাছে। যে দু'-একজন পথ ভুলে চলে আসে তারাও অধ্যাপকের তাড়নায় দু'-একদিনেই ল্যাবরেটরি ছেড়ে চলে যায়।

কিন্তু মনোজ অন্য ধাতুতে গড়া। তার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিশেষ না থাকলেও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে পুরোমাত্রায়। মনোজ জানে, প্রফেসর বোসের বিদেশে প্রচুর চেনাজানা। টিকে থেকে কোনওমতে পিএইচ ডি-খানা বাগিয়ে একবার যদি সেই যোগাযোগে ইউরোপ বা আমেরিকার কোনও নামকরা বিজ্ঞানীর কাছে কাজের সুযোগ পাওয়া যায় তা হলেই কেল্লাফতে।

নিজের সামর্থ্যের অভাব মনোজ ঢেকে দিতে চেয়েছে আনুগত্য আর গাধার খাটনি দিয়ে। সুরেন্দ্রমোহনকে খুশি করার কোনও সুযোগই সে ছাড়ে না। প্রতি রবিবার শিয়ালদার বাজারে অধ্যাপকের পিছনে পিছনে থলে হাতে মনোজকে নাকি দেখা যায় মালবাহক হিসেবে— এমনটা ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ স্টুডেন্টদের মধ্যে চালু

রয়েছে কথা। সে-কথায় সত্য থাকুক বা না-থাকুক— সুরেন্দ্রমোহনের কাছে এতদিন ধরে দাঁতে দাঁত চিপে পড়ে থাকাটা সহজ কাজ নয়, এটা সকলেই মানে। এই কঠিন কাজটা চোখ-কান বুজে মনোজ করে গেছে, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ভেবে।

কিন্তু আজ সে অনাগত ভবিষ্যতের ঔজ্জ্বল্য ফিকে হয়ে গেছে অনেকটাই। আজ মনোজ ও প্রভাকে একসঙ্গে ডেকে অধ্যাপক জানিয়ে দিয়েছেন, এখন থেকে কসমিক রে, মানে মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণার ভার থাকবে প্রভার উপর। মনোজ যেন এতদিনে ল্যাবরেটরিতে যা কাজকর্ম হয়েছে সে-সব প্রভাকে বুঝিয়ে দেয়। আর মনোজ কাজ করবে ক্রিস্ট্যাল ফিজিক্স নিয়ে। অধ্যাপকের কথা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি মনোজ। সুরেন্দ্রমোহন পছন্দ করেন না জেনেও তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করেছে সে, “আমার কাজ প্রভাকে বুঝিয়ে দেব? দুই বছরের পুরো কাজ?”

সুরেন্দ্রমোহন অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টিতে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকেছেন ছাত্রের দিকে। হিমশীতল সে-চাউনি দেখে প্রভার কণ্ঠতালু শুকিয়ে গিয়েছে। মনোজের অবস্থা অবর্ণনীয়। খুব আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে সুরেন্দ্রমোহন বলেছেন, “এ ল্যাবরেটরিটা তোমার নয় মনোজ, আমার। ওই কাজটাও তোমার নয়। আমার নিজের ভেবে বের করা কাজ আমি তোমাকে করতে দিয়েছি মাত্র। তুমি সে-কাজ ঠিক করে করতে অসমর্থ হয়েছ, তাই ফিরিয়ে নিচ্ছি। যাও, যা বললাম মনে রেখো।” দ্বিতীয়বার বলতে হয়নি। মনোজ ও প্রভা, দু’জনেই যত দ্রুত সম্ভব হয়, ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

নিজের কাজের জায়গায় এসে মনোজ সেই যে একখানা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়েছে, আর ওঠার নাম করেনি। দু’হাতে মাথা চেপে বসেই রয়েছে। তার মনের ভিতরে ঠিক কী চলছে তা একেবারেই কহতব্য নয়। কসমিক রে-র কাজখানা তার থেকে নিয়ে নিচ্ছেন স্যার? দুই বচ্ছর সে খেটেছে এর পিছনে প্রাণপাত করে। সকাল আটটায় এসে হাজির হয়েছে ল্যাবরেটরিতে। রাত দশটার সময় বেরিয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই, কত দিন বাড়ি ফেরা হয়নি রাত্রিবেলা এক্সপেরিমেন্ট চালানোর চক্করে। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, তার কাজে সাফল্য আসেনি সুরেন্দ্রমোহনের আশানুরূপ। কিন্তু সে সাফল্য আর ক’টা-ই বা গবেষক পায় এত তাড়াতাড়ি।

এই মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার কাজে সম্ভাবনা প্রচুর। কিছুদিন আগেই নোবেল প্রাইজ এসেছে এই কাজেই। দুনিয়াভরের তাবড়ো বিজ্ঞানী সব আবার নতুন

করে যেন উপলব্ধি করেছেন এই কাজের গুরুত্ব। এই গবেষণায় সুতরাং উন্নতি নিশ্চিত। ভবিষ্যতের সেই স্বর্গের সিঁড়িটি যেন সুরেন্দ্রমোহন কেড়ে নিলেন অনুগত ছাত্রের কাছ থেকে।

তার উপরে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, কাজটা চলে যাচ্ছে প্রভার কাছে। মাত্র তিনমাস হল যে গবেষণার জীবনে পা রেখেছে— তার কাছে। একটা মেয়ের কাছে। হজম হচ্ছে না। এই পরাজয় মেনে নিতে পারছে না মনোজ। বিদ্বেষের ঘন মেঘ ক্রমে ঘনিয়ে উঠতে থাকে মনোজের মনের মধ্যে।

* * *

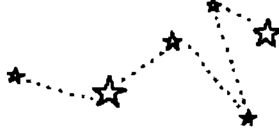
প্রভাও নিজের জায়গায় এসে বসে রয়েছে জড়োসড়ো হয়ে। তার একটু একটু খারাপ লাগছে মনোজের জন্য। আবার কোথাও যেন একটু স্বস্তিবোধও রয়েছে। মনোজের শেখানোয় অনিচ্ছার ভাবটি প্রকট ছিল বড্ড বেশি। একটা তাচ্ছিল্য, একটা চাপা বিদ্বেষ, একটা অনুচ্চারিত রোষ যেন প্রভা অনুভব করত সিনিয়রটির কথাবার্তায়। তবু তার মধ্যেই সে প্রাণপণে সব শিখতে চেষ্টা করেছে। সুরেন্দ্রমোহন যখন আগের সপ্তাহে তাকে ডেকে কাজকর্মের ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে-ও জবাব দিয়েছিল নিজে যতটুকু শিখতে পেরেছে— ততটুকুই।

অধ্যাপকের মুখ দেখে কিছু বোঝা যায়নি। কিন্তু আজ প্রভা বুঝতে পারছে সে-দিন স্যার তার উপর খুশিই হয়েছিলেন মনে মনে। কিন্তু এখন তার ভয় করছে। তিন মাস আগে বাড়িতে ঢুকে যখন জানতে পেরেছিল সুরেন্দ্রমোহন ফোন করেছিলেন, বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন— ঠিক এমনই একটা ভয় তার সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। পরে অবশ্য সে-ভয় দূর হয়। মধুসূদন মেয়েকে সুসংবাদটি দিয়েছিলেন নিজের মুখেই। সুরেন্দ্রমোহন প্রভাকে গবেষণার কাজে নিতে রাজি হয়েছেন।

ভয় দূর হয়ে তার জায়গা নিচ্ছিল আনন্দ, তৃপ্তি। সেই খুশির অনুভবেই ভর করে এই তিনটে মাস অতি-উৎসাহে কাজ শিখেছে প্রভা। কিন্তু এখন আবার সেই ভয়টা ফিরে আসছে। দু'বছর এই কাজটা করেছে মনোজ। অধ্যাপকের অনেক আশা এই কাজটার উপরে। হ্যাঁ, মনোজ খুব বেশি মেধাবী নয়। উদ্ভাবনী ক্ষমতাও তার সীমিত। কিন্তু কাজের অগ্রগতি মনঃপূত হয়নি বলে সুরেন্দ্রমোহন যদি মনোজের মতো বাধ্য অনুগত ছাত্রকে কাজ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন, তা হলে তো প্রভাকেও যে-

কোনওদিন...!

প্রভার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। ভয় পাচ্ছে সে। ভীষণ ভয়।



সেপ্টেম্বর ১৯৩২, কলকাতা

"ভয় করল না মেয়েটার একটুও? কী ধাতুতে গড়া এরা?" বাবাকে প্রণাম করতে ঘরে ঢুকেছিল প্রভা। মধুসূদনের স্বগতোক্তি শুনে থমকে গেল। আজ কলেজে একটা ক্লাস টেস্ট রয়েছে। প্রভার ছোটোবেলার অভ্যাস, স্কুল-কলেজের কোনও পরীক্ষা থাকলে সে বাবা-মাকে প্রণাম করে তবেই বাড়ি থেকে বেরোয়। হাসপাতালে যাওয়ার আগে এসময়টা মধুসূদন ফাঁকাই থাকেন। নিজের স্টাডিরুমে বসে সকালের খবরের কাগজটা পড়েন, সামান্য বিশ্রাম নিয়ে নেন সারাদিনের ধকলের আগে।

প্রভা দেখল বাবা যেন কেমন বিহ্বল হয়ে বসে রয়েছেন। হাতে ধরা রয়েছে সকালের কাগজ। কিন্তু সে-দিকে যেন মন নেই মধুসূদনের। চশমাটা খুলে নামিয়ে রেখেছেন পাশের টিপয়ে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ছাদের দিকে। আর অস্ফুটে নিজের মনেই বলে উঠেছেন এই কথাগুলো। প্রভা অবাক হয়ে বলে, "কী হয়েছে বাবা?" মেয়ের ডাকে যেন ঘোর ভাঙে মধুসূদনের। চমকে তাকিয়ে বলেন, "কে? প্রভা মা? কলেজ যাবি? ও কিছু না।" বলতে বলতেই তিনি চোখের কোণটা মুছে নেন হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে।

প্রভা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। মধুসূদনের চোখে জল। আজ এই উনিশটা বছর কাটিয়ে ফেলেছে প্রভা পৃথিবীর বুকে, জ্ঞানত বাবাকে সে কাঁদতে দেখেনি কখনও। মধুসূদন

চৌধুরীকে তাঁর সন্তানরা বরাবরই একজন গম্ভীর ও ধীমান পুরুষরূপেই জেনে এসেছে। ঘোর সমস্যাতেও তাঁকে কখনও বিচলিত হতে দেখেনি প্রভা। আজ তাঁর কী হল হঠাৎ?

একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বাবার পায়ের কাছে বসে পড়ে প্রভা। মধুসূদনের হাঁটুর উপর হাত রেখে ফের কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "কী হয়েছে বাবা? আমায় বলো। বলবে না?"

ছোটোমেয়েটি মধুসূদনের অত্যন্ত প্রিয়। যত বড়ো হয়েছে প্রভা, তার ক্রমবিকশিত মেধা ও প্রজ্ঞা দেখে মধুসূদন মুগ্ধ হয়েছেন। পড়াশোনার অভ্যাস কাছাকাছি এনেছে। মধুসূদন মেয়ের সঙ্গে অনেককিছু নিয়েই আলোচনা করেন এখন। পিতাপুত্রীর মধ্যের অতীতের সে দূরত্ব কমে এসেছে অনেক। মধুসূদন প্রভার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও কিছু না, তুই কোথায় যাচ্ছিস? কলেজে? তোর দেরি হয়ে যাবে। যা এখন।"

"কিছু দেরি হবে না আমার। অনেক পরে কলেজ শুরু। তোমার কী হয়েছে আগে বলো।" রাগত স্বরে বলল প্রভা। যদিও ক্লাসটেস্টের ব্যাপারটা সে চেপে গেছে বিলকুল। সে শুনলে মধুসূদন আর কিছুই বলবেন না।

মধুসূদন শূন্য দৃষ্টিতে প্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল রে। মেয়েটা এভাবে...," কথা শেষ করলেন না প্রাজ্ঞ ডাক্তার, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। হাত থেকে খসে পড়ে গেল কাগজখানা। প্রভা হতভম্ব হয়ে কাগজটা তুলে নিয়েছে। কোন খবরটা পড়ছিলেন বাবা? কাগজের মাঝখানে অনেকটা জুড়ে একটা খবর। ঠিক তার মাঝখানে একফোঁটা জলের দাগ। এই খবরটাই হবে। কিন্তু শিরোনামটা এক ঝলক দেখে প্রভা বাবার এই আকস্মিক মানসিক বিচলনের কোনও কারণই বুঝতে পারল না।

"চট্টগ্রামের ইউরোপীয় ক্লাবে তরুণ বিপ্লবীদের আক্রমণ। বাঙালি তরুণীর মৃত্যু। একাধিক ইউরোপীয় নারী-পুরুষ আহত।" ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে খবরটা পুরোটা পড়তে শুরু করে প্রভা। কিন্তু শেষ করার আগেই তার মুখ থেকে চাপা আর্তনাদ বেরোল, "প্রীতিদিদি। সে কী? এ কী সর্বনাশ!" মধুসূদন ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন একটু। প্রভার মাথায় আলতো করে হাত রেখেছেন। হাত থেকে খুব সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়েছেন কাগজটা। আর প্রভা ততক্ষণে ভেঙে পড়েছে কান্নায়। মধুসূদন ফের অস্ফুট স্বরে বলছেন, "ওই মেয়ের মধ্যে এত আগুন ছিল? এত বারুদ?"

সত্যিই তাই। কৃশাঙ্গী মুখচোরা প্রীতিলতাকে দেখে বোঝা যায়নি কখনও তার

ওই রোগাপাতলা শরীরের মধ্যে এরকম ইস্পাতকঠিন একটি মন লুকিয়ে রয়েছে। প্রভা বোঝেনি। বোঝেননি মধুসূদনও। শান্তার খুড়তুতো বোন সুষমা। ছেলেবেলা থেকেই দু'জনের সখ্য অত্যন্ত গাঢ়। তার উপর সুষমাদেবীর ছোটোমেয়ে সুজাতা প্রভার সমবয়সি। তাই তাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরি হয়নি। সুষমা স্বামীর সঙ্গে হেদুয়ার কাছে বাসা ভাড়া করে থাকেন। তাঁদের দু'টি মেয়ে। বিনীতা বড়ো, আর ছোটো ওই সুজাতা। বিনীতা অবশ্য বড়ো মাত্রই দুই বছরের প্রভা-সুজাতার থেকে। দুই বছর আগে প্রভা যখন স্কুল ফাইনাল দিয়েছে, বিনীতা আই এ পাশ করে ভর্তি হয়েছে বেথুন কলেজে।

সে-বছর আরও একজন আই এ পাশ করেছিল। তার নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। সারা বাংলায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম। ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে পঞ্চম স্থান। চট্টগ্রাম থেকে এসে বেথুন কলেজে ভর্তি হয়েছে বিনীতার ক্লাসে। বিনীতার সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছে বেশ। ছুটিছাটায় মাঝে মাঝেই বানারসী ঘোষ স্ট্রিটের হোস্টেল থেকে চলে আসে বান্ধবীর বাড়িতে। আর প্রীতিলতা এলেই বাড়িতে একটা হইহই পড়ে যায়। চমৎকার গান গায় মেয়েটি। তবে গানের চেয়েও বেশি মিঠে তার বাঁশির সুর। হাতে আড়বাঁশিটি নিয়ে রবিবারদিন সে যখন বিনীতার বাড়ি আসে, শুধু বিনীতাই নয় সুজাতা আর প্রভাও উল্লসিত হয়ে ওঠে।

বড়োরাও আসেন প্রীতিলতার বাঁশি শুনতে। সুষমা আর তাঁর স্বামী তো বটেই, মধুসূদন ও শান্তা থাকলে তাঁরাও এ সুযোগ হাতছাড়া করেন না। বাঁশি বাজাতেও পারে বটে মেয়েটা। অদ্ভুত সুরের মায়াজালে আবিষ্ট করে রাখতে পারে শ্রোতাদের। মধুসূদন একদিন সে বাঁশি শুনে আপ্লুত হয়ে বলেছিলেন, "তুমি অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে এসেছ মা। পড়াশোনা সংগীতে সমান দখল— এ ঈশ্বরকৃপা ছাড়া সম্ভব নয়।" সলজ্জে মধুসূদনের পায়ের ধুলো নিয়েছিল প্রীতিলতা। কিন্তু বেশিদিন প্রীতিলতার বাঁশি শুনতে পায়নি প্রভা। বি এ অনার্স পরীক্ষা না দিয়েই প্রীতিলতা ফিরে গেছে চট্টগ্রামে।

সেই প্রীতিলতা মারা গেছে। পাঞ্জাবি পুরুষের বেশে দলের সঙ্গীদের নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে হামলা করেছে চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাবে। ভিতরে ছিল শ্বেতাঙ্গ কিছু মিলিটারি অফিসার। তারা নিজেদের সার্ভিস রিভলভার থেকে পাল্টা গুলি চালিয়েছে। গুলি লেগেছে প্রীতিলতার দেহেও। কিন্তু সে-গুলি একুশ বছরের তাজা প্রাণ হরণ করতে পারেনি। প্রীতিলতা মরেছে বিষ খেয়ে। নিজের হাতে মুখে পুরে নিয়েছে সায়ানাইড পিল। সহ-বিপ্লবীর কাছে চেয়েছে আরও একটা পিল। যদি একটায়

কাজ না হয়? দুটো পিলে কাজ হয়েছে। প্রীতিলতা আর বেঁচে নেই। তার আড়বাঁশিতে আর বাজবে না ধলঘাটের পল্লিগীতির কনেবিদায়ের বিষণ্ণ সুর। ভারতবর্ষের বীরকন্যা বিষের নীলিমায় সেজে উঠে বিদায় নিয়েছে জগতের উৎসবমুখরিত অঙ্গন থেকে।

কাগজে বিস্তারে কিছুই লেখেনি। তার উপর তিনদিন আগের খবর এটা। খবরটা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে মধুসূদন ফোন করেছেন চট্টগ্রাম হাসপাতালে। সেখানে এখন কর্মরত রয়েছেন তাঁর এককালের সহপাঠী বিনয়কৃষ্ণ সরকার। বিনয়কৃষ্ণ বন্ধুকে বিস্তারে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। রাতের অন্ধকারে ক্লাবের ঘর থেকে একশো গজ দূরে পড়েছিল প্রীতিলতার মৃতদেহ। চট্টগ্রামের মাটি কোল দিয়েছিল তাকে, রাত্রির অন্ধকার ঢেকে রেখেছিল তার শরীর। পালাতে পারবে না আহত দেহে, সঙ্গীদের পালানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তাই মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করেছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

ধীরে ধীরে অস্ফুটে মেয়েকে বলছিলেন সব মধুসূদন। প্রভা মেঝের দু'হাতের ফাঁকে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। দশ আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরঝর করে বয়ে যাচ্ছে চোখের জল। প্রভার ভিতর থেকে একটা আর্ত চিৎকার উঠে এসে বলতে চাইছে, “প্রীতিদিদি, প্রীতিদিদি— তুমি এমন করলে কেন প্রীতিদিদি? কী করে করতে পারলে তুমি? ভয় করল না তোমার?” কিন্তু কান্নার দমকে কিছুই বলতে পারল না সে।

মধুসূদন নিজের চেয়ার থেকে নেমে হাঁটু মুড়ে বসেছেন মেয়ের সামনে। চোখ মুছিয়ে দিচ্ছেন তাঁর আদরের প্রভার। বাবার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে প্রভা। উনিশের তরুণী নয়, সে যেন আবার ক্ষুদ্র এক বালিকা হয়ে গেছে। মধুসূদনের দামি ট্যুইলের শার্ট চোখের জলে ভিজিয়ে সে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, “কেন করল প্রীতিদিদি এরকম? কী করে করল?” মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন বাবা কিন্তু তাকে কীভাবে সান্ত্বনা দেবেন তা তিনি জানেন না। নিরুত্তরেই রইলেন মধুসূদন।

হঠাৎই ছিটকে উঠেছে প্রভা। সে মেনে নিতে পারছে না। সব কিছু যদি শেষপর্যন্ত এক বিরাট সজ্জা একটা মহাবৈশ্বিক নকশার অংশই হয়— তা হলে এ ঘটনা কী করে ঘটতে পারে? বিশ্বপ্রকৃতির অংশ ওই তরতাজা একুশ বছরের প্রাণ। অংশকে নিজে থেকে ধ্বংস কী করে হতে দিতে পারে সমষ্টি? শৃঙ্খলা কি নিজেই তৈরি করতে পারে বিশৃঙ্খলা? না। কখনওই না? তা হলে প্রীতিদিদি কেমন করে নিজের প্রাণ নিতে পারল এত অনায়াসে? মধুসূদন বলেছিলেন ঈশ্বরকৃপা রয়েছে প্রীতিলতার উপরে। প্রভা নিজেও জানে বিপুল প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ লুকিয়েছিল তার প্রীতিদিদির মধ্যে।

বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টির এক মহতী অংশ সে-প্রতিভা। এত সহজে তা ধ্বংস হয়ে গেল? যুক্তিবুদ্ধি আর কাজ করছে না প্রভার।

কে জানে কেমন করে মধুসূদন বোধহয় বুঝেছেন মেয়ের মনের ভাব। বাবারা সব ব্যাপারে আদরের দুলালিদের বুঝতে পারেন বোধকরি সবটা। আনমনেই তিনি বললেন, "জানিস মা, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু সে সময় আমাদের মধ্যে দিয়েছেন নিজের কিছুটা অংশও। সে অংশ, সেই ঈশ্বরোপাদানে আমাদের অন্তর তৈরি হয়েছে। তাই আমরা যখন অন্তরের ডাকে সাড়া দিই, সে আমাদের অন্তরের ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়া। অনাদি অনন্ত সেই অখণ্ড সত্তার অংশ তো আমরা বটেই, কিন্তু আমাদের নিজসত্ত্বাটিও সেই ঐশীগুণসম্পন্ন। কখনও কখনও সেই অন্তরের আহ্বান সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের চালিত করে। সে-আহ্বান জানবি পবিত্র, শুদ্ধ— সমস্ত ভয় দ্বিধা সংকোচ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। সে আহ্বানই প্রেম। ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম।"

সে-দিন অনেক রাতে চুপিসারে ছাদে উঠে এসেছিল প্রভা। তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়েছিল চুপ করে— ছেলেবেলায় যেমন দাঁড়াত। তাকে নিজের অন্তরের আহ্বানটি খুঁজে পেতে হবে। সেই আহ্বানের পথে রয়েছে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-শঙ্কা জয় করার সন্ধান। সেই আহ্বান মহাবিশ্বের পরম সজ্জাটির বিরুদ্ধেও যেতে পারে, গড়ে তুলতে পারে নিজস্ব এক বিকল্প সজ্জা। তখন মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক বদলে যাবে আবার, নতুন সজ্জায়, নতুন নতুন সম্ভাবনায়, নতুন নতুন নক্ষত্রের আলোকে উজ্জ্বল হবে সেই নবজাত পরমশৃঙ্খলাটি। প্রভা তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করল। তার প্রীতিদিদি পেয়েছে সে সন্ধান। সে-ও ঠিক পাবে একদিন।



জানুয়ারি ১৯৩৮, কলকাতা

বুকের ভিতর যেন দুম দুম করে ঢাক পিটছে কেউ। প্রভার মনে হল, ঘরের ওপাশে বসে থাকা মনোজ শুনে ফেলতে পারে তার হৃৎপিণ্ডের শব্দ। এইবার শীত লাগছে প্রভার। উঠে সে পাখাখানা বন্ধ করে দিল। মনোজ ফিরে তাকাল একবার, কিছু বলল না। প্রভার হাতের কাঁপুনি থামেনি এখনও। ভয় তাকে অধিকার করছে ক্রমশ। প্রবল আতঙ্ক তার সমস্ত সঙ্গীসাথীদের নিয়ে হাজির প্রভার চেতনার দোরগোড়ায়।

দ্বিধা-সংশয়-বিড়ম্বনা-হতাশা-অপরাধবোধ একে একে এগিয়ে আসছে প্রভাকে দুর্বল করতে। যেমন করে সেই রাতে প্রভার প্রীতিদিদিকে ঘিরে ধরছিল তারা। মিশন ব্যর্থ হওয়ার ভয়, বেঁচে ফেরা নিয়ে সংশয়, গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থানের বেদনা, সঙ্গীদের বোঝা হয়ে ওঠার সংকোচ, অসাবধানতার জন্য নিজের উপর রাগ— ঘন কুয়াশার মতো ঘিরে ধরছিল একুশ বছরের তরুণীটিকে। প্রভা বহুবার কল্পনা করার চেষ্টা করেছে কেমন ছিল সেই ছয়বছর আগের ভয়ংকর রাতখানি? বোঝার চেষ্টা করেছে কেমন ছিল প্রীতিদিদির ভয়কে জয় করার মুহূর্তটি?

* * *

রাত্রির নিস্তব্ধতা খানখান করে দিয়েছে গুলির শব্দ। প্রীতিলতা আর তার সঙ্গীরা তাদের নয়ঘরার পিস্তল আর ওয়েবলি রিভলবার থেকে গুলি ছুড়ছে ক্লাবের দরজা ও জানালা লক্ষ্য করে। কালীকিংকর দে-র হাতের ওয়েবলি থেকে একটা গুলি নির্ভুল লক্ষ্যে ছুটে গিয়ে ধরাশায়ী করেছে ক্লাবের দরজার উপর ঝুলিয়ে রাখা বোর্ডখানি— যেটায় ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, 'কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ।'

ক্লাবের অন্যদিকে থেকে রাইফেল আর হাতবোমা নিয়ে আক্রমণ করেছে পান্না সেন আর প্রফুল্ল দাস। গুলি বোমার শব্দ, বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়া ছাপিয়ে উঠেছে ক্লাবের ভিতর থেকে আসা আর্তনাদ। ক্লাবঘরের বাতি নিভে গেছে। আর আর্তনাদের তীক্ষ্ণ শব্দের পাশাপাশি হঠাৎ করেই ক্লাবঘরের ভিতর থেকে ছুটে এসেছে একাধিক গুলি। সান্ধ্যসমাগমে আসা মিলিটারি অফিসাররা নিজেদের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি ছুড়ছে। বিপ্লবীরা এই প্রতিআক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না। কিন্তু কভার নেওয়ার আগেই একখানি গুলি এসে বিদ্ধ করেছে প্রীতিলতার শরীরের বামদিক। অস্ফুটে একটা আর্তনাদ করে প্রীতিলতা পড়ে গিয়েছে মাটিতে। সেই অবস্থাতেই গুলি ছুড়তে ছুড়তে চেঁচিয়ে উঠেছে সাথীদের উদ্দেশে— "ফল ব্যাক, রিট্রিট।"

সুশীল দে আর বীরেশ্বর রায় তাদের কম্যান্ডারকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রীতিলতার অবস্থা গুরুতর। ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে মাটি। দেশের মাটি। অভাগা মাতৃভূমির বুকের উপর দিয়েই নিজেকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে অনেকটা নিয়ে গেল প্রীতিলতা। সঙ্গীরা সব এসে জড়ো হয়েছে। প্রত্যাগমনের জন্য তৈরি। ওদিকে এতক্ষণে পুলিশ ফাঁড়ি থেকে পুলিশের দল এসে হাজির হয়েছে। জিপের আলোয় আবার ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আবরণ।

এইবার ভয় পেয়েছে প্রীতিলতা। নিজের জন্য নয়। সঙ্গীদের জন্য। সে কী করবে এখন? এক মুহূর্তের জন্য তার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল ভাইবোনগুলির কথা। আর বাবা জগদ্বন্ধু? প্রীতিলতা না থাকলে তিনি-ই বা কী করবেন? এক মুহূর্তের জন্য খুব বাঁচতে ইচ্ছে করল প্রীতিলতার। আবার পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামের সেই ঝোপ-জঙ্গলে ঘেরা কুঁড়েখানির দাওয়ায় বসে আড়বাঁশিটি হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে করল তার। চোখ থেকে একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই তা শুষে নিয়েছে তৃষিত ভারতবর্ষ।

এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করল প্রীতিলতা। ক্ষতস্থানে অসহ্য যন্ত্রণা। দূরে ব্রিটিশের পুলিশের বুটের শব্দ। সেই শব্দ ছাপিয়ে যেন একটা গানের সুর ভেসে আসছে। মাস্টারদা গাইছেন, 'বন্দে মাতরম্'। কোথায় মাস্টারদা? ওই গান কোথা থেকে আসছে? প্রীতিলতা বুঝেছে। ওই সুর উঠে আসছে তার অন্তরের নির্জনতম কুঠুরি থেকে। অবসন্ন প্রীতিলতার মর্মে মর্মে বেজে উঠেছে— 'বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং, রিপুদলবারিণীং মাতরম্।'

প্রীতিলতা তাকিয়েছে সঙ্গীদের দিকে, আর কোনও ভয় নেই— নেই কোনও সংশয়। "সাথী, কমরেডস, ব্রাদার্স, আমার যাত্রা এই পর্যন্তই। তোমরা পালাও। দেখা হবে আবার। একদিন দেখা হবেই। বন্দে মাতরম!"

প্রথমটা না মেনে নিতে চাইলেও কম্যান্ডারের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সেটাই মাস্টারদার শিক্ষা। সকলে শেষ স্যালুট করে যখন বিদায় নিয়েছে, প্রীতিলতার দেহে তখন প্রাণ নেই। খোলা চোখ চেয়ে আছে আকাশের তারাদের দিকে। সে চোখে কোনও ভয় নেই, শুধু স্বপ্ন রয়েছে অবিনশ্বর।

* * *

প্রভাও চোখ বুজে ফেলে। ভয়কে জয় করতে হবে। বেরোতে হবে দ্বিধা-সংশয়ের বেড়াজাল কেটে। মধুসূদন একদিন নিজের অন্তরের ডাকে সাড়া দিয়ে আজন্মলালিত সংস্কারের বেড়া কেটে, সমাজের চোখরাঙানির ভয়কে উপেক্ষা করে নির্ভয় হতে পেরেছিলেন হৃদয়নির্দিষ্ট পথে চলার জন্য। প্রভার প্রীতিদিদি একদিন মৃত্যুভয় জয় করেছিল পূর্ণচিত্তে দেশপ্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেই প্রেম, সেই সমর্পণ ছিল প্রীতিলতার অন্তরের শুদ্ধতম অনুভূতি, অস্তিত্বের শিকড়।

আজ প্রভাকেও খুঁজে পেতে হবে ভয়কে জয় করার মন্ত্র। মহাবিশ্বের গোপন ইঙ্গিত তার কাছে পৌঁছে গেছে মহতী এক সর্বব্যাপী বিন্যাসের পথে। কিন্তু সে ইশারার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে প্রভাকে নিজেকেই। নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার করে তবেই সে বুঝতে পারবে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের আভাসসূত্র। প্রভা নিজের ভিতরে ডুব দেয়, শোনা যাচ্ছে কি নিজের অন্তরের ভাষা?

ক্রমে চারদিকের বাস্তব মুছে আসছে। ঘরের বাইরে করিডরে লোকজনের চলাচলের শব্দ স্তিমিত হয়ে আসছে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের এই বৃহদাকার ল্যাবরেটরিটির

অস্তিত্বই মুছে যাচ্ছে প্রভার চেতনা থেকে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রগুলি, টেবিল-চেয়ার-ব্ল্যাকবোর্ড, দূরে বসে থাকা মনোজ নামের ওই বিদ্বেষী যুবকটি— সব যেন অলীক কুয়াশা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমে। এক সর্বব্যাপী শূন্যতার মাঝে প্রভা চৌধুরী মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে নিজের।

প্রভা অবাক হয়ে দেখছে সামনে দাঁড়ানো মেয়েটিকে। এ তার নিজেরই প্রতিচ্ছবি, তবুও কত আলাদা। এ মেয়েটিকে প্রভা খুব ভালো করেই চেনে। এ মেয়ে শান্তার ছুটকি, মধুসূদনের প্রিয় পাঠসাথী, প্রীতিলতার ন্যাওটা প্রভা। বিরাট বিপুল মহাবিশ্বের মাঝে দাঁড়িয়ে বিহ্বলতা নয়, এ মেয়েটি নিজের শিকড়-বিশ্বাসে খুঁজে পেয়েছে প্রকৃত পরিচয়। সেই পরিচয়েই সে বিশ্বপ্রকৃতির অংশ হয়েও একটি সম্পূর্ণ সত্তা নিয়ে দাঁড়িয়েছে সংশয়হীন সাহসী।

মেয়েটি সহজ হেসে হাত বাড়িয়েছে প্রভার দিকে। ফুল্ল শতদলের মতো সেই হাসি। জড়তাহীন দ্বিধাহীন। নক্ষত্রের উজ্জ্বল বিভার মতো দ্যুতিমান। ক্রমে সে হাসি সংক্রামিত হয়েছে প্রভার মুখেও। সে-ও নিজের হাত বাড়িয়ে মেয়েটির হাত ধরেছে এবার।

* * *

আগেভাগেই লেকচার রুমের কোণের দিকের একটা চেয়ার দখল করে বসেছে মনোজ। এই মজাটা দেখার সুযোগ সে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। এবার প্রভা চৌধুরী বুঝতে পারবে অনধিকার চর্চার ফল ঠিক কী হতে পারে। প্রিপারেটরি নোট ছাড়া জীবনের প্রথম লেকচার দেওয়ার মজা টের পাবে সুরেন্দ্রমোহনের প্রিয় ছাত্রী।

সুরেন্দ্রমোহন মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার ভার প্রভার হাতে তুলে দেওয়ার দিন থেকেই এক অসহনীয় জ্বালায় জ্বলছে মনোজ। একটা মেয়ে তাকে হারিয়ে দিয়ে চলে যাবে আর সে ড্যাব-ড্যাব করে অপদার্থের মতো চেয়ে চেয়ে দেখবে? সে বান্দা মনোজ চক্কোত্তি নয়। ওই মেয়ের এমন অবস্থা করবে সে যে, জীবনে আর কোনও ফিজিক্স ল্যাবরেটরির দিক মাড়াবে না সে।

কাল রাতে কাজের অছিলায় একটু বেশি রাত পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে থেকে গিয়েছিল মনোজ। সুরেন্দ্রমোহন ঘড়ি ধরে বেরিয়ে যান ছ'টার সময়। কালও তার অন্যথা হয়নি। প্রভা লেকচারটা তৈরি করছিল পরপর পয়েন্ট সাজিয়ে। সে-সব লিখে

রাখছিল ওই সাধের নোটবুকে। সে-ও বেরিয়ে গেছে সাতটা নাগাদ। আবার বলেও গেছে, "মনোজদা, আসছি। কাল সকাল সকাল আসব।" আহাহা, মনোজ জানে না যেন এসব ঢং। তার দুর্গতিতে ওই প্রভার যে খুশির শেষ নেই— এ মনোজের দৃঢ় বিশ্বাস।

কাল সকাল সকাল আসবে ছুঁড়ি। ভালোই হয়েছে জেনে। আজ রাতেই যা করার করতে হবে। সাড়ে সাতটা নাগাদ নিজের জায়গা থেকে চুপিসারে উঠে মনোজ প্রভার টেবিলের কাছে যায়। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সাবধানে ড্রয়ার টেনে বার করে নোটবুকখানি। সেটা হাতে নিয়েই একটা প্রবল জিঘাংসায় মনোজের হৃদয় ভরে ওঠে। ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে ল্যাবরেটরির চারদিকে। কিন্তু তা করলে তো চলবে না— মনোজ সামলে নেয় নিজেকে। তারপর নিজের খাতাপত্রের ভিতর নোটবুকটাকে লুকিয়ে চলে যায় ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করে।

এখন অধ্যাপকদের সারির থেকে বেশ খানিকটা দূরে কোণের এই চেয়ারটায় বসে মনোজ অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে প্রভার। সেই নোটবুকটার সদ্‌গতি কাল সন্ধেতেই হয়ে গেছে এন্টালির একটা জঞ্জালের স্তূপে। সকালে এসে মেয়েটার মুখের বিহ্বল ভাব দেখে বেশ আহ্লাদ হয়েছে মনোজের। সে মনে মনে ভেবেছে— খেলা তো সবে শুরু হয়েছে খুকি, ওই লেকচার রুমে প্রফেসর বোস আর তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধুদের সামনে তোমার খেল খতম হবে এবার। প্রভার প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়ে বলেছে, "না তো। তোর নোটবুক? সে আমি জানি না। নিজের কাজেই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তোর নোটবুকের খেয়ালও রাখতে হবে এখন।" শ্লেষবাক্যে অপ্রতিভ হয়ে প্রভা চলে গেছে, মনোজের চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে উঠেছে নির্মম উল্লাস।

অবশেষে প্রভা এসেছে। তার হাতে নোটবুক নেই। তার মুখে আনন্দের দীপ্তি নেই— যেমনটা থাকে সচরাচর ল্যাবরেটরিতে এলে। মনোজের খুশি দ্বিগুণ হয়েছে। ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। আর কোনও উপায় নেই। একটু বাদেই অতিথি অধ্যাপকদের তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও প্রশ্নে বিদ্ধ হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে প্রভা চৌধুরী নাম এই মেয়েটির সকল স্পর্ধা। সেটা বুঝতে পেরেছে বলেই মেয়েটা বিহ্বল হয়ে পড়েছে— ভাবল মনোজ।

মনোজ একটু ভুল করেছিল। প্রভার দৃষ্টিতে শূন্যতা ছিল না। ছিল অশঙ্কা, ভয়রাহিত্য। উচ্ছ্বলতার দীপ্তির বদলে এসেছে অন্তর্জগতের শান্ত বিভা। প্রভা সোজা তাকিয়ে রয়েছে সামনে, কিন্তু তার চোখে পড়ছে না উদগ্রীব সুরেন্দ্রমোহনের মুখ,

অতিথি বিজ্ঞানীদের চেহারার অধৈর্য। সে চেয়েও দেখেনি মনোজের মুখের রেখার কুটিল ভাঁজগুলি। তার চোখের উপর থেকে ভয়ের পরদা সরে গেছে, ভাসছে কেবলই তার কাজ। তার গবেষণার ধাপগুলি। সুরেন্দ্রমোহন মাঝেমাঝেই ছাত্রছাত্রীদের বলে থাকেন— "Nothing should stand between you and your science. Nothing at all." প্রভা নিজের বিজ্ঞানপথের সন্ধান আগেই পেয়েছিল। আজ সে পেয়েছে আত্মপরিচয়ের খোঁজ। আজ কোনও বাধা নেই দুয়ের মধ্যে।

পরের একঘণ্টা সময়ে উল্লাস নিভে গিয়ে মনোজের মনের মধ্যে জেগে উঠেছে বিস্ময়। প্রবল বিস্ময়। এ অসম্ভব। নোটবুক নেই, কিন্তু প্রভা হাতে তুলে নিয়েছে চকখড়ি। বোর্ডের সামনে গিয়ে লিখতে শুরু করেছে। মনোজ স্তম্ভিত হয়ে দেখছে কই, সে যেরকম আশা করেছিল সেরকমটি তো হচ্ছে না। গবেষণার কাজের ধাপগুলি লিখতে গিয়ে, বলতে গিয়ে প্রভা হোঁচট খাচ্ছে না মোটেই। মনোজ নিশ্চিত ছিল নোটবুক না পেয়ে প্রভার আসল সমস্যা হবে অন্য জায়গায়। এই ধাক্কাটা গিয়ে আঘাত করবে আত্মবিশ্বাসে। বিশ্রুত বিজ্ঞানীদের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে সে হার মানবে, আর সুরেন্দ্রমোহনও বুঝতে পারবেন মনোজকে অবহেলা করে কত বড়ো ভুল করেছেন তিনি।

কিন্তু সেরকম তো কিছুই হচ্ছে না। প্রভার চক ব্ল্যাকবোর্ডের উপর সরছে স্বতঃস্ফূর্ত, প্রভার উচ্চারণে কসমিক রে সহায়িত তেজস্ক্রিয় মৌলের ভাঙনের ধাপগুলি বিবৃত হচ্ছে অবলীলায়। কিন্তু মনোজ আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে প্রভাকে দেখে। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে ও যেন লেকচার রুমে লেকচার দিচ্ছে না, কোনও মন্দিরে মন্ত্রোচ্চারণ করছে তদ্গত হয়ে। কী অদ্ভুত প্রশান্তি মেয়েটার মুখে। কোনও সাধক পরমাত্মার সন্ধান পেলে তাঁর সমস্ত মুখে যেমন ফুটে ওঠে অপার শান্তির ছাপ, প্রভার মুখেও তেমন একটি অপূর্ব ভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

মনোজ সরাসরি দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছে অতিথি অধ্যাপকদের মুখেও ছড়িয়ে পড়েছে তার নিজের মুখের মতোই বিস্ময়। স্তব্ধ হয়ে তাঁরা চেয়ে আছেন প্রভার দিকে, সুরেন্দ্রমোহনের মাথা নড়ছে ছন্দোবদ্ধ তালে। মনোজের খুব চেনা এই ভঙ্গিটি। স্যার খুশি হয়েছেন।

ক্রমে প্রভার কণ্ঠে মন্দ্রতা এসেছে, সে যেন আর শুধুই নিজের কাজ উপস্থাপন করছে না, কাজ নিয়ে বলতে বলতে চলে গিয়েছে বিষয়ের গভীর থেকে গভীরতর ভিত্তিতে। আবার পরক্ষণেই তার মুখে উঠে এসেছে গবেষণার পরবর্তী সম্ভাব্য

প্রয়োগের সন্ধান। মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণার চর্চিত অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে স্বচ্ছন্দ সঞ্চার করছে সে অনায়াসে। এই লেকচারটি প্রভার উপস্থাপনার গুণে পর্যবসিত হয়েছে প্রায় মনোমুগ্ধকর কথকতায়। মনোজ মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। তার দু'চোখ ফেটে কান্না আসছে, হৃদয়ে জমছে বিষ। কোন মন্ত্রে প্রভা জয় করল এত বড়ো বাধা? মনোজ এ প্রশ্নের উত্তর পাবে না কখনও।



নভেম্বর ১৯৪৫, ম্যাঞ্চেস্টার

বিরক্ত মুখেই ছোটো ঘরখানায় ঢুকেছিল এডিথ। মেজাজ তিরিক্ষি তার। সক্কাল সক্কাল খানিক কথা কাটাকাটিই করে এসেছে সে হুমদো ম্যাকআর্ডেন-এর সঙ্গে। কিন্তু কিছু করার নেই। রজার ম্যাকআর্ডেন কেবল 'ম্যাঞ্চেস্টার হেরাল্ড' কাগজের সম্পাদকই নয়, মালিকও বটে। আর মালিকের কথার অবাধ্য হয়ে চাকরি খোয়াবে এমন বোকা মেয়ে এডিথ বসওয়েল নয়।

এই গেল সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। হিটলারের পাগলামির ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি গ্রেট ব্রিটেন। অর্থনীতির মাজা ভেঙে দিয়েছে ছয় বছরের ভয়াল মহারণ। এখন চাকরি গেলে বুড়ি মা, মাতাল বাবা আর খুদে ভাইটিকে নিয়ে পথে বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এডিথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বড়ো ভাই হ্যারি থাকলে তার এত ঝক্কি পোয়ানোর কথাই ছিল না। এসব ঝুট-ঝামেলা তার কাঁধে ফেলে সে দিব্যি লন্ডনে গিয়ে আর্টস্কুলে ভর্তি হয়ে যেত। কিন্তু হতভাগা হ্যারিটা তো সেই ১৯৪০-এই জার্মান স্নাইপারের গুলিতে ফৌত হয়ে বেঁচেছে। মনে মনে গতাসু বড়ো ভাইকে মুখ ঝামটা দেয় এডিথ।

অতএব এডিথের উপায় নেই ম্যাকআর্ডেন-এর মুখে চাকরি ছুড়ে মেরে চলে আসার। তাই প্রথমে অরাজি থাকলেও পরে নিমরাজিই হতে হয়েছে এই কাজখানার

জন্য। কাজ মানে একজনের ইন্টারভিউ নেওয়া। একটি ভারতীয় মেয়ে শহরের ইউনিভার্সিটিতে পিএইচ ডি করতে এসেছে, তার সঙ্গে কথা বলে একখান আর্টিকল লিখতে হবে। ভারতের মেয়ে ব্রিটেনে এসেছে পিএইচ ডি করতে— এইটেই একখানা নিতান্ত অভূতপূর্ব বিষয়। তারপরে আবার ফিজিক্স। ম্যাকআর্ডেন বলেছে এমন মেয়ের নিশ্চয়ই একখানা ইন্টারভিউ নেওয়া উচিত। উচিত না ছাই। এডিথ কি ঘাস খায় নাকি? আসল ব্যাপারখানা তো জলের মতো পরিষ্কার।

ব্যারন হার্টফোর্ড বড়ো মুরুব্বি একজন ইউনিভার্সিটির। যুদ্ধের পরে তিনি উঠেপড়ে লেগেছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটিকে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ না হোক অন্তত এডিনবরা বা সেইন্ট অ্যান্ড্রুজ ইউনিভার্সিটির চেয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তা চেষ্টার কোনও কসুর রাখছেন না ব্যারন। সরকারি অনুদান থেকে শুরু করে খানদানি লর্ডদের ব্যক্তিগত দান, যতদূর যা পারেন জোগাড় করার চেষ্টা করছেন তিনি।

কিন্তু দেশের হাঁড়ির হাল হয়েছে এখন জার্মানদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে। এখন তাই ব্যারনের চেষ্টা বিদেশি ব্যবসায়ীদের অনুদান নিয়ে আসা ইউনিভার্সিটিতে। বিদেশি অর্থে মার্কিন। এই ১৯৪৫-এ আর কোন দেশের লোকের কাছেই বা অফুরন্ত পয়সা আছে? ব্যারন তাই বারবার তাঁর ঝুলি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন আটলান্টিকের পারে ফোর্ড, রকফেলার জাতীয় ধনাঢ্যদের দ্বারে।

কিন্তু এইসব ব্যবসায়ী বড়োমানুষের নির্দিষ্ট ফান্ড, বিশেষ প্রকল্প রয়েছে এরকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য। এইসব ফান্ডের নিজস্ব নিয়মকানুন রয়েছে প্রচুর। তার মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে Encouragement of cultural diversity অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করা। সোজা ভাষায় বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীদের যদি কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পড়ার সুযোগ না দেয় তা হলে তারা অনুদানের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না। সুতরাং ব্যারন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটিতে দেশ-বিদেশের ছাত্র— গবেষক আনার জন্য বিশেষ সচেষ্ট। আর এবার ইন্ডিয়া থেকে এসেছে বাদামি চামড়ার এক মেয়ে। তাও আবার ফিজিক্স নিয়ে পিএইচ ডি করতে। সেই খবরখানি ছড়িয়ে পড়লে ইউনিভার্সিটির বিশেষ সুবিধা হয়। এডিথ নিশ্চিতভাবেই জানে ম্যাকআর্ডেনকে বলে এই ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করেছেন ব্যারন খোদ। অথচ এখন দু'-একজন লড়াইফেরত জওয়ানের ইন্টারভিউ, তাদের বীরত্বের কাহিনি ছাপতে পারলে পাঠক হামলে পড়বে। কিংবা শহিদের পরিবারের, বিশেষ করে মায়েদের দুঃখকষ্টের কথা বেশ গুছিয়ে লিখতে পারলে কাগজের কাটতি বেড়ে যেত।

এডিথের নামটাও একটু ছড়াত তবে, মাসের শেষে মাইনেতে আরও বেশ কয়েক পাউন্ড অতিরিক্ত চাইতে পারত সে ম্যাকআর্ডেন-এর কাছে। কিন্তু সে-গুড়ে বালি। এডিথ চলেছে এক ইন্ডিয়ান মেয়ে ফিজিসিস্টের ইন্টারভিউ নিতে। গরিবগুর্বো দেশ, সেখান থেকে রিসার্চ করছে-ই বা কে— তাও আবার মেয়ে একটা। নির্ঘাত কোনও নেটিভ স্টেটের প্রিন্সেস হবে। শখ হয়েছে ক'দিন একটু রিসার্চ করে যাবে।

এই সমস্তই ভাবতে ভাবতে এসে ব্যাজার মুখে মিসেস নেভিলের বোর্ডিং হাউসের কড়া নেড়েছিল এডিথ। এখানেই রয়েছে সে ভারতীয় মেয়েটি। মিসেস নেভিল এডিথকে দেখিয়ে দিয়েছেন সিঁড়ির কোণায় একটা ছোট্ট ঘর। সেখানে ঢুকতে ঢুকতেই এডিথ ভাবল, আর যা-ই হোক কোনও ধনীলোকের মেয়ে এই ঘরে থাকতে পারে না। ঘরের অধিবাসিনীটিকে দেখে অবশ্য বিত্তশালিনী বলে মনেও হয় না। ছোটোখাটো চেহারার মেয়েটির পরনে একখান অতি সাধারণ হাউসকোট। নড়বড়ে একখানা চেয়ার নিয়ে খুদে আর ঝুলকালিমাখা ফায়ারপ্লেসটির ধারে বসে সে আগুন পোহাতে পোহাতে তন্ময় হয়েছিল একখানা বইতে।

অভিবাদন করে কেতাদুরস্ত ভাষায় এডিথ জানতে চাইল— সে কি কুমারী প্রোবা চাউড্রির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করছে? মেয়েটি প্রত্যাভিবাদন করে হাসল। ভারী উজ্জ্বল আর নির্মল সেই হাসি। এডিথ দেখল ভারতীয়দের মধ্যে যেমন স্বাভাবিক সংকোচ সে সাধারণত দেখেছে, এ মেয়েটির মধ্যে তা নেই, আছে একটা সহজ স্বচ্ছন্দ সপ্রতিভ ভাব। এডিথ খুশি হয়ে বসে পড়ল প্রভার চেয়ারখানিতেই। ঘরে বসার আর কোনও ব্যবস্থা নেই, তাই প্রভা এই সাংবাদিক মেয়েটিকে নিজের চেয়ারখানিই দেখিয়ে দিয়েছে বসার জন্য। নিজে সে বসেছে লোহার খাটখানিতে।

ইন্টারভিউটা বেশ সহজ-সরল ঢংয়েই শুরু করেছিল এডিথ। কার কাছে কাজ করছে এখানে প্রভা, ইন্ডিয়ায় কার কাছে কাজ করেছে— এইসব। প্রভাও এই স্বর্ণকেশী তরুণী সাংবাদিকটির ভদ্র ব্যবহারে খুশি হয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল একে একে। তাল কাটল মিনিট-পনেরো পরে।

"ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে এসে, এখানকার রিসার্চের পরিবেশ আর পরিকাঠামো দেখে নিশ্চয়ই তুমি চমকে গিয়েছ? চমকটা অবিশ্যি আনন্দেরই আমি একশো ভাগ নিশ্চিত।" সামনের দিকে ঝুঁকে কথাগুলো হালকা চালেই বলেছে এডিথ কিন্তু তার কথার সুরটা প্রভার পছন্দ হয়নি। ভুরু কুঁচকে প্রভা জিজ্ঞাসা করল, "কীসের চমক?" বাচ্চাদের যেমন করে বোঝায় বড়োরা তেমন করেই এডিথ বলল, "মানে তোমাদের

দেশে তো আমি যতদূর জানি রিসার্চ বলে তেমন কিছু নেই, তো এইবার সত্যিকারের রিসার্চ করার সুযোগ পেয়ে কেমন লাগছে সেইটে যদি আমাদের পাঠকদের জন্য বলতে...।"

একমুহূর্ত ভাবে প্রভা, কী বলা উচিত হবে? তারপর এডিথের চোখে চোখ রেখে কেটে কেটে উচ্চারণ করে, "হ্যাঁ, রিসার্চ কিছু হয় না বলেই সম্ভবত তোমাদের দেশের শুধু নয় সারা পৃথিবীর সেরা সায়েন্স জার্নাল 'নেচার' আমার চারখানা গবেষণাপত্র ছেপেছে পরপর। ভারতে বসে করা কাজ দেখে 'চমকে' গিয়েই করেছে তারা নিশ্চয়ই এ কাজ। 'চমকটা অবিশ্যি আনন্দেরই— আমি একশো ভাগ নিশ্চিত।'" এডিথের কথা তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে চওড়া করে হাসে প্রভা।

এবার চমকানোর পালা ম্যাঞ্চেস্টারে হেরাল্ডের তরুণী সাংবাদিকটির। চারখানা পেপার 'নেচার'-এ ছেপে এসেছে এ মেয়ে? এডিথ তো ভেবেছিল পিএইচ ডি করতে এসেছে অনভিজ্ঞ, আনাড়ি কোনও মেয়ে। কিন্তু চমকে গিয়ে খেই হারালে চলবে না, খবর করার সময় সাংবাদিকের হাত থেকে রাশ আলগা হয়ে গেলে মুশকিল— বুড়ো ম্যাকআর্ডেন প্রায়ই বলে কথাটা।

অবিচলভাবেই এডিথ ফের প্রশ্ন করে, "আচ্ছা। ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি তোমাদের দেশে তা হলে এখন রিসার্চ হয় কিছু। আমি তোমাদের বিখ্যাত বিজ্ঞানী রামনের নাম জানি। কিন্তু এটা তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না, ইন্ডিয়ার বিজ্ঞান ব্রিটিশের কাছে কৃতজ্ঞ। ব্রিটিশের তৈরি করা ইউনিভার্সিটিতেই বিজ্ঞানে তোমাদের যত সাফল্য।"

ইচ্ছে করেই কথায় একটু শ্লেষের সুর রেখেছে এডিথ। ইন্ডিয়ান মেয়েটার ভাবভঙ্গি তাকে এই মতলবটা দিয়েছে। এবার রেগে গিয়ে খেই হারাবে 'প্রোবা চাউড্রি', ইন্টারভিউ উঠবে লাটে, আর এডিথও অফিসে ফিরে সম্পাদককে দুটো কথা শোনাতে পারবে তার পুরো দিনটা নষ্ট করার জন্য।

প্রভা কি বুঝতে পেরেছে এডিথের মতলব? না-হলে এবার কেন সে আর কোনও কড়া প্রতিক্রিয়া দিল না? এডিথ অবাক হয়ে দেখল ইন্ডিয়ান মেয়েটার মুখে একটা অদ্ভুত শান্ত ভাব। দুই চোখ মেলে যখন প্রভা সামনের দিকে তাকাল, এডিথের মনে হল সে চোখ দু'টি তার মুখের উপর স্থির হয়ে থাকলেও দৃষ্টি যেন অন্য কোথাও। কোনও নির্দিষ্ট দিকেও নয় ঠিক— অথচ শূন্য নয় সে-দৃষ্টি।

প্রভা মৃদুস্বরে বলতে শুরু করল, যেন নিজের সঙ্গেই সে কথা বলছে— "আমাদের

দেশে যখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্ম হয়, তোমাদের জাতটাই ঠিক করে দানা বাঁধেনি এডিথ। আমাদের দেশে যখন আর্যভট্ট নামে একজন মানুষ সংখ্যাতত্ত্ব-শূন্যতত্ত্ব নিয়ে অমূল্য কাজ করছেন, তখন তোমরা রোমানদের পদানত হয়ে হুকুম তামিল করছ।”

এডিথের বুকে শেলের মতো বিঁধছে কথাগুলো। কিন্তু প্রভা এতই দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে বলছে কথাগুলো— জুতসই জবাব আসছে না এডিথের মুখে। প্রভা অবিচলভাবেই বলে চলেছে, “আমাদের বিজ্ঞানের সাফল্য তোমাদের বিজ্ঞানের অনেক আগেই এসেছে এডিথ। আমাদের বিজ্ঞানের ধারা অন্যভাবে চলে। বর্তমান পশ্চিমা বিজ্ঞানে যেমন বিজ্ঞানীর পূর্ণ পরিচয় জড়িয়ে থাকে তাঁর গবেষণার সঙ্গে, আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন বিজ্ঞান তেমনটি নয়। শতকের পর শতক ধরে আমাদের অনামা অপরিচিত বিস্মৃত বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের আইডিয়াকে ঘষে মেজে নিখুঁত করার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। উদ্ভাবকের পরিচয় ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠত বিজ্ঞান, ব্যক্তিনামের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সমষ্টির উদ্যোগ। সমষ্টির সে-জ্ঞানচর্চার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের ধাতুশিল্পে, জড়িয়ে রয়েছে পঞ্জিকানির্মাণে। গতিশীল সমাজের জীবনযাত্রার সর্বত্র সেই বিজ্ঞান আমাদের ধারণ করে রেখেছে। তাই ‘ব্রিটিশের তৈরি করা ইউনিভার্সিটিতেই’ বিজ্ঞানে আমাদের যত সাফল্য— এ কথা আমি মানতে পারলাম না তোমার।”

কথা বলতে বলতে প্রভার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কণ্ঠস্বরে বাজছে অনুপম এক দার্ঢ্য। এডিথ মুগ্ধ হয়ে যায়। অদ্ভুত এই মেয়েটি। এরকম মেয়ে এডিথ দেখেনি আগে। কিন্তু নিজের কাজও সে ভোলেনি, খোঁচা দিয়ে প্রভার মুখ থেকে আরও কিছু কথা বার করার জন্য বলে, “সে-সব দিন অতীত হয়ে গিয়েছে মিস চাউড্রি। তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ, এই সালটা ১৯৪৫। এখন দুনিয়া চালাচ্ছে পশ্চিমা বিজ্ঞান। আর তুমিই এদেশে এসেছ সেই বিজ্ঞানের শিক্ষা নিতে। গ্রহীতার কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত তোমার আচরণে।”

এডিথকে অবাক করে প্রভা হেসে উঠেছে মুক্তকণ্ঠে। অনেকদিন বাদে এমন হাসল সে। সে-হাসি থামতেও অনেকক্ষণ সময় নিল। হাসির শব্দে এমনকি বাড়িউলি মিসেস নেভিল পর্যন্ত এসে উঁকি মেরে গেল একবার। হাসি থামলে এডিথ বসওয়েলের বিস্মিত মুখের দিকে সে তাকিয়ে বলল, “তুমি সাংবাদিক কেমন আমি জানি না। তবে এ কথা ঠিক যে বিজ্ঞান গবেষণার রীতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তোমার বিশেষ জ্ঞান নেই।” এডিথের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাগ চেপে সে চুপ করে রইল।

প্রভা এডিথের মনোভাব বুঝতে পারলেও বিশেষ আমল দিল না। "বিজ্ঞানে দাতা-গ্রহীতার কোনও ব্যাপার নেই এডিথ। বিজ্ঞানে রয়েছে শুধু যৌথতা। বিজ্ঞান-গবেষণা কোনও দেশ অধিকার করে উপনিবেশ স্থাপন করা নয়। সেখানে কারও অধিকার বেশি কম নয়।" শ্বাস নিতে এক মুহূর্ত থামল প্রভা। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে, সেখানে জায়গা করে নিয়েছে প্রশান্তি ও ব্যক্তিত্ব।

প্রভার স্বর আবার গমগম করে বেজে উঠেছে ছোট্ট ঘরখানায়, "এ কথা ঠিক যে, কালের নিয়মে প্রাচ্যের জ্ঞানচর্চার শেষে এখন পশ্চিমা বিজ্ঞানের যুগ। এ কথাও ঠিক যে, দুশো বছরের শোষণের শেষে নিরন্ন ভারতবর্ষ বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য ব্রিটেনের দিকেই তাকিয়ে থাকে। তবু জেনো, আমি সেই দরিদ্র-পরাজিত মাতৃভূমির প্রতিভূ হয়ে এসেছি বিজ্ঞানের সেবা করতে, ব্রিটিশের সেবা নয়। সমানে সমানে কাজ করতে এসেছি তোমার দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। তাই বিজ্ঞানীর থেকে বিজ্ঞানীর মতো ব্যবহার প্রত্যাশা করি। মানুষের থেকে মানুষের মতো আচরণ চাই।"

প্রভার কথা থেমে গেলেও এডিথের ঘোর কাটেনি। বহুদূর এক পরাধীন দেশের এই উজ্জ্বল প্রতিভাটির সামনে বসে তার মাথা নুয়ে আসছে, গলার মধ্যে বাসা বাঁধছে অজানা আবেগ। মনে মনে সে নিজের আর্টিকলটার নামও ঠিক করে নিয়েছে— 'A modern science prodigy from the land of ancient science'।

গলা খাঁকারি দিয়ে এডিথ জিজ্ঞাসা করে, "তুমি এত ভালো কাজ করেছ দেশে, 'নেচার'-এ চারটে পেপার প্রকাশিত। তুমি ওখানে পিএইচ ডি করে এলে না কেন? সেটাই কি ভালো হত না?" এডিথের প্রশ্ন শুনে প্রভা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কী উত্তর দেবে সে এ কথার? কী-ই বা বুঝবে এই ভিনদেশি মেয়েটি? এই একই প্রশ্ন করেছিলেন প্রফেসর প্যাট্রিক ব্ল্যাকেট, ম্যাঞ্চেস্টারে প্রভার পিএইচ ডি গাইড। সে-দিনও কোনও উত্তর দিতে পারেনি প্রভা। সব ঠিকঠাক চললে তার পিএইচ ডি তো হয়ে যাওয়ার কথাই ছিল সেই কবে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির মহতী সজ্জায় বুঝি ভারতবর্ষের মেয়ের ভারতবর্ষে পিএইচ ডি করার সুযোগ ছিল না।



ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, মালদা

উপুড় হয়ে একটা সরু নালার মধ্যে শুয়ে রয়েছে অমিয়। শীর্ণ জলধারা তার সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিয়েছে বহুক্ষণ আগেই। ফাল্গুন মাসের রাত। শীত চলে গেলেও তার সামান্য রেশটুকু ফেলে রেখে গিয়েছে পিছনে। থর থর করে কাঁপছিল অমিয়। তার কতটা ঠান্ডায় আর কতখানিই বা আতঙ্কে বলা মুশকিল। হ্যাঁ, আতঙ্ক। সুনীলদা, সুনীলবরণ মিত্র একেবারে পাশেই দাঁড়িয়েছিল অমিয়র। ধোঁয়া আর শব্দের মাঝখানে অমিয়র দিকে ফিরে চিৎকার করে বলেছিল, "পালা অমিয়, হারামজাদা লাল পাগড়িরা গুলি ছুড়ছে।" অমিয় কিছু বুঝে ওঠার আগেই সাঁইই শব্দে একটা গরম সিসের গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল সুনীলদার বুক। প্রবল আতঙ্কে ছুটতে শুরু করার আগে একপলকের জন্য অমিয় দেখতে পেয়েছিল, সুনীলদার খাদির পাঞ্জাবির বুকের কাছটায় একটা লাল রঙের বৃত্ত তৈরি হচ্ছে।

অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে অনেকদূর এসে গেছে অমিয়। দু'-একজন সঙ্গীসাথীকে দেখতে পাচ্ছিল প্রথমে। কিন্তু ক্রমে সে একলা হয়ে পড়েছে। অচেনা জায়গা, অজানা রাস্তা। মাত্রই তিনদিন হয়েছে সে এসেছে এখানে। কিছু ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে বটে মূল সম্মেলনের আগে, কিন্তু তিনবেলায় আর কতটা-ই বা চেনা যায় সম্পূর্ণ অচেনা একটা জায়গাকে? সন্ধ্যাগুলোয় তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল মিটিংয়ে। সম্মেলন

সফল করার পরিকল্পনা আর উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর সবটাই করতে হয়েছে অত্যন্ত গোপনে।

এখনও কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। ব্রিটিশ সরকার পাঁচ বছর আগেই রীতিমতো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তেরোখানি ভিন্ন ভিন্ন বামমনোভাবাপন্ন দলকে। মিটিং-মিছিল-কার্যক্রমের উপর আই বি-র গোয়েন্দাদের কড়া নজর। ধরা পড়লেই প্রথমে হাজত, তারপর জেল। আর পুলিশের চরম অত্যাচার তো রয়েইছে। আগে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে যা হত পুলিশ চৌকির অন্ধকার কুঠুরিতে, এখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেনাদের সঙ্গে একই কাজ করছে পুলিশ। আন্দোলনের মতবাদ পাল্টে গিয়েছে, বদলে গিয়েছে পথ— কিন্তু শাসকের রক্তচক্ষু ম্লান হয়নি।

অমিয়র মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে যন্ত্রণায়। লাফ দিয়ে নালাটা পেরোনোর সময় বেকায়দায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছে সে। হাঁটুটা সম্ভবত গিয়ে লেগেছে বড়ো একটা ঢেলায়, আর নালাটা টপকে যাওয়ার বদলে সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়েছে অমিয়। নড়তে পারছে না এখন সে। তাই নালার মধ্যেই নিশ্চুপে আত্মগোপন করে রয়েছে। অন্ধকারে মড়ার মতো পড়ে থাকলে পুলিশ তাঁর খোঁজ পাবে না হয়তো। শালারা একবার ধরতে পারলে আগে আগাপাশতলা পেটাবে। আরও যন্ত্রণা দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে থানায়। কিন্তু তার জন্য, তাদের জন্য কারও মাথাব্যথা হবে না।

কংগ্রেসের সুবিধাবাদী নেতারা তাদের দরের মানুষ বলে মনেই করেন না। সুভাষবাবুকে বাদ দিয়ে বাকি দলটার গোটা মাথাটাই পচে গিয়েছে একেবারে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে অমিয়। আর কলকাতার বাবুমানুষদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। এভাবে কিছু হয় না, এভাবে কিছু হতে পারে না। অমিয় বুঝেছে অনেক আগেই। আর তাই সে কলকাতা থেকে দূরে গ্রামে গ্রামে মানুষের মধ্যে চলে আসে সময় পেলেই। পার্টির ডাকে তো আসেই, নিজেও আসে। একটা গণজাগরণ দরকার, একটা সার্বিক আন্দোলন— না-হলে মানুষ মরবে এভাবেই শাসকের বুটের তলায়। সুনীলদা বলত কথাগুলো।

সেই সুনীলদা এখন ধুলোমাখা আলপথে শুয়ে রয়েছে পুলিশের গুলি খেয়ে। কিন্তু পুলিশের তো আসার কথা ছিল না। থানা থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে এই কৃষক সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে অত্যন্ত গোপনে। কৃষক সমিতির উদ্যোগে সম্মেলন হলেও যোগ দেবেন আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা অনেক নেতাই। সে-জন্যই সংগঠকদের গোপনীয়তা আর সতর্কতার সীমা ছিল না। তা হলে পুলিশ জানতে পারল কী করে?

আই বি-র গোয়েন্দা হয়তো মিশে রয়েছে তাদের দলে। পুলিশ তো গুলি চালায়নি প্রথমে। হেঁকে হেঁকে সকলকে চলে যেতে বলছিল। তারপর বড়োকর্তার হুকুমে কনস্টেবলরা লাঠিও চার্জ করেছে।

লাঠি চার্জ করা শুরু হতেই ভিড় অনেকটাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আর ঠিক তখনিই কারা যেন পুলিশের দিকে তাক করে ছুড়ে মারে দু'-একটা হাত বোমা। ব্যস, এটুকু উসকানিই দরকার ছিল পুলিশের। গুলি চালাতে আর দেরি করেনি তারা। বোমা ছুড়ল কারা? বিশ্বাসঘাতক প্রতিবিপ্লবীর দল? কিন্তু তাদের পরিচয়-ই বা কী? আকাশপাতাল ভেবেও কূল করতে পারে না অমিয়।

সময়টা খারাপ খুব। পার্টির মধ্যে হাজারও ঝামেলা, অযুত ভাগাভাগি। লেবার পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সমস্যা, কৃষক সমিতির সঙ্গে শ্রমিক সংঘের মতদ্বন্দ্ব। অমিয়র মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে, "এত অনৈক্য নিয়ে তোমরা দুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষকে এক করবে কী করে কমরেড? কী করে?"

নিজের দ্বিধা-সংশয় নিয়ে অমিয় বারেবারেই গিয়েছিল সুনীলদার কাছে। সুনীলদা খুবই স্নেহ করত অমিয়কে। একেবারে নিজের ছোটোভাইয়ের মতোই। বুঝিয়েওছিল অমিয়কে খুবই যত্ন করে। কিন্তু 'মতাদর্শ', 'বিশ্লেষণগত মতপার্থক্য', 'শ্রেণিচ্যুত বুদ্ধিজীবী', 'স্যোশালিস্ট ঐক্যের গলদ', 'বলশেভিক নীতির বিরোধ'— এই সমস্ত ভারী ভারী কথার তোড়ে অমিয়র চিন্তাভাবনা গিয়েছিল আরও গুলিয়ে। হাল ছেড়ে দিয়ে সে শেষপর্যন্ত ভেবেছিল সুনীলদা নিশ্চয়ই না বুঝে এগোবে না কোথাও। সে শুধু গুরু অর্থাৎ সুনীলবরণ মিত্র-কে অনুসরণ করবে। তা হলেই মানুষ জাগবে ঠিক একটা সময়।

কিন্তু সুনীলবরণ মিত্র আর কোনওদিন জাগবে না। আর এই নালা থেকে উঠে না পালাতে পারলে অমিয় নিজেও যে কতদিন জেগে থাকার সুযোগ পাবে সেটাও দিব্যি গেলে বলা যায় না। হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে গিয়েই অমিয় টের পেল হাঁটুতে এখনও অসহ্য যন্ত্রণা। কিছুতেই এখন চলা যাবে না। বিশ্রাম নিতেই হবে কিছুক্ষণ। হাল ছেড়ে দিয়ে সে আবার নালাটাতেই শুয়ে পড়ল। তবে এবার চিত হয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বসন্তের মেঘমুক্ত আকাশ। সেই আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে রয়েছে তারা। যেমন থাকে তারা। সে-দিকে তাকিয়ে অমিয়র হঠাৎই মনে পড়ল প্রভার কথা।

মেয়েটা খুব তারাদের কথা ভাবে। বিশ্বপ্রকৃতি আর ব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবে। আর

একটা কথা খুব বলে প্রভা— একটা বিরাট বিপুল সজ্জার কথা, 'The Grand Design'— নিজের মনেই বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল অমিয়। সে নিজে ভালো বোঝে না, কিন্তু প্রভা তাকে বলেছে— এই নকশা, এই সজ্জাটি নাকি বিশ্বপ্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ডজুড়েই সাজিয়ে রেখেছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় থেকে বিরাট বিপুল ঘটনা সবই এক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ, একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে একটি অমোঘ সংযোগসূত্রের মাধ্যমে।

অমিয় শুনে বলে উঠেছিল, "মানে ভগবানের মতো?" প্রভা ভ্রু কুঞ্চিত করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "ভগবানে বিশ্বাস করো তা হলে? কিন্তু তুমি তো জড়বাদী কমিউনিস্ট বলেই জানতাম।" অপ্রতিভ হয়ে অমিয় আমতা আমতা করছে। ঠাকুর-দেবতা ঠিক মানে না তেমন, কিন্তু একেবারে অস্বীকার করতেও পারেনি এখনও।

আজ এই তারাভরা আকাশের নীচে বিধ্বস্ত ভূপতিত শরীরে শুয়ে থাকতে থাকতে অমিয়র হঠাৎ মনে হল, তারাও তো একটা 'Grand Design'-এর জন্য কাজ করছে। পার্টি, সুনীলদা, সে। শুধু 'Grand Design' নয়, একটা 'Just Design'।

ইতিহাসের ধারা সমাজে যে অসাম্য আর বিশৃঙ্খলার ধারা তৈরি করেছে, তাকে একটা বিপুল আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই তো সমতায়, শৃঙ্খলায় আনতে হবে। যেমনটি লেনিন এনেছিলেন রাশিয়ায়। যেমনটি চীনে করে দেখিয়েছিলেন সান-ইয়াৎ-সেন। ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল সজ্জায় হয়তো এটাই মানুষের নিজস্ব অবদান। এই ক্ষুদ্র ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

চেষ্টাটাই সব, অমিয় ফের একবার ভাবে। বিদ্রোহের সন্তান নেপোলিয়ন সম্রাট হয়ে বসেছিলেন ফ্রান্সে। প্রথম চার্লসের মুন্ডু কেটে উল্লাস করা জনতার দল একদিন তাঁরই ছেলে দ্বিতীয় চার্লসকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে এনে বসিয়েছিল সাদরে। সমস্ত বিপ্লবের শেষে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় না। হয়তো বিশৃঙ্খলা বাড়ে, অন্যায়ের পাল্লা ভারী হয় আরও। হয়তো তাদের আন্দোলনেরও ভবিতব্যে সে পরিণতিই অপেক্ষা করছে। কিন্তু তবুও চেষ্টা তো করতেই হবে। মানুষের চেতনা কোনও একটা অসীম রহস্যময় শক্তির খেয়ালমাত্র নয়, নিজস্ব অস্তিত্বে তা বলীয়ান— এ বিশ্বাস দৃঢ় অমিয়র মনে।

অমিয় একটা তেতো হাসি হাসল আপনমনেই। সে যখন বিপদের মুখে চলচ্ছক্তিহীন শরীরে পড়ে রয়েছে, তখনই তার মাথার মধ্যে ভিড় করে আসছে এইসব গ্রাম্ভারি দর্শনের কথা, উল্টোপাল্টা চিন্তা। প্রভা যখন তাকে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে বারণ করত, সে কোনও কথাই বলে উঠতে পারেনি তো সে সময়। নিশ্চুপ হয়েই থাকত।

কিন্তু প্রভাকে কতকিছু বলার ছিল তার। কিছুই বলা হল না।

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে তুলে দাঁড় করাল অমিয়। পুলিশ এখনও আসেনি এদিকটায়। ভোরের আলো এসে আকাশের বুক থেকে ওই নক্ষত্রমালাকে মুছে দেওয়ার আগেই এখান থেকে চলে যেতে হবে দূরে। অনেক দূরে। আহত পা টেনে টেনে অমিয় চলতে লাগল। পিছনে পড়ে রইল একরাশ স্বপ্নের লাশ আর

অসংখ্য অতৃপ্ত অভিলাষ।



মার্চ ১৯৩৯, কলকাতা

"এভাবে চলছে না, বুঝলে, খামোখা অর্থের অপচয়, ফোটোগ্রাফিক প্লেট নষ্ট।" সুরেন্দ্রমোহনের গম্ভীর কণ্ঠ বেজে উঠেছে ল্যাবরেটরির মধ্যে। প্রভা জানে কেন অধ্যাপকের এই উষ্মা। ফোটোগ্রাফিক প্লেট নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে অনেকদিনই হয়ে গেল। প্রাথমিক কাজগুলি ভালোই এগিয়েছিল। ফোটোগ্রাফিক প্লেটের কার্যকারিতাও চমৎকার। কিন্তু কলকাতায় মহাজাগতিক রশ্মির চলন ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ভালো করে ধরা পড়ছে না।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কলকাতার উচ্চতা মাত্রই কুড়ি ফুট মতো। মাটির কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন ও ভারী। মহাজাগতিক রশ্মিরা সেখানে বাধা পায়। ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ঠিক করে তাদের পথরেখা ফুটে ওঠে না। এইটেই ফোটোগ্রাফিক প্লেটের অসুবিধে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে যেখানে বায়ুমণ্ডল হালকা, সেখানে ফোটোগ্রাফিক প্লেট বসালে পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়। ইউরোপের বিজ্ঞানীরা সেটাই করছেন। আল্পসের বুকের নানা অবসার্ভেটরিতে রেখে আসছেন ফোটোগ্রাফিক প্লেট পাঁচ ছয় মাসের জন্য।

"দার্জিলিং-এ নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে প্লেট," সুরেন্দ্রমোহন ঘোষণা করলেন। "দার্জিলিং?" অস্ফুট স্বরে আওড়ালেও বিভার কণ্ঠের প্রশ্নটি ঠিকই কানে গিয়েছে

অধ্যাপকের। "হ্যাঁ, দার্জিলিং," সুরেন্দ্রমোহনের কণ্ঠে উত্তেজনা, "তা ছাড়া কোনও উপায় নেই। দার্জিলিং-এর ক্যাম্পাসেই নিয়ে রাখতে হবে প্লেটগুলো। এত বড়ো একখানা সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।" শেষ কথাগুলো বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলেছেন সুরেন্দ্রমোহন। তাঁর সে কণ্ঠে ফিরে তাকিয়েছে ঘরের অন্যপ্রান্তে থাকা মনোজ।

দার্জিলিং-এ একটি ক্যাম্পাস রয়েছে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের। এটিও জগদীশচন্দ্রেরই বাড়ি। হিমালয়ের কোলে এই শৈলশহরটির সঙ্গে প্রয়াত আচার্যের সখ্য বহু প্রাচীন ছিল। প্রায় তিরিশ বছর আগে দ্বারকানাথ রায়ের দার্জিলিং-এর প্রাসাদোপম 'রায় ভিলা'টি ভাড়া নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে গ্রীষ্মকালগুলি অতিবাহিত করতেন জগদীশচন্দ্র। বাড়ির পিছনদিকের বিস্তৃত স্থানটিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ নিয়ে একখানি জীববিদ্যার পরীক্ষাগারও বানিয়ে ফেলেন বিজ্ঞানী। বোস দম্পতির আহবানে ভগিনী নিবেদিতাও জীবনের শেষপ্রান্তে এসে রায় ভিলায় কাটিয়েছেন।

কিন্তু ক্রমেই জগদীশচন্দ্রের গবেষণার জন্য প্রয়োজন হতে লাগল আরও বড়ো জায়গার। অবশেষে ১৯১৭ সাল নাগাদ তিনি কিনে ফেললেন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী জেটমল ভোজরাজের দার্জিলিং-এর বাড়িটি। বাড়ির প্রশস্ত হাতায় অনেকটা জায়গা তো আছেই, তার উপর বাড়ির সামনের রাস্তার উল্টোদিকে তিন একর জমিও পাওয়া গেল গবেষণার কাজের জন্য। বাড়ির হাতার জায়গাটি সংস্কার করে বানানো হল নতুন ভবন। তার নকশা করে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। দু'জনে অনেককালের বন্ধু। শুধু নকশাই নয় নতুন ভবনটির নামকরণও করে দিলেন কবি— 'হৈমবতী'। পুরোনো ভবনটির নাম হল 'মায়াপুরী'।

সেই মায়াপুরী তখন থেকেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের একটা পুরোদস্তুর রিসার্চ স্টেশন হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। আর হৈমবতী-তে গবেষকদের থাকার ব্যবস্থা আছে। এসব কথা প্রভা জানে। কিন্তু সেখানে গিয়ে রাখতে হবে ফোটোগ্রাফিক প্লেট? কে রাখবে? কর্মচারীরা নিয়ে গিয়ে ঠিক করে রাখতে পারবে? এ তার অনেক দিনের স্বপ্নের প্রজেক্ট, সাধনার ধন। চোখের আড়ালে যদি কিছু হয়ে যায় প্লেটগুলোর? তবে প্রফেসর বোস কেন অধৈর্য হয়ে পড়েছেন তাও বুঝতে পারছে সে এবং স্যারের সঙ্গে প্রভা একমত— তাড়াতাড়ি কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিতান্তই দরকার।

বছর-পাঁচেক আগে জাপান থেকে বিজ্ঞানী হিদেকি ইউকাওয়া অঙ্ক কষে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে একধরনের ক্ষণজীবী কণার অস্তিত্ব প্রস্তাব করেছেন। পরমাণুর

নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনকে একসঙ্গে বেঁধে বেঁধে রাখে নিউক্লীয় বল। ইউকাওয়া তাত্ত্বিকভাবে দেখিয়েছেন এই বলের বাহক হিসেবে কাজ করে এই মেসোট্রন* কণা।

কিন্তু তাত্ত্বিক প্রস্তাব আর পরীক্ষাগত প্রমাণের মধ্যেকার রাস্তা সুদীর্ঘ ও দুর্গম। পরীক্ষাগতভাবে খুঁজে পেতে হবে কণাটিকে। দেখতে হবে ইউকাওয়ার গাণিতিক হিসাবের সঙ্গে মেলে কিনা তার ভর ও অন্যান্য ভৌতধর্ম। আর যদি তা করা যায়, তবে এই বিশ শতকের বিজ্ঞান আরও একটা বিপুল অর্জনের কাছাকাছি চলে আসবে। খুলে যাবে সত্যসন্ধানের নতুন পথ।

তাই পৃথিবীজুড়ে বিজ্ঞানীরাও কাজ শুরু করে দিয়েছেন তেড়েফুঁড়ে। কিন্তু পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে অস্থায়ী এরকম কোনও কণাকে চিহ্নিত করা সহজ নয় মোটেই। তবে মনে করা হচ্ছে, মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে থেকে এই কণার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কার্ল অ্যান্ডারসন কাজ শুরুও করে দিয়েছেন ইউকাওয়ার প্রস্তাবনা জনসমক্ষে আসার পরে পরেই। হ্যাঁ, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম কার্ল অ্যান্ডারসন। যাঁর নোবেলজয়ী গবেষণার সার-সংক্ষেপ লিখে প্রভাকে নিজের যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল সুরেন্দ্রমোহনের কাছে। বছর-তিনেক আগে সাফল্য ও ব্যর্থতা একসঙ্গে ধরা দিয়েছে অ্যান্ডারসনের হাতে।

মহাজাগতিক রশ্মি থেকে একদম নতুন একটি কণার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন বটে অ্যান্ডারসন কিন্তু পরে মেপেজুকে দেখা গিয়েছে সেটি ইউকাওয়া প্রস্তাবিত মেসোট্রন নয়। একেবারেই অজানা এক কণা। সুরেন্দ্রমোহন অ্যান্ডারসনেই কাজের ব্যাপারে বিশদ জানার পর থেকেই একেবারে টগবগ করে ফুটছেন। প্রভাকে বলেছেন, "সুবর্ণ সুযোগ প্রভা। যদি ফোটোগ্রাফিক প্লেটে একবার এই মেসোট্রন ধরে ফেলা যায়, দেশের বিজ্ঞানের মানচিত্র বদলে দেওয়া যাবে। আর ভাগ্য যদি সহায় থাকে, তা হলে তো...," কথা শেষ করেননি অধ্যাপক, কিন্তু ছাত্রীটি বুঝে ফেলেছে অনুচ্চারিত অভিলাষের সার। 'তা হলে তো নোবেল প্রাইজও সম্ভব হতে পারে'— এইটেই সুরেন্দ্রমোহনের মনের কথা।

সি ভি রামনের পরে আর কেউ বিজ্ঞানে নোবেল পায়নি ভারত থেকে। মেঘনাদ সাহা চূড়ান্ত তালিকায় স্থান করে নিলেও শেষ পর্যায়ে গিয়ে অসফল হয়েছেন। সে-বিষয়ে রামনের নিস্পৃহতাও বহুচর্চিত বিষয়। তার উপর রামন দক্ষিণ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নিয়ে দল পাকিয়েছেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করছেন বাঙালিদের বিরুদ্ধতা করার। এমতাবস্থায় একটি নোবেল প্রাইজ কলকাতা ইউনিভার্সিটির হৃতগৌরব

পুনরুদ্ধার করতে পারবে, রামনকে উচিত জবাব দিতে পারবে, আর সব থেকে বড়ো কথা— সুরেন্দ্রমোহনকে বসিয়ে দিতে পারবে রামন ও মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একই সারিতে।

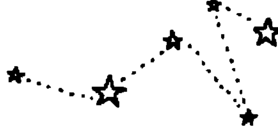
সুরেন্দ্রমোহনের বিপুল আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে এই জায়গাটায়। আজ ভারতবর্ষের পদার্থবিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র বলতে ওই দু'জনকেই ধরা হয় এখন বিজ্ঞানীমহলে। কিন্তু সুরেন্দ্রমোহন নিজের বিশ্বাস— তাঁর নিজের প্রতিভাও কিছু কম নয় এঁদের থেকে। অথচ তাঁর সমগ্র গবেষণাজীবনটি এই দু'টি বিরাট নামের ছায়ায় ঢাকা পড়ে থেকেছে এতদিন। একটি নোবেল প্রাইজ বদলে দিতে পারে সে-সমস্ত কিছু। প্রভা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে স্যারের মানসিক অবস্থা। সুরেন্দ্রমোহন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এই কাজটি তাঁকে এনে দিতে পারে আজীবনের অধরা সম্মান, দীর্ঘ গবেষণাজীবনের চূড়ান্ত পারিতোষিক। তাই সুরেন্দ্রমোহন কোনওভাবেই এই কাজটিকে ব্যর্থ হতে দিতে চান না।

প্রভার কাছেও এই কাজটি একটি বিরাট সুযোগ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। প্রাইজের আকাঙ্ক্ষা নয়, তার মনকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছে সত্যসন্ধানের সম্ভাবনা। এ কাজ যদি সফল হয় তবে প্রভা পারবে সেই পথে প্রথম পদক্ষেপটি করতে। আবাল্য লালিত স্বপ্ন সত্যি হবে তার। অতিক্ষুদ্র মেসোট্রন কণার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হবে মহাবিশ্বের রহস্যভাণ্ডার। অমোঘ সজ্জাশৃঙ্খলের একটি প্রান্ত ছুঁতে পারবে সে।

অত্যন্ত উৎসাহভরেই কাজ শুরু করেছিল প্রভা। কিন্তু বছর ঘুরে গেলেও কাজের কাজ তেমন কিছু হয়নি। প্রভা নিজেও হতাশ। আর আশানুরূপ ফলের দেখা না পেয়ে সুরেন্দ্রমোহনও বিরক্ত হয়ে উঠছেন ক্রমে। তারপরেই আজকের এই ঘোষণা। সুরেন্দ্রমোহন আবার বললেন, "আমি নিজে যাব প্লেট নিয়ে। আর মনোজকেও যেতে হবে। ওর কাজ অবশ্য অন্য। তবু তোমাকে আমি যেতে বলতে পারি না দার্জিলিং-এ। কিন্তু প্লেট রাখতে হবে সেখানে। নইলে পুরো কাজটাই নষ্ট।" এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান অধ্যাপক।

একমুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রভা। তারপর চমক ভেঙে সে-ও ছোটে স্যারের পিছন পিছন। ঘরের মধ্যে ঈর্ষাদগ্ধ হৃদয়ে আর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে একলা দাঁড়িয়ে থাকে মনোজ।

* কণাটিকে প্রাথমিকভাবে মেসোট্রন বলা হলেও পরে এই কণাটির নাম নির্দিষ্ট হয় মেসন।



এপ্রিল ১৯৩৯, দার্জিলিং

ব্যাজার মুখে আর অস্থির মনে মালপত্র নামানোর তদারকি করছিল মনোজ। মাত্রই কয়েকঘণ্টা হল তারা দার্জিলিং-এ এসে পৌঁছেছে। দীর্ঘ পথযাত্রায় সুরেন্দ্রমোহনের শরীর কাবু হয়ে পড়েছে। তার উপরে ঠান্ডা লেগে জ্বর-জ্বর ভাব। মায়াপুরীতে পৌঁছেই প্রৌঢ় অধ্যাপক নিজের ঘরে চলে গিয়েছেন। মনোজকে দিয়ে গিয়েছেন গাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি নামিয়ে ঠিকঠাক জায়গায় রাখার দায়িত্ব।

দু'জন পাহাড়ি কুলি মিলে সে-সব করছে আর পাশেই দাঁড়িয়ে দেখছে মনোজ। বলদ সে একটা, মনোজ ভাবে। বলদের কাজ করার জন্যই তাকে নিজের কাছে রেখেছেন সুরেন্দ্রমোহন। প্রথমে আসল কাজটা দিয়েছেন ওই প্রভাকে আর তাকে দিয়েছেন অকিঞ্চিৎকর একখানি কাজ। আবার তার উপরে তাকে টেনে নিয়ে এসেছেন এই দার্জিলিং-এ। প্রভার কাজের সুরাহা হবে। যেন মনোজের নিজের কাজের কোনও দাম নেই। হঠাৎই একটা বিশেষ কাঠের প্যাকিংবাক্স দেখে হাঁ-হাঁ করে উঠে একটা কুলিকে ধমক দিল মনোজ। এই প্যাকিংবাক্সে রয়েছে সুরেন্দ্রমোহন আর প্রভার প্রাণভোমরা। ইলফোর্ড কোম্পানির ফুলটোন ফোটোগ্রাফিক প্লেট। ইংল্যান্ড থেকে বাক্সবন্দি হয়ে এসেছে ভারতবর্ষে।

মনোজের কানে এখনও বাজছে সুরেন্দ্রমোহনের বলা কথাগুলো। দার্জিলিং রওনা

হওয়ার কয়েকদিন আগে প্রভা আর মনোজ দু'জনকেই নিজের ঘরে ডেকেছিলেন স্যার। দু'জনেই আন্দাজ করেছিল কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। অধ্যাপকের স্বভাবগম্ভীর মুখ আজ যেন একটু বেশিই গম্ভীর। অবশ্য নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস দু'জনের কারও হয়নি। দু'জনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছে সুরেন্দ্রমোহনের টেবিলের সামনে।

সুরেন্দ্রমোহন দু'জনের দিকে তাকালেন কিছুক্ষণ। তারপর থেমে থেমে বললেন, "তোমরা দু'জনেই ভালো করে জেনে রাখো, এই কাজটা আমাদের ল্যাবরেটরির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও চুক যেন না হয়। ফোটোগ্রাফিক প্লেটের দাম অনেক, সেগুলো যেন সাবধানে ব্যবহার করা হয়। বিশেষত ফুলটোন প্লেটগুলো।" তারপর এক মুহূর্তের বিরাম দিয়ে প্রভার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভা, ফুলটোন প্লেট ক'টা আছে আমাদের?"

প্রভা একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়, "খুব বেশি না স্যার, হাতে গোনা কয়েকটাই।" প্রফেসরের মুখে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে, "আর হাফটোন প্লেট?" "ওটা অনেক আছে স্যার।" প্রভা মাস্টারমশাইকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু সুরেন্দ্রমোহনের ভ্রু কুঞ্চিতই হয়ে রয়েছে। চিন্তিত স্বরেই তিনি বললেন, "সে ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের আসল দরকার ফুলটোন প্লেট। এ দিকে ইংল্যান্ড থেকে প্লেট আনানো যাচ্ছে না এখন। যুদ্ধ বাধতে পারে। সে বাধুক আর না-ই বাধুক, ফোটোগ্রাফিক প্লেট পাঠানো বন্ধ এখন ওদেশ থেকে।"

মনোজ বুঝতে পেরেছে এতক্ষণে ব্যাপারটা। ফুলটোন প্লেটের দুইদিকে রাসায়নিক প্রলেপ মাখানো থাকে। হাফটোন প্লেটের একদিকে। প্লেটগুলোকে খাড়া করে লম্বালম্বি বসানো হয়। ফুলটন প্লেটের দুইদিকেই মহাজাগতিক রশ্মি আপতিত হয়, কণাগুলির সঞ্চারপথের ছাপ পড়ে দু'পাশেই। অন্যদিকে হাফটোনে ব্যাপারটা ঘটে প্লেটের একদিকেই। ফলে ওই কণাদের চিহ্নিতকরণ অথবা ভৌতধর্ম বিশ্লেষণ ফুলটোন প্লেটে যতখানি ভালো হয়, হাফটোনে তা হয় না।

মনোজের মনে ক্রমে উল্লাস দানা বাঁধে। বিজ্ঞানের যে-কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একাধিকবার তথ্যসংগ্রহের দরকার হয়। যত বেশিবার পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে, ততই কমবে ভুলের সম্ভাবনা— সহজতর হবে সঠিক মান নির্ধারণ। কিন্তু হাতে গোণা কয়েকটা ফুলটোন প্লেট নিয়ে প্রভা চৌধুরী আর কী-ই বা করতে পারবে।

মনোজের অট্টহাস্যে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সে অবিচলিত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সহজভাবেই। তবে তার এই খুশি বেশিক্ষণ থাকেনি। সুরেন্দ্রমোহনের দৃষ্টি এবার ঘুরে গেছে ছাত্রের দিকে। "শোনো মনোজ, মালপত্র-যন্ত্রপাতি সব তোমার দায়িত্বে থাকবে। বিশেষ করে ফুলটোন প্লেটগুলো। ওগুলোর খেয়াল রাখবে।" শুনে পর্যন্ত মনোজের পিত্তি জ্বলে রয়েছে। তার উপরে মেয়েটাও এসেছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

একে তো শয়তান মেয়েটা মনোজের কাজ, মনোজের ভবিষ্যতের আশা সমস্তই ছিনিয়ে নিয়েছে। মনোজ ভেবেছিল ক'দিন দার্জিলিং-এ এসে একটু হাঁফ ছাড়া যাবে, প্রভার উপস্থিতি একেবারেই সহ্য করতে পারছে না সে। কিন্তু বিধি বাম। কী ডাকাবুকো মেয়ে এই প্রভা! চলে এসেছে দার্জিলিং-এ। বাবা-মা কেউ নেই, পরিবারের কেউ নেই সঙ্গে— চলে এসেছে একা একা। মনোজ এতটাও ভাবতে পারেনি। তেমন বাপ-মা নির্ঘাত। নির্লজ্জ মেয়েছেলের জন্ম দিয়েছে একখানা। মনোজ মনে মনে অভিশাপ দেয় প্রভার জন্মদাতা-জন্মদাত্রীকে।

মেয়েটা অবশ্য এসে দাঁড়িয়েছিল একটু আগে এখানে। ন্যাকামো করে আবার বলেওছে, "মনোজদা আমি বরং দেখছি এ দিকটা। অনেকটা ধকল গেছে তোমার। তুমি বরং বিশ্রাম নাও।" মনোজ যেন বোঝে না এসব ঢং। সঙ্গে সঙ্গে শয়তান মেয়েটার উদ্ধারকর্তা হয়ে চলে এসেছেন সুরেন্দ্রমোহন। "না না, তোমার এখন কিছু করতে হবে না। এসব কাজ মনোজ সামলে দেবে। তুমি বিশ্রাম নাও এখন। তোমার আসল কাজ পরে শুরু হবে।" প্রভাও বাধ্য মেয়েটির মতো চলে গেছে নিজের ঘরে। যাওয়ার সময় আবার ভাব দেখাচ্ছিল, যেন কতই অনিচ্ছা তার যেতে। মনোজ মনে মনেই দাঁত কিড়মিড় করেছিল, কিন্তু কিছু বলবে এমন বোকা সে নয়।

মনোজের এখন ইচ্ছা করছিল ফুলটোন প্লেটের প্যাকিং বাক্সটা নিয়ে সপাটে এক আছাড় মারে। টুকরো টুকরো হয়ে যাক পাতলা কাঁচের প্লেটগুলো, তার সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাক ওই শয়তান মেয়েটার সমস্ত বদবুদ্ধি আর ইতরামি। কিন্তু তা করার উপায় নেই— মনোজের মনে পড়ল সুরেন্দ্রমোহনের মুখ। অবরুদ্ধ ক্রোধের উচ্ছ্বাস সামলে সে কুলিটাকে দেখিয়ে দিল কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে ফোটোগ্রাফিক প্লেটের বাক্সগুলো।

* * *

বিকেলবেলা একটু হাঁটতে বেরিয়েছিল প্রভা। অনেকটা ঘুমিয়ে উঠে গা-হাত-পা ম্যাজ ম্যাজ করছে কেমন। শাল-মাফলার জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। মায়াপুরী রিসার্চ সেন্টারখানা পাহাড়ি শহরের বেশ উঁচুর দিকেই। বিসর্পিল পথ নেমে গিয়েছে নীচে বাজারের পানে। বেলা ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের যাতায়াত কমে আসছে। প্রভা অবশ্য সঙ্গে টর্চলাইট নিয়েছে একখানি। সে কখনও দার্জিলিং-এ আসেনি। আসার ইচ্ছে ছিল বরাবরই খুব। কিন্তু সে আসা যে এমনভাবে হবে— এ তার ধারণাতেও ছিল না কখনও।

সে-দিন দার্জিলিং-এ যাওয়ার ঘোষণা করে সুরেন্দ্রমোহন যখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন ল্যাবরেটরি ছেড়ে, প্রভাও ছুটেছিল পিছন পিছন। স্যারকে পিছন থেকে ডেকে সে যা বলল, তা শুনে সুরেন্দ্রমোহনের মুখ হাঁ হয়ে গেল। "তুমি যাবে? কী বলছ কী প্রভা? আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না খেয়াল রেখো। অতো দূরে ফ্যামিলি ছাড়া কিছু হয়ে গেলে সে-দায়িত্ব কে নেবে?" সুরেন্দ্রমোহন মাথা নেড়েছিলেন। অনেক কষ্টে প্রভা তাঁকে রাজি করিয়েছিল একটিই শর্তে— মধুসূদন নিজে সুরেন্দ্রমোহনকে চিঠি লিখে অনুমতি দেবেন।

সুরেন্দ্রমোহন যতটা সমস্যা করেছিলেন, মধুসূদন ঠিক ততটাই সহজে রাজি হয়ে গেলেন। শান্তা একটু গাঁইগুঁই করছিলেন, কিন্তু স্ত্রীকে সামলেছেন মধুসূদনই। "সুরেন যাচ্ছে তো। তা ছাড়া মেয়েটার জন্য এটা একটা মস্ত বড়ো সুযোগ। কাজটা লেগে গেলে দারুণ ব্যাপার হবে। তুমি ওকে বারণ কোরো না।" মধুসূদনের ফোন পেয়ে সুরেন্দ্রমোহনও রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। বাবা-মাকে প্রণাম করে, ভাই দু'টির সঙ্গে খুনসুটি করে তাদের জন্য দু'টি পাহাড়ি বউ নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রভা রওনা হয়েছিল। কিন্তু মনের মধ্যে খচখচ করছিল একটাই বিষয়, অমিয়কে বলে যাওয়া হল না।

হতভাগা ছেলেটার কোনও পাত্তাই নেই দু'মাস ধরে। চলে গেছে আবার সে নির্ঘাত কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে, সংগঠন করছে, মানুষের মাঝে মাঝে ঘুরছে মা-বাপ, পরিবার ফেলে। আগেও এমন গিয়েছে অমিয়। কিন্তু এতদিন বেপাত্তা হয়ে থাকেনি কখনও। সবথেকে বড়ো কথা, আগে যখনই গিয়েছে এমন করে, প্রভার সঙ্গে একবার দেখা করে গেছে, প্রভাকে জানিয়ে গেছে। অনেকটা যেন অনুমতি চাইবার ভঙ্গি

থাকত অমিয়র বলার ধরনে। অমুক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে বা তমুক জায়গায় সংগঠনের কাজ আছে— এটুকু বলেই ঘাড় বেঁকিয়ে প্রভার মুখের দিকে চাইত মিটমিট করে।

প্রভার হাসিই পেত। এত বড়ো একটা ছেলে যেন তার কাছ থেকেই অনুমতি নেবে বলে এসেছে। ছন্নছাড়া বাঁধনহারা অমিয় বাপ-মা-বোনের কথা ভাবে না। গৃহকোণের আশ্রয় তাকে টেনে রাখতে পারে না। প্রভা তার কে-ই বা হয় যে তার অনুমতির জন্য অমিয়র এত আগ্রহ?

প্রভা সতর্ক কণ্ঠে বলত, "এবার কিন্তু অনেক বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছে। এই সব সম্মেলন-সংগঠন দিনদিন বেড়েই চলেছে দেখছি।" অমিয় প্রভার কথা শুনে স্মিত হাসত নিরুত্তরে। প্রভা রেগে গিয়ে বলত, "পুলিশে ধরে নিলে তো ল্যাঠা চুকেই যাবে। কিন্তু আদাড়ে-বাদাড়ে নিউমোনিয়া ধরলে সর্বনাশ বেশি আরও।" প্রভার রাগ দেখে অমিয় একবার বলেছিল, "আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ এই আদাড়ে-বাদাড়েই ঘুরে ঘুরে মরে যাচ্ছে প্রভা, কে-ই বা তার খবর রাখে বলো। আমারও না-হয় সে দশাই হবে। কত মানুষের খোঁজ নেওয়ার কেউ থাকে না, আমি তো তাও তোমাকে বলে গেলাম না-হয়।"

সেই অমিয় প্রভাকে কিছু না বলেই বেপাত্তা হয়ে গেল? ইদানীং বসু বিজ্ঞান মন্দিরে চলে আসার পরে সায়েন্স কলেজে আর যাওয়া হয় না বেশ কিছুদিন। স্বাভাবিকভাবেই অমিয়র সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও কমে গিয়েছিল প্রভার। দার্জিলিং যাওয়ার খবরটা দেব ভাবল, ছেলেটা তার আগেই বেপাত্তা। বলেও গেল না ছেলেটা, প্রভাও বলতে পারল না অমিয়কে কিছু।

আপনমনে এইসব ভাবতে ভাবতেই অনেকটা চলে এসেছিল প্রভা। সন্ধ্যা নামবে শিগগিরই। পাহাড়ি রাস্তার একটা বাঁক সামনে। সেটা পেরোতেই ছোটো একটা বস্তি। একটা কালী মন্দির রয়েছে। রয়েছে একটা মুদির দোকান, পাশে একটা ঘুপচি খাবারের দোকানও। দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে টাটকা খাবারের সুঘ্রাণ ভেসে এল। অচেনা গন্ধ, কিন্তু ভারী লোভনীয়। খিদে পেয়েছে প্রভার। বিকেলে কিছু না খেয়েই বেরিয়েছে সে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দোকানের সামনে। পাহাড়ি খাবার একটু চেখেই দেখা যাক। টাকাপয়সা যথেষ্টর থেকেও বেশি দিয়ে দিয়েছেন মধুসূদন। আর বটুয়াটাও সঙ্গে রয়েছে।

বাঙালি দিদিমণি দেখে ভুটিয়া দোকানদার ভারী যত্ন করে বসতে দিল। হিন্দির

সঙ্গে ভাঙা বাংলা মিশিয়ে তড়বড় করে জানাল, এইমাত্র উনুন থেকে নেমেছে সেল রোটি আর আলুর আচার। মন্দিরে পুরোহিত পুজো শেষ করেছেন। থালা হাতে বেরিয়ে এসে প্রসাদ দিচ্ছেন পুজো দিতে আসা ভক্তদের। ধোঁয়া ওঠা খাবারের প্লেট খিদেটা বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রভার। সেল রোটির একটুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে আসা একটা অদ্ভুত খড়খড় শব্দে চমকে উঠল সে।

দোকানদারও শুনেছে শব্দটা। চুলহা ছেড়ে বাইরে এসে সে প্রভাকে আশ্বস্ত করে বলল, ও ভয়ের কিছু নয়। একটা বাঙ্গালি পাগল কয়েকদিন হল তল্লাটে এসেছে। ঠান্ডায় মরে যাবে, তাই দোকানদার দোকানের পিছনের ঘেরা জায়গাটায় থাকতে দিয়েছে। দু'বেলা মন্দিরের প্রসাদ পায়, রাতে দোকান বন্ধ করার সময় উদ্বৃত্ত যা থাকে সে-সবও খায়। রাতে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে পড়ে থাকে উনুনের পাশে। পুরোহিতের প্রসাদ বিতরণের সময় হয়েছে, তাই ওই কোণ ছেড়ে পাগলটা বেরিয়েছে। সেই হাঁচোড়-পাঁচড়েরই শব্দ ওটা।

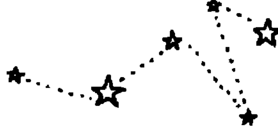
প্রভা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দাঁড়িগোঁফ আর চুলের জঙ্গল নিয়ে একটা মানুষ খোঁড়াতে খোঁড়াতে দোকানটার পিছন থেকে বেরিয়ে মন্দিরের দিকে যাচ্ছে পা টেনে টেনে। ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত একটা অবয়ব। পরনের পোশাকের কোনও ছিরিছাঁদ নেই। ছেঁড়াফাটা পাতলুন একখানি নিম্নাঙ্গে। ঊর্ধ্বাঙ্গে তথৈবচ একটি সোয়েটার আর শতছিন্ন চাদর তার উপর। মন্দিরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাগল, বারান্দায় ওঠেনি বাকিদের মতো। পুরোহিত এসে তার বাড়ানো হাতে একটু উপর থেকেই দিলেন প্রসাদ, না ছুঁয়ে। পাগল দু'হাতের আঁজলা ভরে নিয়েছে প্রসাদ ভারী ব্যগ্র হয়ে। হাউহাউ করে খাচ্ছে।

প্রভার কেন কে জানে, ভারী মায়া হল পাগলটাকে দেখে। বাঙালির ছেলে। কে জানে কোন দুর্বিপাকে পড়ে আজ এই অবস্থা হয়েছে। খুব বেশি বয়েস কি? মনে হয় নয়। বাড়ি ঘর থেকে এত দূরে এইভাবে পড়ে রয়েছে, অজানা অচেনা জায়গায় অপরিচিত মানুষের দয়ার উপর নির্ভর করে, প্রভার মন আর্দ্র হয়ে উঠল। দোকানদারটাকে ডেকে সে বলল, "ওকে ডেকে বসাও দেখি এখানে। এক প্লেট খাবার দাও। আমি দাম দিচ্ছি।"

দোকানদার রাজি নয়। সন্ধেবেলা পথ চলতি খদ্দেরের টাইম। পাগল দেখলে তারা আসবে না কেউ আর। অবশ্য ডবল টাকার কড়ারে শেষপর্যন্ত দোকানি রাজি হয়েছে। পাগলটাকে গিয়ে নিয়ে এসেছে দোকানের সামনে। পাগল মানুষ, আসতে চাইছিল না

মোটে। বিস্তর সাধাসাধি করে তাকে দোকানের সামনের বেঞ্চে এনে বসাতে হয়েছে। দোকানের কুপির আলোতে ভালো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রভা বুঝতে পারল বয়েস বেশি নয় এই ছন্নছাড়া মানুষটার। মাথা নিচু করে বসে আছে, দৃষ্টি মাটির দিকে। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে প্রভা। ছেলেটার হাবভাবে কিন্তু মানসিক বৈকল্যের কোনও চিহ্ন নেই। মনে মনে ভাবল প্রভা, এ কি সত্যিই পাগল?

খাবার তৈরি করে ফেলেছে দোকানি ততক্ষণে। প্রভা নিজেই উঠে গিয়ে প্লেটটা নিল, তার পর এসে দাঁড়াল ওই পাগলের সামনে। খুব নরম গলায় ডেকে বলল, "শুনছেন, শুনুন— এই খাবারটা খেয়ে নিন একটু।" পাগল মুখ তুলে তাকাল প্রভার দিকে। এইবার দোকানের বাতির ক্ষীণ রশ্মি তার মুখে এসে পড়েছে সোজা। আলোকদৈন্য এবং শ্মশ্রুভার সত্ত্বেও প্রভা চিনে ফেলেছে তাকে। তার হাতের প্লেট ঠক করে মাটিতে পড়ে খাবারগুলোকে ছড়িয়ে ফেলেছে চারদিকে। প্রভা মুখ দিয়ে একটা আর্তস্বরে বেরিয়ে এসেছে, "অমিয়! তুমি?"



জুন ১৯৪২, কলকাতা

কাগজের উপর খসখস করে চলছে প্রভার কলম। অসহ্য গরমে সে ঘেমে উঠেছে, কপালে ঘামের ধারা। কিন্তু লেখাটা তাকে শেষ করতে হবেই। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখানে আর সে থাকতে পারছে না। প্রভার কাছে নরক হয়ে উঠেছে বসু বিজ্ঞান মন্দির।

এটা একটা ছোটো ঘর। বৃহদাকার ল্যাবরেটরি নয়, প্রশস্ত লাইব্রেরি-ঘর নয়, এমনকি গবেষকদের পড়ালেখা করার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিও নয়। একটা দশ ফুট বাই পনেরো ফুটের ঘর। ব্যবহার হয় ভাঙা চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ডাঁই করে রাখার জন্য। জানালার কোনও বালাই নেই, হাওয়া চলাচল বলতে ছাদের লাগোয়া একটা ঘুলঘুলি।

এখানেই একটা ভাঙা বেঞ্চ ঝেড়ে মুছে এককোণে বসেছে প্রভা। লিখছে গবেষণাপত্র। ল্যাবরেটরিতে তার প্রবেশাধিকার নেই আর এখন। গত দুই বছর ধরেই সুরেন্দ্রমোহন তাকে ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছেন। লাইব্রেরিতেও ঢুকতেও বারণ করে দিতেন— কিন্তু সেখান থেকে বই, জার্নাল নিয়ে লেখার কাজ করতে হয়। লাইব্রেরির সাহায্য না পেলে গবেষণাপত্রই লেখা যাবে না। তাই প্রভাকে লাইব্রেরি যেতে হয়, প্রয়োজনীয় বইপত্র নিয়ে সে এখানে চলে আসে, লেখালেখির পরে আবার গিয়ে ফেরত দিয়ে আসে লাইব্রেরিতে।

ঘরের সামনে দিয়ে চলে গেল কয়েকজন রিসার্চ স্টুডেন্ট। ঘরের দরজা খোলাই রাখতে হয়, না-হলে দম বন্ধ হয়ে আসে। প্রভাকে আপনমনে কাজ করতে দেখে নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করতে করতে চলে গেল ছেলেগুলো। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সকলেই জানে প্রভা চৌধুরীর বেশিদিন নেই আর এখানে। সে শাস্তিযাপন করছে এখন। অবশ্য তাতে খুশি বেশিরভাগ লোকই। একটা মেয়ে এসে ড্যাং-ড্যাং করে রিসার্চ করবে, তাও সেটা আবার অধিকর্তা সুরেন্দ্রমোহন বোসের কাছে—অধিকাংশেরই ব্যাপারটা হজম হয়নি। এখন প্রভার পিছনে লোকে বলাবলি করে, "বেশ হয়েছে, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।" সবসময়েই যে পিছনে হয় এসব কথাবার্তা, তা নয়। সামনেও হয়। প্রভা নিজেই শুনতে পেয়েছে কতবার!

অতি লোভ? প্রভা হাসে মনে মনে। মূর্খ ইতরমনা মানুষ সব, এর বেশি আর কী-ই বা ভাবতে পারবে? সারাজীবন গবেষণার স্বপ্ন দেখে এসেছে প্রভা। অমিয় যেমন রসিকতা করে বলত, "মেয়েটার মাথায় কেবল তারাদের চিন্তা, মগজের মধ্যে ছায়াপথ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" কিন্তু সত্যিই যখন গবেষণার জগতে পা রাখল প্রভা, দেখল ধরাতলের ক্লেদকর্দমমালিন্যের কিছু কমতি নেই মহাবিশ্বের রহস্যসন্ধানী বিজ্ঞানীদের মধ্যে। সাধারণ অজ্ঞ নির্বোধ মানুষের মতোই এইসব 'বিজ্ঞানসাধক'দের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। অনেকক্ষেত্রেই বরং এইসব রিপুর প্রাবল্য সাধারণ মানুষের থেকেও অনেক বেশি এঁদের মধ্যে, প্রভা লক্ষ করেছে।

তবে তাঁতি নষ্ট যে হয়েছে সে-কথা একশোবার সত্যি। এখন এই গরমে আধাসেদ্ধ হতে হতে যে-পেপারটি লিখছে প্রভা, সেটাই এই বসু বিজ্ঞান মন্দিরে তার শেষ কাজ। এই পেপারটা লেখা শেষ হলে তার আর ঠাঁই নেই এখানে। এ কথাটা সুরেন্দ্রমোহন বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন ছাত্রীকে। এই প্রত্যাখ্যানের বিপুল ভার মাথায় নিয়েই প্রভা অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে গত দুই বছর ধরে।

জুতোর মশমশ শব্দে প্রভা মুখ তুলে তাকাল। সুরেন্দ্রমোহন ঘরে ঢুকছেন। বেশ একটু অবাক হয়েই উঠে দাঁড়াল প্রভা। সুরেন্দ্রমোহন তো এ ঘরে আসেন না কখনও, দরকার হলে কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠান প্রভাকে নিজের ঘরে। সে সাক্ষাৎগুলিও হয় শীতল, অস্বস্তিকর। প্রভার মুখ যে-অধ্যাপক আর দেখতে চান না প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিবারও, সেটা তার হাবেভাবেই পরিষ্কার। দু'বছরে প্রফেসর বোস এই ঘরে পা দিয়েছেন মাত্রই দু'বার। প্রভার লেখা দু'টি গবেষণাপত্র 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময়। তা হলে কি?

প্রভার অনুমানই সঠিক। তৃতীয় পেপারটিও 'নেচার' গ্রহণ করেছে প্রকাশনার যোগ্য বিবেচনা করে। সেই খবরটিই সুরেন্দ্রমোহন দিতে এসেছেন ছাত্রীকে। গম্ভীর গলায় বললেন, "থার্ড পেপারটা অ্যাকসেপ্টেড। এটার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করো and be gone. I want to put an end to this Mistake once and for all." প্রভার স্তম্ভিত চোখের সামনে দিয়ে যেমন এসেছিলেন, তেমনই বেরিয়ে চলে গেলেন সুরেন্দ্রমোহন।

অবশ্য প্রভা খুব যে অবাক হয়েছে তা নয়। বরং এরকম কিছুই আশা করছিল সে অধ্যাপকের কাছ থেকে। গত দুই বছরে এরকম ব্যবহার অনেকটাই সহনীয় হয়ে উঠেছে। তবুও মানুষের হৃদয়, একেবারে কি আর পাথর হয়? প্রভার চোখের কোণ থেকে অবাধ্য একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। সচকিতে ফোঁটাটি মুছে নিল সে। এ সমাজে মেয়েদের প্রকাশ্যে কাঁদবারও অধিকার নেই। কেউ দেখে ফেললে আবার শুরু হয়ে যাবে বিদ্রুপবর্ষণ।

'Mistake'? হ্যাঁ, 'Mistake' তো বটেই। যে কাজটি ঠিকঠাক উতরোলে সুরেন্দ্রমোহনের নোবেল পাওয়ার আশা উজ্জ্বল হয়ে উঠত, সেই কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। 'নেচার'-এ কতকগুলি গবেষণাপত্র ছেপেই সুরেন্দ্রমোহনকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। নাকের বদলে নরুণ পেয়ে অবশ্য সন্তুষ্ট হতে পারেননি অধ্যাপক। আর সে-জন্যই প্রভার এই শাস্তি।

সি ভি রামন, মেঘনাদ সাহার সঙ্গে একাসনে বসতে পারলেন না সুরেন্দ্রমোহন। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নাম খোদাই করে রাখা হল না তাঁর। কিন্তু সে-ইতিহাসে কোথাও লেখা থাকবে না নিজের ছাত্রী প্রভা চৌধুরীর 'Mistake' এ প্রফেসর সুরেন্দ্রমোহন বোস নোবেল পাওয়ার সুযোগ হারিয়েছিলেন। এখন সুরেন্দ্রমোহন আদৌ নিশ্চিত নন যে তাঁর নাম আদৌ উত্তরপ্রজন্মের গবেষকরা মনে রাখবে কি না।

প্রভা লিখতে বসেছে ফের। ফোটোগ্রাফিক প্লেট থেকে পাওয়া কণা সঞ্চারপথ বিশ্লেষণ করে সে নিবন্ধ লিখছে। এ কথা ঠিক যে, নতুন ধরনের কণার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। এ কথাও ঠিক যে, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে বোঝা যায় সে-কণাগুলির ধর্ম ইউকাওয়া প্রস্তাবিত কণাদের মতোই। হয়তো যে একেবারে সেই কণাই— কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলার মতো তথ্য প্রমাণ নেই প্রভার কাছে। থাকতে পারত, যদি মহাজাগতিক রশ্মির আপতন ধরা যেত ফুলটোন প্লেটে। প্রভা সেখানে

ব্যবহার করেছে হাফটোন প্লেট।

হাফটোন প্লেট ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল প্রাথমিক বিশ্লেষণের জন্য। প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানী নিরীক্ষাগুলির জন্য রাখা হয়েছিল সামান্য কয়েকটি ফুলটোন প্লেট। অপদার্থ প্রভা চৌধুরীর অসাবধানতায় উঁচুতে রাখা ফুলটোন প্লেটের প্যাকিং বাক্সটা আছড়ে পড়েছে মেঝেতে। 'Mistake'। ওই একটি 'Mistake'-এ কাঁচের ফোটোগ্রাফিক প্লেটগুলোর সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে সুরেন্দ্রমোহনের বহুবর্ষলালিত স্বপ্নও।

হাফটোন প্লেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি 'নেচার'-এ ছাপার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। ফুলটোন প্লেটের অভাবে যথেষ্ট প্রমাণ হাতে না পাওয়াও প্রভা ইউকাওয়া ও তাঁর কাজের উল্লেখটুকুও করতে পারেনি নিজের নিবন্ধে। এই অর্ধসমাপ্ত পরীক্ষাগুলি নিজে কোনও গবেষণাপত্র লেখার ইচ্ছেও ছিল না প্রভার। কিন্তু সুরেন্দ্রমোহনের ইচ্ছা ভিন্ন। যেটুকু পাওয়া যায়, যতটুকু নিংড়ে নেওয়া যায়— প্রভা চৌধুরীকে তিনি নিংড়ে নেবেন।

প্রভা জানে এদেশের বিজ্ঞানীদের মনোভাব সেরকমই। গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, রয়েছে শুধু মানবসম্পদ। ল্যাবরেটরির অধীশ্বরের অধীনে কাজ করতে থাকা কিছু দাস। তাদের নিঃশর্ত শ্রম দিয়েই অর্থ ও প্রযুক্তির অভাবের দিকটা ঢেকে দিতে চান এদেশের বেশিরভাগ বিজ্ঞানী।

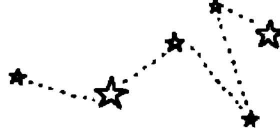
প্রভা আর এদেশে কারও অধীনে গবেষণা করবে না। সে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে, পরিবর্তন দরকার। প্রীতিদিদি দেশের শাসক বদলাতে চেয়েছিল। অমিয় চেয়েছে ভুখা মানুষের অবস্থা বদলাতে। প্রভা বোঝে মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন আনাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেটাই আগে আনা দরকার। প্রভা বিদেশেই যাবে গবেষণা শেষ করতে। তারপর ফিরে আসবে দেশেই আবার। পরিবর্তন আনবে ভারতের বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান গবেষকদের মানসিকতায়। অন্তত চেষ্টা করবে প্রাণপণ, সে ঠিক করে নিয়েছে।

অনেক আগেই সে ছেড়ে চলে যেত বসু বিজ্ঞান মন্দির। ছেড়ে যেত সুরেন্দ্রমোহনের ল্যাবরেটরি। বাদ সেধেছে দুটো বিষয়। যুদ্ধ বেধেছে ইউরোপে। প্রভার দার্জিলিং থেকে ফেরার মাস কয়েকের মধ্যেই। সে যুদ্ধ এখন সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল হয়ে। এখন ইউরোপে যাওয়া সম্ভব নয়।

তবে দ্বিতীয় কারণটিই আসল। সুরেন্দ্রমোহন প্রভাকে বলেছেন কাজ শেষ করে

গবেষণাপত্র লিখে না দিয়ে গেলে তিনি তাকে রেকমেন্ডেশন লেটার বা শংসাপত্র দেবেন না কোনওমতেই। আর এতদিন ধরে প্রভা যাঁর অধীনে কাজ করেছে, তাঁর শংসাপত্র ছাড়া প্রভাকে কেউ নতুন করে গবেষণার সুযোগও দেবে না।

প্রভা মাথা নিচু করে কলম চালাতে থাকে। তার গাল বেয়ে কাগজের উপর টুপ করে ঝরে পড়ে এক ফোঁটা জল। সে-বিন্দুটি অশ্রু নাকি স্বেদ— বলা মুশকিল।



এপ্রিল ১৯৩৯, দার্জিলিং

রাত ন'টা বেজে গেছে। সারভ্যান্ট কোয়ার্টারের একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে একটা ক্যাম্পখাটে অমিয় ঘুমিয়ে আছে। মাথার পাশে একটা ছোট্ট তেপায়া টুলে রাখা হ্যারিকেনের আলোটা কমিয়ে দিয়েছে প্রভা। নিজে সে বসে আছে খাটের পাশেই একটা চেয়ারে। পেট ভরে খেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে অমিয়। তার নিশ্চিন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল প্রভা। তার খুব ইচ্ছে করল ঘুমন্ত ছেলেটার রুক্ষ-শুষ্ক, বহুদিনের তেলজল না পড়া চুলে একবার হাত বুলিয়ে দেয়।

অনেকদিন পরে বিশ্রাম পেয়েছে অমিয়। দু'মাস ধরে অবিশ্রান্ত পালিয়ে বেড়িয়েছে সে উত্তরবঙ্গের পথে পথে। পেটভরা তো দূরস্থান, অনেকদিন খাবার পর্যন্ত জোটেনি। খাট-বিছানা তো স্বপ্নকল্পনা ছিল। রাস্তায় রাস্তায়, প্রত্যন্ত গ্রামের বটতলায়। প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সে শহর-বাজার থেকে দূরে চলে যেতে। মালদা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি অতিক্রম করে বহু কষ্টে সে পৌঁছেছে দার্জিলিং।

বাড়ি ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মালদা-র ঘটনা বিরাট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাংলায়। পুলিশের গুলিতে অনেক কর্মী হতাহত হয়েছে তো বটেই, কিন্তু সেই বোমা বিস্ফোরণে মারা গিয়েছে তিনজন কনস্টেবল। কলকাতা পুলিশ, বেঙ্গল পুলিশ খ্যাপা

কুকুরের মতো হন্যে হয়ে খুঁজছে নেতাদের। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আই বি-র টিকটিকির দল। ছাড়বে না ওরা কাউকে।

অমিয় ঠিক নেতা নয় বটে, কিন্তু বহুদিন ধরে পার্টি করার সুবাদে গোয়েন্দাদের খাতায় তার নাম রয়েছে। পুলিশ খুঁজছে তাকেও। চাকুলিয়ায় একজন পূর্বপরিচিত কমরেডের বাড়িয়ে আশ্রয় পেয়েছিল দিন-দুয়েকের জন্য। সেখানেই সে শোনে এসব। দক্ষিণের দিকে ফিরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। চাকুলিয়াতেও সে থাকতে পারবে না। তাকে যেতে হবে উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলে। দার্জিলিং, কালিম্পং— সম্ভব হলে সিকিম।

হ্যাঁ সিকিমই ভালো, অমিয় ভেবেছে। ওখানে চোগিয়াল রাজাদের শাসন, ব্রিটিশের পুলিশের অত দবদবা নেই। সিকিম ঢোকা মুশকিল হবে অবশ্য সমতলের লোকের পক্ষে। তাই অমিয় পাগল সেজেছে। পাগলের শত্রু নেই। লোকের দয়ায় খাবার-দাবার ঠিকই জুটে যায়, কখনও-সখনও আশ্রয়ও।

হাঁপাতে হাঁপাতে, কাশতে কাশতে এসব কথা অমিয় বলেছে প্রভাকে। প্রভা বন্ধুর কথা শুনতে শুনতেই তাকিয়ে দেখছিল তার চেহারার দিকে। স্বাস্থ্যবান অমিয় দুইমাসে একেবারে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে যেন। সারা গায়ে খড়ি, দাড়িগোঁফের জঙ্গল, পাগলের অভিনয় করতে করতে চোখের মধ্যেও কেন একটা শূন্যতা— সুস্থ নয় যেন সম্পূর্ণ সে-দৃষ্টি, প্রভার হঠাৎই মনে হল। তার বুকের ভিতরটা হু-হু করে উঠেছে। চোখে জল চলে আসছে তার। সেই বাঁধভাঙা আবেগ চেপে সে ধরা গলায় বলে উঠল, “আর বকতে হবে না, চুপটি করে শোও দেখি এখন। সকালের আগে বিছানা ছেড়ে উঠবে না একদম। আমি জলখাবার নিয়ে আসব।”

বাধ্য ছেলের মতো শুয়ে পড়েছে অমিয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে গেছে গাঢ় ঘুমে। তারপরে আরও অনেকক্ষণ অমিয়র মুখের দিকে চেয়ে বসে থেকেছে প্রভা। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে পিছনে দরজাটা বন্ধ করে। বাড়ির গিরিধারী বসে বিড়ি টানছে। প্রভাকে দেখে অর্ধদগ্ধ বিড়িটা ফেলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার সামনে এসে প্রভা বলল, “গিরিধারীদা, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি একটু খেয়াল রেখো। আমি সকালবেলা আসব।”

গিরিধারী প্রভার পুরোনো চেনা লোক। বিহার থেকে তার দাদামশায় সেই কোনকালে কলকাতায় এসে থানা গেড়েছিলেন, সেই থেকে তারা এখানেই। গিরিধারীর পদবি তাই পাঁড়ে হলে কি হবে, চলনে-বলনে সে একেবারেই বাঙালি। গিরিধারীর

বাপ বংশীধর পাঁড়ে সায়েন্স কলেজে ল্যাবরেটরির ছোটোমোটো কাজের জন্য বহাল হয়েছিল সেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আমলে। বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গিরিধারীও ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ল্যাবরেটরিতে চাকরি জুটিয়ে নেয়। তারপর সুরেন্দ্রমোহন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আসার সময় ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসী গিরিধারীকেও নিয়ে আসেন।

প্রভার কাছে গিরিধারী নানাভাবে উপকৃত। তা ছাড়াও শান্ত অন্তর্মুখী এই মেয়েটিকে সে নিজের বোনের মতোই ভালোবাসে। তাই প্রভাদিদির কাজের জন্য দার্জিলিং যেতে হবে শুনে সে খুশিমনেই রাজি হয়ে গিয়েছিল। আজ আঁধার নামার অনেকক্ষণ পরেও যখন প্রভা ফিরছিল না, গিরিধারী বেশ চিন্তাতেই পড়ে গিয়েছিল।

অসুস্থ সুরেন্দ্রমোহনকে গিয়েই একবার বলবে কি না ভাবছে সে, এমন সময় দেখতে পেল প্রভা উঠে আসছে খাড়াই রাস্তা ধরে। কিন্তু প্রভা একা নয়। সঙ্গে রয়েছে আরও একটি লোক। দূর থেকে বোঝা যায় ঠিক সুস্থ নেই সে, পা টলছে চলতে গিয়ে। শতছিন্ন পোশাক পরা, একমুখ দাড়িগোঁফ আর অপরিচ্ছন্ন দেহের সে মানুষটিকে দেখে ভ্রু কুঁচকে উঠেছিল গিরিধারীর। সে-লোকটি গিরিধারীর সামনে এসে স্খলিত দুর্বল স্বরে বলে উঠল, "কেমন আছ গিরিধারীদা?"

ভয়ানক চমকে গিয়েছে গিরিধারী। এ তো অমিয়দাদা। অমিয়কে সে ভালোই চেনে। সায়েন্স কলেজে অমিয়র সঙ্গে তার ভালোই খাতিরদারি ছিল। একসঙ্গে চা-বিড়ি খেত, টিফিন করত। অমিয় অবশ্য মাঝে মাঝেই বেচারি গিরিধারীকে ধরে মানুষের মুক্তির কথা, আন্দোলনের কথা— এইসব বলত। গিরিধারী না বুঝেই হুঁ-হাঁ করত আর ভাবত অমিয়দাদাটা পাগল আছে। কিছুই বোঝা যায় না কী বলে। তবে ছেলেটাকে ভালোওবাসত সে।

কিন্তু এ অমিয়দাদার কী অবস্থা। হতভম্ব হয়ে ভাবছিল গিরিধারী। ততক্ষণে প্রভা এগিয়ে এসেছে, দু'-চারকথায় সমস্তটা বুঝিয়ে দিয়েছে গিরিধারীকে। গিরিধারী চালাক লোক। সে চট করে সারভ্যান্টস কোয়ার্টারের একটা খালি ঘরে ব্যবস্থা করে দিয়েছে অমিয়র জন্য। প্রভা বলেছে, "খুব সাবধান গিরিধারীদা, কেউ যেন কিছু না জানতে পারে ঘুণাক্ষরে। পুলিশ ঘুরছে।" গিরিধারী মাথা নাড়ায় নিঃশব্দে।

* * *

অসহ্য লাগতে শুরু করেছে এবার মনোজের। তিন-চারদিন কেটে গিয়েছে দার্জিলিং আসার পরে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সুরেন্দ্রমোহন বেশ ভালোই ভুগছেন। কম্প দিয়ে জ্বর আসছে প্রতিদিন সন্ধ্যাতেই। আর স্যার সুস্থ হয়ে না উঠলে কাজ শুরু করা যাবে না। পরে জানতে পারলে তুলকালাম করবেন অধ্যাপক। অতএব হাত-পা গুটিয়েই বসে থাকতে হয়েছে মনোজকে। একটা একটা করে দিন কেটে যাচ্ছে আর অস্থির হয়ে উঠছে মনোজ। ওদিকে কলকাতায় তার ঢের কাজ পড়ে রয়েছে।

ক্রমেই একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হচ্ছে মনোজের মনে, ওই প্রভা চৌধুরীর জন্যই তাদের পুরো ল্যাবরেটরিটার সর্বনাশ হতে চলেছে। সবথেকে ভালো আর আকর্ষণীয় কাজটা নিজের দখলে নিয়ে তো নিয়েছেই, দেখা যাচ্ছে প্রফেসরকেও আঙুলের ইশারায় নাচাচ্ছে সে-মেয়ে। আবার এখানে এসে সুরেন্দ্রমোহনের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারাদিন টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না মেয়েটার। কী ভেবেছে প্রভা? মনোজের ঘাড়েই চাপাবে নিজের কাজ? মনোজ গাধার মতো খেটে ওই প্লেটগুলো বসাবে, আর প্রভা চৌধুরী গবেষণাপত্র ছেপে নাম কামাবে, পরিষ্কার করবে ভবিষ্যতের রাস্তা? মনোজের মাথার মধ্যে একটা জমাট বাধা রাগ খ্যাপা মোষের মতো ফুঁসতে থাকে।

ঘরে বসে বসে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, তাই বিকেলে একটু ঘুরতে বেরিয়েছে মনোজ। বিকেলবেলা প্রভা হাঁটতে বেরোয়, তাই ক্যাম্পাস চত্বরে ঘোরাঘুরি করলে দু'জনের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ নেই। এসব সাত-পাঁচ ভেবেই মনোজ ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করছিল। হঠাৎই তার চোখে পড়ল কিচেন থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে কোথায় যাচ্ছে যেন প্রভা। হাতে একটা ঢাকা দেওয়া পাত্র। মহারানি আজ বৈকালিক ভ্রমণে বেরোননি দেখছি— নিজের মনেই ভাবল মনোজ। কিন্তু প্রভার ভাবভঙ্গি তার স্বাভাবিক মনে হল না। চুপি চুপি কোথায় যাচ্ছে মেয়েটা?

কৌতূহলী হয়েই একটু দূরত্ব বজায় রেখে প্রভার পিছু নিল মনোজ। অবাক হয়ে সে দেখল প্রভা চলেছে মেন বিল্ডিং থেকে দূরে বাড়ির হাতার একদম শেষপ্রান্তে সারভ্যান্টস কোয়ার্টারে। সারি দেওয়া ঘরগুলোর একদম শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়াল প্রভা। শেষ ঘরটার দরজায় তিনবার টোকা দিল আস্তে আস্তে। প্রবল বিস্ময় চেপে রেখে একটা গাছের আড়াল থেকে সবই লক্ষ করছে মনোজ। তার বিস্ময়কে দ্বিগুণ

করে দরজাটা খুলে গেল ভিতর থেকে। প্রভাও এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঢুকে পড়ল সেই ঘরের ভিতর। মনোজ দেখল দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার। উত্তেজনা চেপে রেখে সেও এগোল ঘরখানির দিকে। এখানে কী চলছে তাকে জানতেই হবে।

* * *

কিচেন থেকে বিকেলের জলখাবার নিয়ে এসেছে কিছুটা প্রভা। অমিয় মন দিয়ে সেটাই খাচ্ছিল। প্রভা তাকিয়েছিল অমিয়র দিকে। এ কয়দিনে অনেক ধাতস্থ হয়েছে ছেলেটা। দাঁড়িগোঁফ কমিয়ে, স্নান করে অনেকটা সুস্থ লাগছে তাকে। দুর্বল এখনও যদিও খুবই। কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে রয়েছে। গিরিধারী কোথা থেকে কিছু জামাকাপড় নিয়ে এসেছে। সেগুলো রীতিমতো ঢোলা হয়েছে অমিয়র গায়ে। তাই চামড়ার খোলসের ভিতর থেকে ফুটে বেরোনো পাঁজরের হাড়গুলো বোঝা যাচ্ছে না। পলাতকের জীবন তার খাজনা উশুল করে নিয়েছে অমিয়র কাছ থেকে দুইমাসেই।

খাবারটা দ্রুত শেষ করে অমিয় অপ্রতিভভাবে হাসল প্রভার দিকে তাকিয়ে। "বেশ করেছে রান্নাটা। এখানের রাঁধুনিটার হাত বেশ ভালোই দেখছি।"

"ভালো না ছাই! অনেক দিন ঠিকঠাক কিছু না খেলে এই জোলো স্বাদের খাবারও ভালো লাগে।" খানিক ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে প্রভা। নিজের দুশ্চিন্তা ও আবেগকে সে রাগ দিয়ে আড়াল করছে।

"তাও ঠিক কথা। এরকম ভাবে গুছিয়ে সাজিয়ে কেউ খাবার দেবে আর, এও তো ভাবিনি। তাতেও খানিক বেশি স্বাদ এসেছে মনে হয়।" অমিয়র চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক।

"দুইমাসে তোমার উপযুক্ত শিক্ষা হয়নি দেখা যাচ্ছে।" প্রভাও হেসে ফেলেছে।

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা অমিয়র মুখে কীসের যেন ছায়া পড়ল এবার। ভাঙাচোরা মুখটা আরও ভেঙে যাচ্ছে কী এক অব্যক্ত বেদনায়। খুব ধীরে ধীরে কেটে কেটে সে বলল, "শিক্ষা বোধহয় আমার কোনওদিনই হবে না প্রভা। আমি লোকটা বোধহয় একটু বেয়াক্কেলে আছি।"

এবার অপ্রতিভ হওয়ার পালা প্রভার। সে কথা ঘোরাবার জন্য তড়িঘড়ি বলল, "হবে না তো। কখনওই হবে না। বাবা-মা কত চিন্তা করছেন বলো দেখি। ঘর-বাড়ি ছেড়ে এই ঠান্ডায়, মাগো!" কাঁপছে প্রভার গলা। অমিয় একটু অবাক হয়েই

তাকিয়েছে তার এই বন্ধুটির দিকে। এতদিনের পরিচয়, কিন্তু প্রভা চৌধুরীকে এমন আবেগাপ্লুত দেখেনি সে কখনও।

অমিয়র খুব ইচ্ছে করল নিজের দুটো হাত দিয়ে সে প্রভার হাত দু'টি জড়িয়ে ধরে। তাকে বলে, "তোমার আর আমার জন্য, দুনিয়ার সব মানুষের জন্য একটা ভালো পৃথিবী তৈরি করতে চাই আমি প্রভা। সেই দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে সব অত্যাচারিত মূক মুখ ভাষা খুঁজে পাবে। আমিও হয়তো তোমায় তখন বলতে পারব আমার মনের কথা।"

কিন্তু এসব কিছুই করল না অমিয়। প্রভার চোখের দিকে তাকিয়ে খুব আনমনে বলল, "আমার শিক্ষা হবে কি না জানি না প্রভা। সত্যিই জানি না। আমি এও জানি না, আমার রাস্তা কখনও ফুরোবে কি না। আমার রাস্তাটাই যে একমাত্র সত্যি— এমনটিও বলার জোর আছে কি আমার? জানি না। তবে এটুকু জানি, এ লড়াই আমাকে লড়তেই হবে। এ পথ আমায় চলতেই হবে।"

অমিয়র কোটরাগত চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অজানা কোনও দীপনে। সে-দিকে তাকিয়ে প্রভা আর কোনও কথা বলল না। সে বুঝতে পেরেছে, অমিয় শুনেছে নিজের অন্তরের আহ্বান। সে-আহ্বানের ধ্বনি বেজেছে অমিয়র মর্মে মর্মে। দ্বিধাহীন অমিয় মহাবিশ্বের মাঝে নিজের অস্তিত্বভূমিটি খুঁজে নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে ঋজু। সামনের দিকে ঝুঁকে প্রভা এইবার নিজের দুই হাতে টেনে নিল অমিয়র শীর্ণ হাত দু'টি।

দুই বন্ধুতে তারপর অনেকক্ষণ কাটিয়েছে মুখোমুখি বসে। কখনও কথা বলে, কখনও নিশ্চুপে। হঠাৎই নিজের হাতের লেডিস রিস্টওয়াচটার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল প্রভা। প্রায় ন'টা বাজতে যায়। কিচেন বন্ধ হয়ে যাবে। সে তড়িঘড়ি বলল, "যাই তোমার জন্য খাবারটা নিয়ে আসি। না-হলে আর খাবার পাওয়া যাবে না।" দরজা খুলে বেরিয়ে যায় সে। ঘরের দরজাটা আবার ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয় অমিয়। কিন্তু দু'জনের কেউই জানতে পারল না অনতি দূরেই পাশের ঘরটির অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মনোজ। তার চোখ জ্বলছে ধিকিধিকি। বিদ্বেষে, উল্লাসে।

* * *

সোয়া দশটা মতো বাজে। অমিয়কে খাইয়ে, নিজে খেয়ে, গিরিধারীকে চারদিকে একটু নজর রাখতে বলে যখন প্রভা নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, তার সামনে হঠাৎ করে এসে দাঁড়াল মনোজ। হকচকিয়ে গিয়ে প্রভা দু'পা পিছিয়ে যায়। তারপরে বিস্মিত কণ্ঠে বলে

ওঠে, "মনোজদা? তুমি এত রাতে? কিছু দরকার ছিল?" মনোজ খুবই ঠান্ডা গলায় উত্তর দেয়, "তা একটু ছিল। তবে তার আগে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। চলো ঘরের ভিতরে গিয়ে বসি।" মনোজের কথা শুনে সাংঘাতিক চমকে গিয়েছে প্রভা। মনোজদা যে তাকে পছন্দ করে না, সেটা সে ভালোই জানে। সুযোগ পেলে হয়তো প্রভার ক্ষতিও করতে ছাড়বে না মনোজ। কিন্তু অবিবাহিত কুমারী মহিলার ঘরে রাত্রিবেলা ঢুকতে চাইবে এমন অশিষ্ট তাকে তো মনে হয়নি কখনও।

কঠিন কণ্ঠে প্রভা বলে, "না। ঘরে যাওয়ার দরকার নেই। যা বলার এখানেই বলো।" মনোজ হেসেছে নিঃশব্দে। বিষাক্ত সেই হাসি। হিসহিসিয়ে বলেছে, "সব কথাই কি এখানে বলব প্রভা? তোমার ওই অমিয়র কথাও? সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীকে কেউ সাহায্য করলে তার কী কী শাস্তি হতে পারে, সে-কথাও কি এখানে দাঁড়িয়েই বলব?"

প্রভার পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠেছে। মাথা ঘুরছে তার। মনোজ তা হলে সব জেনে ফেলেছে? কী হবে এখন? শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে কোনওমতে নিজেকে সামলেছে প্রভা। স্খলিত কণ্ঠে বলেছে, "এসো, ভিতরে এসো।"

কিছুক্ষণ পরে মনোজ প্রভার ঘর থেকে বেরিয়ে শিস দিতে দিতে চলে গেছে নিজের ঘরের দিকে। ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে থাকা প্রভাকে পিছনে ফেলে রেখে। কতক্ষণ মনোজ তার ঘরে ছিল জানে না প্রভা। সময়ের হিসেবে করলে বোধহয় পুরো দশটা মিনিটও নয়। কিন্তু প্রভার জীবনটাই যেন ওলোটপালোট করে দিয়ে গিয়েছে ওই ছেলেটা এই কয়েকটা মিনিটে। আরও কয়েকটা মিনিট। ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে আসে প্রভা। দরজা বন্ধ করে দেয় বাইরে থেকে।

মনোজ নিজের কথা খুব স্পষ্ট করেই বলেছে প্রভাকে। লুকোছাপা কিছু নেই। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সে প্রভা আর অমিয়র কথাবার্তা শুনেছে পুরোটাই। সম্পূর্ণ বিষয়টা বুঝতে তার বিশেষ দেরি হয়নি। হিমশীতল গলায় মনোজ প্রভাকে বলেছে, থানায় সারা রাত পুলিশ থাকে এখানেও। অমিয়র খবর পেলে যে তারা চলে আসতে একটুই দেরি করবে না— সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ না রাখাই ভালো। মালদার বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর পলাতক কমিউনিস্ট রাজদ্রোহীকে ধরার কোনও সুযোগ পুলিশ হাতছাড়া করবে না। অমিয় পালাবে কোথায় এই অবস্থায়? পালিয়ে কতদূরেই বা যাবে? যাওয়ার জায়গা আছে কোথায়?

আর তারপর প্রভার কী হবে? রাজদ্রোহীর সাহায্যকারিণীও রাজদ্রোহিতার

অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। জেল। আর তার আগে জেরা ও আনুষঙ্গিক পুলিশি দাওয়াই তো রয়েইছে। তবে তার থেকেও বড়ো কথা প্রভার বাবা-মায়ের কী হবে? পুলিশ কি তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করবে না? হয়রানি, দুর্ভোগ— মামলাও হতে পারে। প্রভার জীবন বরবাদ তো হবেই, পুরো পরিবারের উপর ঘনিয়ে আসবে সর্বনাশ।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে প্রভা। ঠান্ডা আছে। তবে কাঁপিয়ে দেওয়া শীত পড়েনি আজ। তবু তার সারা শরীর কাঁপছে। মনোজ বলে গিয়েছে তার কী চাই। কোন মূল্যে সে অমিয়র খবর পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। প্রভা কি সেই মূল্য চুকিয়ে দিতে পারবে কড়ায়গন্ডায়? জানা নেই। কিন্তু ওদিকে সময় আর বেশি নেই। ভোরবেলাতেই আবার আসবে মনোজ। দেখে নেবে তার শর্ত পালিত হয়েছে কি না।

তবে কি সুরেন্দ্রমোহনের কাছেই যাবে প্রভা? গিয়ে খুলে বলবে সবকিছু? না, তাতে হিতে বিপরীতই হবে। সুরেন্দ্রমোহন মেঘনাদ সাহা নন। বরং পূর্বসূরি রামনের সঙ্গেই তাঁর প্রকৃতিতে মিল রয়েছে বেশি। কতৃপক্ষকে খুশি করেই অধ্যাপক নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ওপরওয়ালাকে চটিয়ে তিনি কিছুই করবেন না। বলা যায় না, হয়তো নিজেই খবর দেবেন পুলিশে।

প্রভা হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মাটিতে। তার শরীরের ভারে পিষে যাচ্ছে সযত্নে রোপিত গুল্মগুলি, বসে যাচ্ছে শিশিরভেজা মাটি। হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছে দুই হাতে মুখ ঢেকে। আজ প্রভা চৌধুরী সত্যিই পরাজিত। বুকের ভিতর থেকে গুমরে গুমরে উঠে আসা কান্নার বেগ অবাধে মুক্ত হয়েছে। আটকানো যাচ্ছে না ঝরঝর করে বয়ে চলা অশ্রুধারাকেও। প্রভার আনতমুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সেইসব অশ্রুবিন্দুগুলি, মিশে যাচ্ছে পার্বত্যশিশিরে।

কাঁদছে প্রভা অঝোরে। অথই জলে পড়েছে যেন সে, সাঁতার জানে না। দমবন্ধ হয়ে আসছে তার। আকাশের দিকে মুখ তুলে বাতাস ভরে নিতে চাইল ফুসফুসে। আর তখনই ঝাপসা দৃষ্টিতে সে দেখতে পেল ঘনকৃষ্ণ আকাশের পটভূমে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল। মহীয়ান ওই মহাজাগতিক প্রশ্নচিহ্নটি যেন প্রভার জীবনে নেমে এসেছে আচম্বিতে। প্রশ্নটিই স্বয়ং অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে, কিন্তু অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তরটিই তো অধরা তার কাছে। কোন পথে যাবে সে? কোন উত্তরটি বেছে নেবে?

হঠাৎই খুব রাগ হল প্রভার। নিজের উপর, মায়ের উপর, বাবার উপর। রাগ হচ্ছে অমিয়র উপর, রাগ হচ্ছে তার এই গবেষণা জীবনটার প্রতিই। এ কেমন সজ্জা,

কেমন নকশা বিশ্বপ্রকৃতির? এ দ্বিধাবিভক্ত পথের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাকে, কেমন সে grand design? এভাবেই প্রতিটি ক্ষুদ্র একক, সামান্য ঘটনা, ব্যক্তি অস্তিত্বের জন্য যদি সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতার বহুস্তরীয় ভবিতব্য সৃষ্টি হয়, তা হলে তো সবই আসলে এক বিশৃঙ্খলা। সেখানে কোনও শৃঙ্খলার কী করে ঠাঁই হবে?

প্রীতিদিদির কথা মনে পড়ছে তার আরও একবার। অদৃষ্টে বিশ্বাস করে না প্রভা। আস্থা রাখে মহাবিশ্বের সর্বব্যাপী সুবিন্যাসে। প্রীতিদিদি সেই সুবিন্যাসটি নিজের অন্তরের বিশ্বাসে দেখেছিল। অমিয় সেই সজ্জাটির প্রকৃত রূপায়ণ দেখেছে জগৎজোড়া সাম্যে। নিজের ভিতরে আরও একবার ডুব দেওয়ার চেষ্টা করে প্রভা। আগে এমন করে সে উত্তর পেয়েছে, সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে সঠিক, সফল হয়েছে আগেও।

কিন্তু আজকের এই সংঘর্ষটি যে সম্পূর্ণ আলাদা, সেটা ভালোই টের পাচ্ছিল প্রভা চৌধুরী। আগে সে নিজের অস্তিত্বের শিকড়টিকে উপলব্ধি করে নিজের দাঁড়ানোর মাটিটি খুঁজে পেয়েছিল। একরকমের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল ব্যক্তি প্রভার সঙ্গে প্রভার মহাবৈশ্বিক অন্বেষণের। কিন্তু আজ কোনও যোগসূত্র স্থাপন নয়, আজ দুই প্রভা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। আজ হয় প্রভার নিজের অস্বিত্ব-পরিচয়-শিকড় জীবিত থাকবে, অথবা মহাবিশ্বের অমোঘ শৃঙ্খলটির সন্ধানসূত্র। দু'টির মধ্যে একটির ধ্বংস নিশ্চিত।

প্রভা কোন পথটি বেছে নেবে? কেউ তো বলে দেওয়ার নেই। তাকে নিজেকেই খুঁজতে হবে এই সংকটের সমাধান। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। মাথার উপর একইরকম উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল। জ্বলজ্বল করছে ধ্রুবতারা। প্রভার মাথা ঘুরছে। নাকি সম্পূর্ণ মহাকাশটাই ঘুরছে তার চোখের সামনে? নিজের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সে যেন হারিয়ে ফেলছে নিজেকেই। আবার নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়ে খুঁজে পাচ্ছে ওই তারাভরা মহাকাশ। ওই অসংখ্য তারা, ছায়াপথ, ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করছে এই মহাশূন্যে। কোটি কোটি তারা মরে গিয়েছে, সময়ের প্রবল স্রোতে নির্বাপিত হয়েছে তাদের প্রচণ্ড দীপ্তি। আবার জন্মেছে অযুতসংখ্যক নক্ষত্র। আবার তারা আলো পাঠিয়েছে মহাবিশ্বের দিকেদিকে।

একটি মহাকায় তারকা থেকে একটি ক্ষুদ্র মানবক— সকল জন্ম-মৃত্যুই একটি সম্ভাব্যতার মুহূর্তের উপর নির্ভর। প্রভা চমকে উঠেছে। এ সংঘর্ষের কোনও প্রয়োজন নেই আদপেই। সাদা-কালো, মন্দ-ভালো, হ্যাঁ-না-এর মতো দ্বিবিন্দুজাত সরলরেখা নয় মহাবিশ্ব ও তার অংশের সম্পর্ক। আলো সরল রেখায় চলে, কিন্তু প্রিজমের মধ্যে

দিয়ে গেলে সে বিভিন্ন কোণ সৃষ্ট করে একাধিক রঙে বিচ্ছুরিত হয়। এই অস্তিত্ব-ঘটনা-পরিস্থিতি-সূত্রগুলি মহাবিশ্বের এই সজ্জায় এসে নিজের নিজের পথ খুঁজে নিচ্ছে। সে-পথের কোনও চূড়ান্ত দিশা নেই। সে-ভবিতব্যগুলি সেজে উঠেছে হাজার সম্ভাবনার রঙে।

প্রভা কাঁপছে। ভয়ে-সংশয়ে নয়। উপলব্ধির আনন্দে। এ উপলব্ধি সর্বগ্রাসী হয়ে বিলুপ্ত করে দিচ্ছে তার চেতনা, এক অসহনীয় তীব্র-মধুর বেদনায় তার আত্মা জর্জরিত হচ্ছে। তবু প্রাণে ধরে এই বেদনাকে বিদায় দিতে পারছে না প্রভা। আবার তার চোখ দিয়ে অঝোরধারায় গড়িয়ে পড়ছে জল। এ অশ্রু পরাজয়ের যাতনার নয়, নয় জয়ের আনন্দের। জয়-পরাজয়ের গণ্ডির বাইরে যে কালবৃত্তের কেন্দ্রটি, তারই শুক্তিগর্ভে জন্ম নিয়েছে এই উপলব্ধিজাত আবেগাশ্রুর মুক্তামালা। সে নির্মল অশ্রুবিন্দুগুলি দীপ্যমান করে সাজিয়েছে প্রভার অন্তরকে। তাদের শরীরে প্রতিফলিত হচ্ছে উজ্জ্বল নক্ষত্রপ্রভা।



নভেম্বর ১৯৪৮, ম্যাঞ্চেস্টার

নিজের ঘুপচি ঘরখানায় আগুনের সামনে চুপ করে বসে আছে প্রভা। রাত সাড়ে আটটা বাজে। মিসেস নেভিল ডিনার সেরে নেওয়ার জন্য ডেকেছিলেন, প্রতিদিনই যেমন ডাকেন। প্রভা যায়নি। বলেছে খিদে নেই। ইউনিভার্সিটি থেকে খেয়ে এসেছে। মিসেস নেভিল গজগজ করতে করতে চলে গেছেন, বিদেশ বিভুঁইয়ে অসুখ বাধায় যদি মেয়েটা— ঝামেলা কে নেবে? এমনিতেই ইন্ডিয়ান বোর্ডার রেখেছেন বলে পাড়ায় কম কথা শুনতে হচ্ছে না তাঁকে।

প্রৌঢ়ার কথা কানে ঢোকেনি প্রভার। সে নিজের চিন্তাতেই নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। দুপুরবেলার পর থেকেই সে যেন চারদিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। ভিক্টর হেস-এর লেকচারটির পর থেকেই এরকম অবস্থা। অথচ লেকচারটা বেশ সুন্দরভাবেই শুরু হয়েছিল। অডিটোরিয়ামের একেবারে সামনের সারিতে বসে মন দিয়েই শুনছিল প্রভা। ডায়াসের একদিকে বসে আছেন তার মাস্টারমশাই প্যাট্রিক ব্ল্যাকেট। তাঁকে রীতিমতো সংবর্ধনা দিয়ে তবেই লেকচার শুরু হয়েছে। প্রফেসর ব্ল্যাকেট নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এ বছরেই। মাস দুয়েক আগে ঘোষণা হয়েছে। দুই নোবেলজয়ী মঞ্চে, বেশ গুরুগম্ভীর পরিবেশই বটে।

প্রভার হঠাৎ চমক লাগল প্রফেসর হেস-এর লেকচারটি একদম শেষদিকে।

নিজের পুরোনো গবেষণা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে বেশ বিস্তারে বক্তৃতা করার পর প্রৌঢ় বিজ্ঞানী সমকালীন কয়েকজন প্রতিশ্রুতিমান বিজ্ঞানীর কাজের কথা উল্লেখ করছিলেন। একজন বিশেষ বিজ্ঞানীর নাম ঘুরে ফিরে আসছিল।

অধ্যাপক সিসিল পাওয়েল। এর নাম প্রভা জানে। মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে, বিশেষত ইউকাওয়া প্রস্তাবিত কণা নিয়ে এই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী বেশ অনেকদিন ধরেই বেশ উৎকৃষ্টমানের গবেষণা করছেন। কিন্তু এতদূর এগিয়ে গিয়েছেন তিনি, এ কথা প্রভা জেনে উঠতে পারেনি। নিজের কাজ নিয়েই সে ব্যস্ত এখন, ভারত থেকে চলে আসার পর ইউকাওয়ার কণা নিয়ে খোঁজখবর পর্যন্ত রাখার উৎসাহ সে হারিয়েছে। তার উপর হেস এখন বলছেন গত বছর প্রকাশিত হওয়া দু'টি গবেষণাপত্রের কথা।

কিন্তু এ কী বলছেন অধ্যাপক হেস? পাওয়েল সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন কণাগুলিকে। নিখুঁত হিসেবে তাদের সমস্ত ভৌতধর্মাদি মেপে, সঞ্চারপথের নির্ভুল পর্যবেক্ষণে পাওয়েল প্রমাণ করেছেন মেসোট্রন বা মেসনের প্রকৃত অস্তিত্ব। প্রভার চোখের পলক পড়ছে না, হাত-পা নিঃসাড়। পাওয়েল এই কাজটি করেছেন ইলফোর্ড কোম্পানির ফুলটোন ফোটোগ্রাফিক প্লেটের সাহায্য নিয়ে।

প্রভা বজ্রাহতের মতো বসে রয়েছে, আশেপাশের শ্রোতাদের গুঞ্জন তার কানে ঢুকছে না। ভিক্টর হেস-এর কণ্ঠস্বর যেন যুগান্তরের ওপার থেকে ভেসে আসছে, "আমার মনে হয়, না একটু ভুল বললাম, মনে হওয়া-টওয়া নয়— আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কাজটি সাম্প্রতিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাকার্যগুলির মধ্যে অন্যতম। এবং পাওয়েল কয়েক বছরের মধ্যেই নোবেল প্রাইজ অর্জন করবেন এই কাজের জন্য, এ-ও আমার দৃঢ়তর প্রত্যয়।

লেকচারের বাকি অংশটা প্রভার মাথায় ঢোকেনি আর। লেকচারের শেষে কোনওরকমে নিজেকে টেনে টেনে ফিরে এসেছে সে মিসেস নেভিলের বোর্ডিং হাউসে। ভিক্টর হেস-এর সঙ্গে গবেষকদের প্রশ্নোত্তরের পালায় অংশ নেয়নি, দেখা করেনি আর প্রফেসর ব্ল্যাকেটের সঙ্গেও। ফিরে থেকে অবধি ওই আগুনের ধারের চেয়ারেই বসে রয়েছে চুপটি করে। তার মাথার মধ্যে ভেসে উঠেছে নয় বছর আগের দার্জিলিং-এর সে ঘটনাগুলি।

* * *

ওই রাতেই সে সন্তর্পণে চলে গিয়েছিল অমিয়র ঘরখানিতে। গিরিধারী পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছে। তাকে না ডেকে সাবধানে দরজায় মৃদু করাঘাত করে সে জাগিয়ে তুলেছিল অমিয়কে। বিস্মিত অমিয়র হাতে তুলে দিয়েছিল নিজের সঙ্গে যা টাকা-পয়সা ছিল, সবটাই। হাতের দু'গাছা সোনার চুড়ি, গলার সরু হার, কানের দুল— সেগুলোও। "এক্ষুনি পালিয়ে যাও অমিয়। দূরে চলে যাও এখান থেকে। দেরি কোরো না একটুও।" প্রভার কথা শুনে অবাক হয়ে অমিয় বলেছিল, "এখন? এই রাত্রিবেলা?"

"হ্যাঁ, এক্ষুনি। একদম সময় নেই।" উদ্‌গত আবেগ চেপে রাখার চেষ্টা করতে করতে বলেছিল প্রভা।

"তাড়িয়ে দিচ্ছ?" ওই অবস্থাতেও রসিকতা করার চেষ্টা করেছিল অমিয়।

"তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারি কখনও?" হাসছে প্রভা কিন্তু তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে একেবারে। "পুলিশ খবর পেয়েছে। চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।"

দ্বিরুক্তি করেনি অমিয়। পিছনদিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পিছন ফিরে তাকিয়েছিল একবার। প্রভা ঠিক তার পিছন পিছন এসেছে গেট অবধি। অমিয়র বলার ইচ্ছে হল, 'আর দেখা হবে কি না জানি না, প্রভা। কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমায় ভালোবাসি।' কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল ওই কথাগুলো নয়, বদলে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, "বিদায় প্রভা। আবার দেখা হবে কমরেড। আমি জানি দেখা হবেই।" পিছনে আর না তাকিয়ে পাহাড়িয়া রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল অমিয়। প্রভা তখন লোহার ছোটো গেটটি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিশ্চল।

কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে মায়াপুরী বিল্ডিং-এর দিকে ফিরে চলল প্রভা। কাজ এখনও বাকি রয়েছে। একটা তালাবন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল প্রভা। চাবি সে সঙ্গেই নিয়ে এসেছে। এই ঘরটায় রয়েছে সঙ্গে নিয়ে আসে যন্ত্রপাতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপকরণ আর ফোটোগ্রাফিক প্লেটগুলি। বাক্সপ্যাঁটরার উপরে সাবধানে রেখে দেওয়া হয়েছে মহামূল্য সেই ফুলটোন প্লেটের প্যাকিং বাক্সটা।

প্রভা ডিঙি মেরে দাঁড়াল বাক্সটার নাগাল পেতে। দুই হাতে ধরতে পেরেছে সে বাক্সটা। এক মুহূর্তের দ্বিধা, দুই একটি তীব্র শ্বাস গ্রহণ, তারপর এক ধাক্কায় প্রভা বাক্সখানি ফেলে দিয়েছে উপর থেকে। সশব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়েছে ভারী জিনিসটা। স- শব্দেই মালুম পড়েছে, পতনের অভিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে ভিতরের

কাঁচের প্লেটগুলো। বুক ভেঙে গেলে শব্দ হয় না। হলে বোধহয় প্রভার শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের আর্তনাদে কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরও কেঁপে উঠত।

হ্যাঁ। এটাই মনোজের শর্ত ছিল। অমিয়র মুক্তির বদলে প্রভার গবেষণার বলিদান। প্রভা সে-বলিদান করেছে। দু'-একদিন পরে সুরেন্দ্রমোহন যখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাঁকে গিয়ে সে বলেছে— ভুল করে হাত থেকে পড়ে ফুলটোন প্লেটগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

"ভুল করে? You mean by Mistake?" বাঘের মতো গর্জে উঠেছেন সুরেন্দ্রমোহন। মাথা নিচু করে প্রভা 'হ্যাঁ' বলেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সুরেন্দ্রমোহন বলেছেন, "Mistake তোমার নয়। Mistake আমার। তোমাকে আদৌ গবেষণার সুযোগ দেওয়া আমার জীবনের সবথেকে বড়ো Mistake। তবে চিন্তা কোরো না। That Mistake will be rectified surely." আঙুল উঁচিয়ে প্রভাকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন মাস্টারমশাই।

হাফটোন প্লেটগুলোই রাখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ। পাঁচমাস পরে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল লোক দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন পুরোদমে। ফুলটোন প্লেট আনানোর কোনও সুযোগ নেই ইংল্যান্ড থেকে। ইলফোর্ড কোম্পানি ব্রিটিশ সেনাকে সরবরাহ করছে তাদের ফোটোগ্রাফিক প্লেট। ইন্ডিয়ার বিজ্ঞান গবেষণার জন্য পাঠানোর মতো উদ্বৃত্ত প্লেট নেই তাদের ভাঁড়ারে। সুতরাং হাফটোন প্লেট থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করেই কাজ করতে হয়েছে প্রভাকে। কাজ ছেড়ে দিতেই চেয়েছিল সে, সুরেন্দ্রমোহনের জন্য পারেনি তা। তিনটে বছর ওই ল্যাবরেটরিতে তাকে নরকবাস করতে হয়েছে।

তিনটে বছর বাদে ওই ল্যাবরেটরি থেকে সে যখন বেরিয়ে এসেছে, তার কাজ থেকে চারটে গবেষণাপত্র প্রকাশিত। কিন্তু পিএইচ ডি জোটেনি তার। সুরেন্দ্রমোহন নিজের 'Mistake rectify' করেছেন। পরবর্তী আরও তিনটে বছর প্রভাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে পিএইচ ডি-র সুযোগ পাওয়ার জন্য। যুদ্ধ শেষ হওয়ার জন্য। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে প্রফেসর ব্ল্যাকেটের কাছে আবেদন করেছে সে। সম্মতিও পেয়েছে কিছুদিনের মধ্যে। সুরেন্দ্রমোহন কথার খেলাপ করেননি। একটি শংসাপত্র দিয়েছেন সে-সময়ে।

অমিয়র সঙ্গে আর দেখা হয়নি প্রভার। দুঃখী দিনদুনিয়ার ধুলোমাটি মেখে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথাও। হয়তো চাষিবাসী মানুষের মাঝে, হয়তো শহর থেকে দূরে

আদিবাসী গ্রামে গিয়ে কাটাচ্ছে তাদের সঙ্গে। যেখানেই থাকুক মানুষের মাঝেই আছে সে, এটুকু প্রভা নিশ্চিত জানে।

তবে প্রভাকে অবাক করে দিয়েছে মনোজ। দার্জিলিং থেকে ফিরে আসার পরে চুপচাপ থেকেছে সে কিছুদিন। ল্যাবরেটরিতে আসত না নিয়মিত। তারপর একদিন আসা ছেড়েই দিল। প্রভার সঙ্গে আর দেখা হয়নি তার। সে নাকি ব্রিটিশের সেনাদলে যোগ দিয়ে চলে গিয়েছে দেশের বাইরে। গিরিধারীকে শুধু বলে গেছে, "প্রভাকে বোলো, আমায় যেন ক্ষমা করে দেয়।"

প্রভা অনেক ভেবেও কুল করতে পারেনি ব্যাপারটার। মানুষের মন বিচিত্র বস্তু। হয়তো প্রভাকে দেখে তার লজ্জা হয়েছে। নিজের হাতে নির্দ্বিধায় বহুবর্ষলালিত স্বপ্নকে হত্যা করেছে প্রভা, নিজের বন্ধুকে বাঁচাতে। হয়তো প্রভাকে দেখে নিজের উপর ধিক্কার জন্মেছে মনোজের। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে প্রভার মধ্যে কোনও স্বার্থ ছিল না। হয়তো মনোজের স্বভাবকুটিল হৃদয়ে অবশেষে অনুতাপ জন্ম নিয়েছে। হয়তো।

* * *

পুরোনোদিনের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই প্রভার মনে হল এই অতীত থেকে মানসিকভাবেও সে অনেক দূরে চলে এসেছে। এগুলি আর তার মনোজগতকে আলোড়িত করতে পারছে না। বরং তাকে ভাবাচ্ছে সিসিল পাওয়েলের কথা, তাঁর কাজ। সুরেন্দ্রমোহন কি জানেন পাওয়েলের কাজের কথা? জানতে পারলে তাঁর হৃদয় ঈর্ষা ও ক্ষোভে ভরে উঠবে। সঙ্গে জন্ম নেমে প্রভা চৌধুরী নামের একটা অসাবধানি মেয়ের উপর ক্রোধ। হয়তো তাঁর মনে আক্ষেপ জন্মাবে নিজের 'Mistake'টির কথা মনে করে।

কিন্তু এই মুহূর্তে প্রভার হৃদয়ে ঈর্ষা বা আক্ষেপের কোনও স্থান নেই। তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে রয়েছে অনির্বচনীয় এক তৃপ্তিতে। মহাবিশ্ব নিজের মহতী সজ্জাটির সুবিন্যাস নিশ্চিত করেছে নিজেই। প্রভা চৌধুরীর মাথায় জয়ের মুকুট ওঠেনি। উঠেছে সিসিল পাওয়েলের মাথায়। এ সম্ভব হয়েছে নয় বছর আগে প্রভার একটি সিদ্ধান্তের ফলে, মনোজের একটি সিদ্ধান্তের ফলে, অমিয়র একটি সিদ্ধান্তের ফলে, সর্ব্যব্যাপী একটি নকশার অমোঘ ভবিষ্যৎ-রেখার প্রভাবে।

কিন্তু আজ প্রভা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে, ব্রহ্মাণ্ডের অসীম শূন্যতায়

কালপ্রবাহের অপ্রতিরোধ্য স্রোতে এই বহুস্তরীয় সম্ভাব্যতার বাস্তব একটি বহুতল প্রিজমের মতো জেগে রয়েছে। কোনও একটি সমান্তরাল বাস্তবে প্রভা চৌধুরী পেয়েছে নোবেল প্রাইজ ইউকাওয়ার কণাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আবার অন্য একটি বাস্তবে অমিয় শোষিত মানুষকে এনে দিতে পেরেছে মুক্তি, প্রীতিদিদি তার আড়বাঁশিতে তুলেছে অলৌকিক সুর। কোথাও আবার সিসিল পাওয়েলের সিদ্ধান্তে সুরেন্দ্রমোহনের গবেষণাপথ গিয়েছে পাল্টে।

এভাবেই অগণিত সম্ভাবনা জন্ম নিচ্ছে, মরে যাচ্ছে, পরিণতি পাচ্ছে, বিচ্যুত হচ্ছে এই 'Grand Design'-এ। প্রভা নিজেও সেই ব্যাপ্তির অংশ। প্রভা নিজেই সেই ব্যাপ্তি। প্রভাকে বাদ দিয়ে এই বিন্যাস অসম্পূর্ণ। এ বিন্যাস ছাড়া প্রভার অস্তিত্ব নেই। চরম এক পূর্ণতার স্পর্শ পেয়েছে প্রভা। ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করল সে। রাতের আকাশে তখন কোটি কোটি নক্ষত্র জ্বলছে-নিভছে উল্লাসে। তাদের সংসারে এসেছে নতুন আত্মীয় এক। সে নবীন নক্ষত্রটির নাম প্রভা।



'কবীশ্বরী' ও 'নক্ষত্রপ্রভা' দু'টি আলাদা উপন্যাস। দু'জন আলাদা নারীর কাহিনি। তাঁদের একজন কবিয়াল, অপরজন বিজ্ঞানী। কবিগানের আসর একজনের দুনিয়া, আর প্রকৃতির রহস্যসন্ধান অন্যজনের চিন্তনবিশ্ব। দু'জনের মধ্যে পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শতক। তবুও অবোধ্য কোনও ম্যাজিকে দুই নারীর কাহিনি হয়তো এসে মিশে যায় এক বিন্দুতে। সমাজ সংসারের সঙ্গে নিয়ত সংঘর্ষে, প্রতিরোধের অদম্য অভিলাষে, নিয়তির অমোঘ পাশাখেলায় সে কাহিনি দু'টি, সে মানুষ দু'টি, সেই নারী দু'জন স্থান-কাল-পাত্রের বিভিন্নতা অতিক্রম করে একে অন্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে জেগে থাকে শেষে। এই প্রতিচ্ছবিটি মানুষের ব্যক্তিপরিচয়, লিঙ্গপরিচয়, কালপরিচয় ছাপিয়ে ক্রমে হয়ে ওঠে মহাকালের খাতায় মানবজীবনের চিরকালীন খতিয়ান। এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে সেই খতিয়ানলেখটিই।







ISBN 978-81-965431-9-8
9 788196 543198

মূল্য: ৩৭৫.০০ টাকা